সুধীর চক্রবর্তীর বই

নানা মনের চোখে

সংকলন ও সম্পাদনা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়



সুধীর চক্রবর্তী সংবর্ধনা সমিতি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা -৯

প্রথম প্রকাশ
১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৪

প্রকাশক
সুধীর চক্রবর্তী সংবর্ধনা সমিতি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৩

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ



দেবব্রত ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স ইছাপুর, কলকাতা ১২৫

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ শিকদারবাগান লেন কলকাতা ৪

বেঁধেছেন
নিউ হেনা বাইন্ডিং ওয়ার্কস
পাটোয়ারবাগান লেন কলকাতা ৯

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন [redacted]



নিবেদন

সুধীর চক্রবর্তী : ৭০। ৭০ পূর্ণ মান্য গবেষক ও প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তীকে সম্মান জানানোর তাগিদ থেকে এই বইটির জন্ম। সাধারণত এই ধরনের বইতে সম্মানিত মানুষটির জীবন ও কর্মধারা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাঁর পরিচিত সহচর, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার মাধ্যমে মানুষটিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টাই হয়ে তাকে। সঙ্গে থাকে জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদি। আমরা সেই পথ এড়িয়ে একটু অন্য ভাবনায় চলতে চেয়েছি। একজন মান্য সাহিত্যিক, গবেষক, স্বীকৃত প্রাবন্ধিক এবং সফল সম্পাদককে জানার একমাত্র পাথেয় তাঁর গ্রন্থ-পাঠ। সুধীরবাবুকে সব থেকে ভালো চেনেন তাঁর পাঠকরাই। তাঁরা জানেন, সুধীর চক্রবর্তীর মনন চর্চার সমৃদ্ধ জগৎ। আমাদের মনে হয়েছিল নানা সময়ে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞজনেরা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব সমালোচনা করেছিলেন, তাঁদের মনের চোখ দিয়ে দেখা, তাঁর বিষয় উপলব্ধি করে সম-আলোচনা করা রচনাগুলি এক সঙ্গে পাঠ করলে সুধীর চক্রবর্তীকে বুঝে নেওয়ার কাজটা সহজ হবে। তাঁর মনন জিজ্ঞাসার পরিধির ব্যাপকতা খুব সহজে ধরা পড়বে এই সমালোচনা-সঙ্কলনটিতে। ১৯৬১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত ভিন্ন চরিত্রের, নানা রুচি ও মতবাদের পরিচয়ে সমৃদ্ধ এই সব নানা মত, নানা প্রশ্ন যা এক একটা বই বা বিষয়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল। তাঁর সৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরা হল একটু অন্যরকমভাবে।

বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থের সমালোচনা খুঁজে না পাওয়ার দরুন প্রকাশ পেল না। আমরা দুঃখিত! সম্পাদনায় ত্রুটি ও মুদ্রণ শৈথিল্য থেকে গেল। ফলে অতৃপ্তি রয়েই গেল।

স্বয়ং সুধীর চক্রবর্তীর সস্নেহ প্রশ্রয় না থাকলে একাজে হাত দেওয়ায় আমরা ভরসা পেতাম না। আমাদের রমা, রমাপ্রসাদ দত্ত একাই মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই সংক্ষিপ্ত কাল-সীমার মধ্যে প্রকাশ করা গেল এই বই। গৌতম চক্রবর্তী বিপুল উৎসাহে দ্রুত অক্ষর সন্নিবেশনের কাজ সমাধা করেছেন। অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে বইয়ের প্রচ্ছদগুলি।

এই কাজে যাঁরা সহযোগী ছিলেন তাঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

সময়ের অভাবে যে সব পত্রিকায় সমালোচনাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল ও যাঁরা এগুলি লিখেছিলেন তাঁদের কাছে পুনঃপ্রকাশের অনুমোদন নেওয়া হয়নি; আশা করি এমন একটি গ্রন্থপ্রকাশ তাঁদের ক্ষোভের কারণ হবে না। কৃতজ্ঞ আমরা তাঁদের কাছেও।

নমস্কার।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৪

বিষয়ক্রম

সুধীর চক্রবর্তী :

জীবনতথ্য ১১

গ্রন্থপঞ্জি (কালানুক্রমিক) ১৩

গ্রন্থপঞ্জি (বিষয়ানুক্রমিক) ১৫

গ্রন্থ-আলোচনা : ২৯-২০৮

(ক) লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি

ক. ১ সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান

ক. ১. ১ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৩১

ক. ১. ২ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৫

ক. ১. ৩ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৩৮

ক. ২ বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান

ক. ২. ১ অশোক সেন ৪০

ক. ২. ২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭

ক. ৩ গভীর নির্জন পথে

ক. ৩. ১ অশোক মিত্র ৪৯

ক. ৪ ব্রাত্য লোকায়ত লালন

ক. ৪. ১ রমাকান্ত চক্রবর্তী ৫৪

ক. ৪. ২ ভবতোষ দত্ত ৫৬

ক. ১.২.৩.৫ চারটি গ্রন্থের মিশ্র আলোচনা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০

ক. ৬ পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব

ক. ৬. ১ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৭৭

ক. ৬. ২ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯

ক. ৬. ৩ তারাপদ সাঁতরা ৯৪

ক. ৭ বাউল ফকির কথা

ক. ৭. ১ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯৬

ক. ৭. ২ জ্যোতিভূষণ চাকী ৯৭

ক. ৭. ৩ রমাকান্ত চক্রবর্তী ১০১

ক. ৭. ৪ অনিশ্চয় চক্রবর্তী ১০৪

ক. ৭. ৫ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১১১

(খ) সংগীত

খ. ১ গানের লীলার সেই কিনারে

খ. ১. ১ শঙ্খ ঘোষ ১১৫

খ. ১. ২ ধ্রুব গুপ্ত ১২০

খ. ৭ বাংলা গানের আলোকপর্ব

খ. ৭. ১ পবিত্র সরকার ১২৭

(গ) সাহিত্য

গ. ১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ

গ. ১. ১ অনন্তকুমার চক্রবর্তী ১৩৪

গ. ১. ২ জ্যোতির্ময় ঘোষ ১৩৬

গ. ১. ৩ সত্যজিৎ চৌধুরী ১৩৯
গ. ১. ৪ পিনাকীরঞ্জন গুহ ১৪৬

(ঘ) শিক্ষা

ঘ. ১ লেখাপড়া করে যে
ঘ. ১. ১ স্বপন চক্রবর্তী ১৪৮
ঘ. ১. ২ দীপেন্দু চক্রবর্তী ১৫২

(ঙ) আখ্যান

ঙ. ১ সদর মফঃস্বল
ঙ. ১. ১ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৫৫
ঙ. ১. ২ আনন্দ বাগচী ১৫৬
ঙ. ১. ৩ অজিত মণ্ডল ১৫৭
ঙ. ১. ৪ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৫৯

ঙ. ২ নির্বাস
ঙ. ২. ১ রামকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬২
ঙ ২. ২ উজ্জ্বল চক্রবর্তী ১৬৪

ঙ. ৩ পঞ্চগ্রামের কড়চা
ঙ. ৩. ১ সৌমেন্দ্র সিকদার ১৬৬
ঙ. ৩. ২ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী ১৬৯

(চ) বিচিত্র

চ. ১ রূপে বর্ণে ছন্দে
চ. ১. ১ গৌতম ঘোষদস্তিদার ১৭২

(জ) শিল্পকলা

জ. ২ চালচিত্রের চিত্রলেখা
জ. ২. ১ স্বপনবরণ আচার্য ১৭৪

(ঝ) সম্পাদিত সংকলন

ঝ. ১. অমৃত যন্ত্রণা
ঝ. ১. ১ সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ১৭৭
ঝ. ১. ২ সমীরণ মুখোপাধ্যায় ১৭৮
ঝ. ১. ৩ কুমারেশ চক্রবর্তী ১৭৯

ঝ. ২ আধুনিক বাংলা গান
ঝ. ২. ১ উৎপল চক্রবর্তী ১৮৩

ঝ. ৩ বাংলা দেহতত্ত্বের গান
ঝ. ৩. ১ দিব্যজ্যোতি মজুমদার ১৮৫

ঝ. ৪ জনপদাবলি
ঝ. ৪. ১ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০

(ঞ) সম্পাদিত নিবন্ধ

ঞ. ১. রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প
ঞ. ১. ১ সরোজ আচার্য ১৯৮

ঞ. ৪. যৌনতা ও সংস্কৃতি
ঞ. ৪. ১ উৎপল ঘোষ ২০৩

(আলোচনাগুলির ক্রমসংখ্যা দেওয়া হয়েছে বিষয়ানুক্রমিক-গ্রন্থপঞ্জি ক্রমসংখ্যা অনুযায়ী)

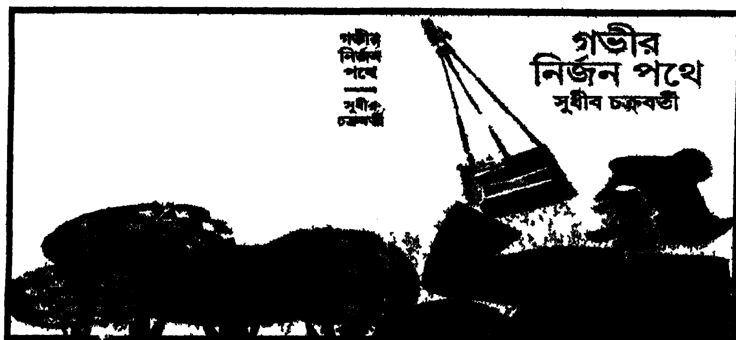

সুধীর চক্রবর্তী


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
স্মরণ বিস্মরণ
সুধীর চক্রবর্তী

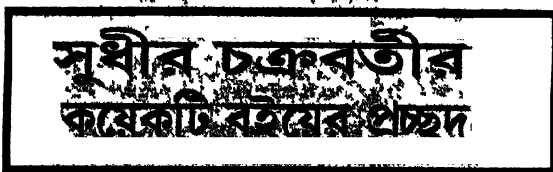


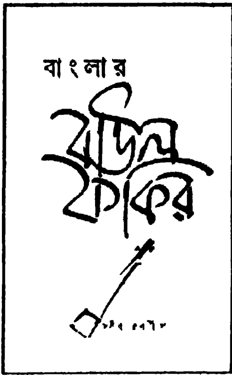


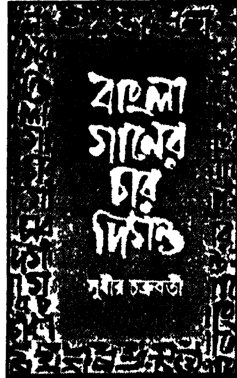

সুধীর চক্রবর্তী


গভীর
নির্জন পথে
সুধীর চক্রবর্তী

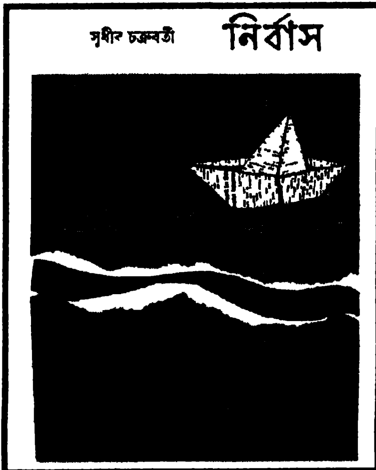



সুধীর চক্রবর্তীর
কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ


বাংলার
বাউল ফকির


বাংলা
গানের
চার
দিগন্ত
সুধীর চক্রবর্তী




সুধীর চক্রবর্তী
নির্বাস


চালচিত্রের
চিত্রলেখা


সদর-মফস্বল
সুধীর চক্রবর্তী



সুধীর চক্রবর্তী : জীবনতথ্য

নাম : সুধীর চক্রবর্তী

জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ (হাওড়া জেলার শিবপুরে)

বাবা : রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী

মা : বীণাপানি দেবী

স্ত্রী : নিবেদিতা চক্রবর্তী (অবসৃত অধ্যাপিকা, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ।)

সন্তান : দুই কন্যা; সানন্দা ও শ্রেয়া

ঠিকানা : ৮ রামচন্দ্র মুখার্জি লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১

আদিবাস্তু : দিগ্‌নগর, নদীয়া। ১৯৪২ সাল থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস।

শিক্ষা : কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। দুটিতেই বিষয় ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট।

কর্মক্ষেত্র : ক. বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যাপনা (জুলাই ১৯৫৮-মে ১৯৬০)।

খ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজে অধ্যাপক পদে কর্মরত, (১৯৬০-১৯৯৪, প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে ও পরে চন্দননগর কলেজে। দুটি কলেজেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন।)

গ. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অতিথি অধ্যাপক (১৯৯৫-৯৬)।

ঘ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধীনে প্রকল্প-পরিচালক (১৯৯৭-৯৮)

গবেষণা : ক. 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন' প্রদত্ত গবেষণা বৃত্তির বিষয় ছিল 'নদীয়ার লোকসংগীত' (১৯৬৬)

খ. 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ' প্রদত্ত গবেষণা বৃত্তির বিষয় ছিল 'বাংলার নিম্নবর্গের উপাসক সম্প্রদায়ের জীবন ও চর্চা বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা' (১৯৭৭)।

গ. 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সস', কলকাতার আর্থিক সহায়তায় 'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়'-এর ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষা।

প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রথম দুটি গ্রন্থ 'অমৃত-যন্ত্রণা' ও 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ, প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৩৬৩ ও ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে।

নিজের লেখা প্রথম গ্রন্থ 'গানের লীলার সেই কিনারে', রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নিবন্ধ সংকলন প্রকাশ পায় ১৩৯২ বঙ্গাব্দে।

লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রথম বই 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান' ১৩৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে।

(গ্রন্থ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ বিষয়ানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জিতে সংকলিত হয়েছে।)

সম্পাদনা : 'ধ্রুবপদ' বার্ষিক পত্রিকা।

১৯৯৬ থেকে সম্পাদনা করে আসছেন বার্ষিক সংকলন 'ধ্রুবপদ'। পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। মোট ৮টি সংখ্যা প্রকাশিত। সংখ্যাগুলির বিষয় ছিল যথাক্রমে : ১. দিলীপকুমার রায় ও অমিয়নাথ সান্যাল জন্মশতবর্ষ, ২. বাংলার বাউল-ফকির, ৩. বাংলা গান, ৪. বুদ্ধিজীবীর নোটবই, ৫. যৌনতা ও সংস্কৃতি,

৬. দৃশ্যরূপ, ৭. অভিজ্ঞতা, ৮. রবীন্দ্রনাথ।

এছাড়া 'ধ্রুবপদ' নামে প্রকাশনী থেকে ১৯৯৪-তে প্রকাশ করেছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়ের 'সুমনের গান, সুমনের ভাষ্য' নামে একটি চিত্তাকর্ষক ও অভিনব গ্রন্থ। ভূমিকাটি ছিল তাঁরই লেখা।

সম্মান ও পুরস্কার : ১. 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' গ্রন্থের জন্যে 'শিরোমণি পুরস্কার', ১৯৯৩।

২. আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন পুরস্কার, ১৯৯৬। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি, সংগীত, নৃত্য নাট্য ও দৃশ্যকলা; লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিশিষ্টতার জন্যে।

৩. নরসিংহ দাস পুরস্কার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ১৯৯৭। বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ হিসেবে 'পঞ্চগ্রামের কড়চা'-র জন্যে।

৪. সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত, ২০০১। বছরের শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য।

৫. আনন্দ পুরস্কার ২০০২। 'বাউল-ফকির কথা' গ্রন্থটির জন্য।

৬. বিমানবিহারী মজুমদার পুরস্কার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা প্রদত্ত, ২০০৩।

আগ্রহের বিষয়: সংগীত, শিল্প, লোকসংস্কৃতি, লোকধর্ম, চলচ্চিত্র, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য।

পছন্দ : গান শোনা, গান গাওয়া, গান নিয়ে লেখা ও বলা।

সুধীর চক্রবর্তী : গ্রন্থপঞ্জি

(কালানুক্রমিক)

১. অমৃত-যন্ত্রণা : প্রেমের কবিতার সংকলন। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। কলকাতা, পূর্বমেঘ প্রকাশ ভবন, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩/পুনর্বিন্যস্ত নতুন সংস্করণ : পৌষ ১৪১০, কলকাতা, ফটিক জল প্রকাশনী। [সম্পাদিত সংকলন]।

২. রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। মগরা, অচলায়তন প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৬৮। [সম্পাদিত নিবন্ধ]

৩. গানের লীলার সেই কিনারে। রবীন্দ্রসংগীতবিষয়ে নিবন্ধ সংকলন। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, নববর্ষ ১৩৯২। [সঙ্গীত]।

৪. সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৫ (১৩৯২ ব.) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]।

৫. কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ। কলকাতা, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা-র পক্ষে কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৫ (১৩৯২ ব.) [শিল্পকলা]

৬. বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮৬ (১৩৯৩ ব.) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]।

৭. আধুনিক বাংলা গান। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। কলকাতা, শ্রীমতী নমিতা মজুমদার (পরিবেশক : প্যাপিরাস), ১ বৈশাখ ১৩৯৪। [সম্পাদিত সংকলন]।

৮. গভীর নির্জন পথে। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জুলাই ১৯৮৯ (১৩৯৬ ব.) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]

৯. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ। কলকাতা পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৯ (১৩৯৬ ব.) [সাহিত্য]।

১০. বাংলা গানের সন্ধানে। কলকাতা অরুণা প্রকাশনী, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ [সঙ্গীত]।

১১. বাংলা দেহতত্ত্বের গান। কলকাতা প্রজ্ঞা প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯০ (১৩৯৭), দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি জানুয়ারি ২০০০ (১৪০৭)। [সম্পাদিত সংকলন]

১২. সদর-মফস্বল। কলকাতা, প্রজ্ঞা প্রকাশন, নভেম্বর ১৯৯০ (১৩৯৭ ব.) দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১ (১৪০৭) [আখ্যান]

১৩. অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। বাঁশবেড়িয়া, আজকের সাহিত্য, ২৮ মার্চ ১৯৯২ (১৩৯৯) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]।

১৪. নির্জন এককের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ শ্রাবণ ১৩৯৯। [সঙ্গীত]।

১৫. বাংলা গানের চার দিগন্ত। কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯২ (১৩৯৯ ব.)। [সঙ্গীত]।

১৬. ব্রাত্য লোকায়ত লালন। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৯২, (১৩৯৯ ব.); দ্বিতীয় সংস্করণ অগাস্ট ১৯৯৮ (১৪০৫ ব.)। [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]।

১৭. চালচিত্রের চিত্রলেখা। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৩/মাঘ ১৩৯৯। [শিল্পকলা]।

১৮. বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়। কলকাতা,প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৪ (১৪০০ ব) [সঙ্গীত]।

১৯. নির্বাস। কলকাতা, থীমা, ১৯৯৫ (১৪০২) [আখ্যান]।

২০. পঞ্চগ্রামের কড়চা। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, (১৪০২ ব.) [আখ্যান]

২১. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬

২২. দিলীপকুমার রায় : স্মৃতি-বিস্মৃতির শতবর্ষ। সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী। কলকাতা, ধ্রুবপদ (পরিবেশক : পুস্তক বিপণি), জুলাই ১৯৯৭ (১৪০৪ ব.)। [সম্পাদিত নিবন্ধ]।

২৩. দেবব্রত বিশ্বাসের গান। কলকাতা, রক্তকরবী, ১৯৯৭ (১৪০৪ ব.) [সঙ্গীত]

২৪. লালন। কলকাতা, প্যাপিরাস, শ্রাবণ ১৪০৫/আগস্ট ১৯৯৮। [কিশোর পাঠ্য]।

২৫. বাংলার বাউল ফকির। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৯৯ (১৪০৬ ব.) [সম্পাদিত নিবন্ধ]।

২৬. মাটি-পৃথিবীর টানে। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯৯ (১৪০৫ ব.)। [আখ্যান]

২৭. জনপদাবলি : ইহবাদী লোকায়ত মানবমুখী বাংলা গানের সংকলন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০মে ২০০১ (১৪০৭ ব.)। [সম্পাদিত সংকলন]।

২৮. বাউল-ফকির কথা। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০১ (১৪০৭ ব.) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]

২৯. বাংলা গানের আলোকপর্ব। কলকাতা, ইন্দিরা/সংগীত-শিক্ষায়তন, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮/২০০১। [সঙ্গীত]।

৩০. যৌনতা ও সংস্কৃতি। সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০০২ (১৪০৯ ব.)। [সম্পাদিত নিবন্ধ]।

৩১. গানে গানে গাওয়া। কলকাতা, অবভাস, জানুয়ারি ২০০৩ (১৪০৯ ব.)। [সঙ্গীত]।

৩২. বাংলার গৌণধর্ম : সাহেবধনী ও বলাহাড়ি। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও সম্মিলিত সংস্করণ মে ২০০৩ (১৪০৯ ব.) [লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি]।

৩৩. রূপে বর্ণে ছন্দে। শ্রীরামপুর, হুগলী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৩ (১৪০৯ ব.) [বিচিত্র]।

৩৪. লেখাপড়া করে যে। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৩/মাঘ ১৪০৯। [শিক্ষা]

সুধীর চক্রবর্তী : গ্রন্থপঞ্জি

(বিষয়ানুক্রমিক)

(ক) লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি

১। সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান।

পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৫। [২০]+ ২২৬ পৃষ্ঠা। আলোকচিত্র, মানচিত্র। ২৫ টাকা।

প্রচ্ছদ : বিজন ভট্টাচার্য

[উৎসর্গ] : 'দীর্ঘদিনের সাহিত্যসঙ্গী ও অভিভাবক'/ শ্রী অজিত দাস / অগ্রজপ্রতিমেষু

অধ্যায়ক্রম : পিতা আল্লামাতা আহ্লাদিনী / একটি বৃক্ষের দুটি শাখা / আমার নাম কুবির কবিদার / সেবার্থে পবমতত্ত্বে সেবাদাসী চাই / আমার দুখের কথা রইল গাঁথা / রূপে নয়ন ডুবল নারে

গান : মানুষতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব মাটিতত্ত্ব সমন্বয়তত্ত্ব / আত্মজৈবনিক আত্মদৈন্য আত্মবোধ / দেহতত্ত্ব বৃত্তিচেতনা যৌন-অনুষঙ্গ / জীবন সমাজ বাস্তবতা / বৈষ্ণব-অনুষঙ্গ

(প্রারম্ভে রয়েছে স্বীকৃতি, গবেষণা করার বিশেষ অনুমতিপত্র ও 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা।)

২। বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান।

পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৮৬। [১০] + ২১৪ পৃষ্ঠা। আলোকচিত্র, মানচিত্র। ৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

উৎসর্গ : শ্রীমান মনোরঞ্জন রায় / শ্রীমান রণজিৎ প্রামাণিক / স্নেহভাজনেষু

প্রসঙ্গক্রম : কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণমানুষ / কর স্থিতি ওহে পিতাপতি / হাড় হাড়ডি মণি মগজ / জলের সুঁই পবনের সুতো

গান

পরিশিষ্ট ১/পরিশিষ্ট ২/ নির্দেশিকা

[প্রারম্ভে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা।]

[পরবর্তীকালে 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদেব গান' এবং 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' এই বইদুটি একত্রিত হয়ে 'বাংলা গৌণ ধর্ম : সাহেবধনী ও বলাহাড়ি' নামে নতুন রূপে পরিমার্জিত সংস্করণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।]

৩। গভীর নির্জন পথে।

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জুলাই ১৯৮৯/ [১০]. ২৯৭ পৃষ্ঠা।

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল
[উৎসর্গ] : 'প্রয়াত পিতা মাতার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে'
[সূচী] : [১ পর্ব] মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে/ যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি / পৃথক, আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী / আপনঘরে পরের আমি / গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা
(২ পর্ব) গভীর নির্জন পথের উলটো বাঁকে
[প্রারম্ভে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা রয়েছে।]

৪। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ।

আজকের সাহিত্য, বাঁশবেড়িয়া, ২৮ মার্চ ১৯৯২। [২] - ১৩ পৃষ্ঠা। ২ টাকা।
প্রচ্ছদ স্কেচ : আশিস চৌধুরী / বর্ণলিপি : রমাপ্রসাদ দত্ত
(বর্ধমানের অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দিরের মূর্তি, মন্দির ভাস্কর্য ও মেলার কাহিনী।)

৫। ব্রাত্য লোকায়ত লালন।

পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ অগাস্ট ১৯৯৮। [১৬], ২৮৯ পৃষ্ঠা। ১০০ টাকা।
প্রচ্ছদপট, নামপত্র ও অধ্যায়শীর্ষের চিত্রণ : সোমনাথ ঘোষ/
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বর্ণলিপি : প্রবীর সেন / অন্যান্য স্কেচ : সুতনু চট্টোপাধ্যায় / মানচিত্র : রমাপ্রসাদ দত্ত
[সূচী] : স্বীকৃতি/ আত্মপক্ষ / উৎসের দিকে / দেশ, কাল ও পাত্র / যুক্তি ও প্রতিবাদ / নির্জন এককের গান? / ছড়িয়ে গেল সবখানে / উল্লেখপঞ্জি / পরিশিষ্ট / নির্দেশিকা

৬। পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব

পুস্তক বিপণি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। [৮] + ২১৬ পৃষ্ঠা। মানচিত্র। ৮০ টাকা।
প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী
স্কেচ : কৃষ্ণেন্দু চাকী, সুতনু চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখ শাজাহান, বাপুন দত্ত।
[উৎসর্গ] : আবুল বাশার ও সাহানা-কে/ দাদা
বিষয়ক্রম : ১/ মেলার চিত্র আর চালচিত্র
২/ দেবতার লোকায়ন : অগ্রদ্বীপ / কার্তিকের লড়াই : গাঙ্গেয় জনপদ / সাপের মেলায় উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ / রাসযাত্রা থেকে পটপূর্ণিমা : জনপদের ছন্দ / জগদ্ধাত্রীর সন্ধানে : কাগ্রামে
৩/ দাতাপীরের মেলা : পাথরচাপড়ি / মানুষের সত্যতত্ত্ব..

ঘোষপাড়া / খৃস্টিয় মেলায় শিকড়ের টান / কবির নামে মেলা : জয়দেব কেঁদুলি

[প্রারম্ভে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা ও 'স্বীকৃতি' রয়েছে।]

৭। **বাউল ফকির কথা।**

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র / তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০১ [১৪০৭ ব.]। [২২]+ ৪০৪ + [৩] পৃষ্ঠা, রঙিন আলোকচিত্র, মানচিত্র, স্বরলিপি ও পরিচয়-সারণী। ২৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

[উৎসর্গ] : শ্রী অমিয়কুমার বাগচী/ শ্রীমতী যশোধরা বাগচী / সৌমিত্রেষু

বিষয়ক্রম : 'আমি বিপুল কিরণে ভবন করি যে আলো'/ 'আমি আউলও নই বাউলও নই' / 'বাউল আর বৈষ্ণব এক নহে তো ভাই'/ 'আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা'/ 'যে নারী বিচিত্র বেশে' / 'ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি' / ফকিরের জবানি / ফকিরের আত্মকথা / পুরুলিয়ার 'সাধু'গান / জেলাওয়ারি সাধক বাউল, গায়ক বাউল ও বাউল নারীশিল্পীদের পঞ্জি / বাউল গানের নানাবর্গ / বাউল-ফকিরি গানের সুর প্রসঙ্গে আলাপচারি / বাউল-ফকিরি গানের স্বরলিপি ও স্বরলিপি প্রসঙ্গে

(প্রারম্ভে 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র'-র সচিব প্রদীপ ঘোষ লিখিত প্রস্তাবনা এবং লেখকের ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপি 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা রয়েছে।)

৮। **বাংলা গৌণধর্ম / সাহেবধনী ও বলাহাড়ি।**

পুস্তক বিপণি, সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান / প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৫ / বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান / প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬; প্রথম পরিবর্ধিত পরিমার্জিত ও সম্মিলিত সংস্করণ মে ২০০৩ [১৪০৯ ব.]। (১৬), ২৭২ পৃষ্ঠা। মানচিত্র। ৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

(উৎসর্গ) : স্নেহভাজন / দীপংকর কুমার / অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়-কে/ প্রত্যুপহার

সূচি : 'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী' / 'কলিকালে মোহেরপুরে পূর্ণমানুষ' / 'কলিকালে বলে দুলালচাঁদের জয়' / 'কর স্থিতি ওহে পিতাপতি' / 'হাড় হাড়ডি মণি মগজ' / 'আমার নাম কুবির কবিদার' / 'সেবার্থে পরমতত্ত্বে সেবাদাসী চাই' / 'আমার দুখের কথা রইল গাঁথা'/ 'রূপে নয়ন ডুবল না রে'/ 'জলের সুঁই পবনের সুতো' সংযোজন / পরিশিষ্ট ১/ পরিশিষ্ট ২/ পরিশিষ্ট ৩/ নির্দেশিকা

[প্রারম্ভে রয়েছে 'আত্মপক্ষ' ও 'স্বীকৃতি'।]

(খ) সঙ্গীত

১। গানের লীলার সেই কিনারে; রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নিবন্ধ সংকলন।

অরুণা প্রকাশনী, নববর্ষ ১৩৯২ (১৯৮৬)। [৮] + ২০৭ পৃষ্ঠা। ২৪ টাকা।

প্রচ্ছদপট : প্রবীর সেন

[উৎসর্গ] : নিবেদিতাকে / 'মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে'

বিষয়ক্রম : সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ : বৃক্ষ ও বনস্পতি / গানের দুই রাজা : রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বার্নস / রবীন্দ্রসংগীত . বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব / কবিতা আর গানের আকাশ · রবীন্দ্রনাথ / গানে ছবির প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথ / 'দেওয়া নেওযা ফিরিয়ে দেওয়া' / কোন্ ভাঙনের পথে এলে / বাংলা নাটকেব গান, রবীন্দ্র নাটকের গান / পায়ে চলার শিল্পে বাক্যের শিল্প / রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব

[প্রারম্ভে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা রয়েছে।]

২। বাংলা গানের সন্ধানে

অরুণা প্রকাশনী, ২৫ বৈশাখ ১৩৯৭ (১৯৯১)। [৪] + ৬ + [৪] + ২০৫ পৃষ্ঠা। ৩০ টাকা।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

[উৎসর্গ] : অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় / শ্রদ্ধাভাজনেষু

বিষয়ক্রম :১/ জাগো জাগো রে জাগো সংগীত / পুরনো কলকাতার গান / গান - জাগানিয়া

২/ 'এ কি মধুর ছন্দ'; দ্বিজেন্দ্রলালের গান / 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে',; রজনীকান্তের গান / 'কে হে তুমি সুন্দর', অতুলপ্রসাদের গান

৩/ স্ববিরোধের শিল্প : আধুনিক বাংলা গান

[প্রথমে 'আত্মপক্ষ' নামে ৬ পৃষ্ঠার ভূমিকা মুদ্রিত।]

৩। নির্জন এককের গান / রবীন্দ্র সংগীত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২ শ্রাবণ ১৩৯৯ (১৯৯৩)। [১২], ১৪৮ পৃষ্ঠা। ৩০ টাকা।

প্রচ্ছদন : প্রবীর সেন

[উৎসর্গ] : শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ/ শ্রদ্ধাভাজনেষু

বিষয়সূচি :[আত্মপক্ষ] /১/ রবীন্দ্রসংগীত তথ্য ও তত্ত্ব ১৯৬১-১৯৮৬ / রবীন্দ্রসংগীত : নানা মনের চোখে

২/ 'রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে' / 'সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান'

৩/ রবীন্দ্রসংগীতের সঞ্চারী

৪। বাংলা গানের চার দিগন্ত

অনুষ্টুপ, বইমেলা ১৯৯২ (১৩৯৮ ব.)। (১২), ১৩৪ পৃষ্ঠা। ৩০ টাকা।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

[উৎসর্গ] : প্রথম যৌবনের বন্ধু / তারাপ্রসন্ন ঘটক / এবং / পরিণত বয়সের বন্ধু / তরুণকান্তি সেন-কে / ভালবেসে।

বিষয়ক্রম : আত্মপক্ষ

১/ বাংলা দেহতত্ত্বের গানের ধারা / বাংলা গণসংগীতের ধারা / যে গান আমাদের নেই

২/ নির্জন এককের গান

৫। বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪ (১৪০০ ব.)। (১২), ১২২ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য পরিকল্পনা : চিত্রদেব মজুমদার।

অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

[উৎসর্গ] : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / বন্ধুবরেষু

বিষয়ক্রম :আত্মপক্ষ / বাংলা ফিল্মের গান / সত্যজিৎ রায়ের সংগীত-বক্ষা/ রবীন্দ্রসংগীত ও সত্যজিৎ রায় / সত্যজিৎ ও গানের প্রয়োগ / গুপী গাইনের গান / সাক্ষাৎকার।। সৌমিত্র চট্টেপাধ্যায় / সাক্ষাৎকার।। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত / উল্লেখপঞ্জী

৬। দেবব্রত বিশ্বাসের গান

রক্তকরবী, ১৯৯৭ (১৪০৪ ব.)। (২), ২২ পৃষ্ঠা। ৫ টাকা।

[প্রচ্ছদ] : [ ]

(ছোট মাপের একটি প্রবন্ধ-পুস্তিকা।)

৭। বাংলা গানের আলোকপর্ব

ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮/২০০১। (৮), ১২৮ পৃষ্ঠা। ৬০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সুবিমল লাহিড়ী

[উৎসর্গ] : যতীন্দ্রনাথ ও পারমিতা মুখোপাধ্যায়-কে / প্রীতি উপহার

সূচি : ১/ গানের ভিতর দিয়ে

২/ শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী / গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা গান

৩/ সে-আগুন ছড়িয়ে গেল

৪/ দিলীপকুমার রায়ের গান / নজরুল গীতি : সংকটের উৎস

/ আধুনিক বাংলা গান

[প্রথমে 'আত্মপক্ষ' ও 'প্রকাশকের নিবেদন' মুদ্রিত হয়েছে।]

৮। গানে গানে গাওয়া

অবভাস, কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৩ (১৪০৯ ব.)। [১২], ১৭৫ পৃষ্ঠা। ৭৫ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

[উৎসর্গ] : গানের রসিক / সুভাষ চৌধুরী/ ও/ সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়-কে/ বন্ধুতার টানে

.সূচি : [আত্মপক্ষ] ১/ গানের সদর-অন্দর / গানের চেহারা ২/ গান নিয়ে ভাবনা / রবীন্দ্রনাথের গান / অতুলপ্রসাদের গান : পুনর্বিবেচনা / বাংলা গানের গল্প / বাংলা গানের ভাষা / বাংলা গানের বিশ্বায়ন

৩/ গানের মানুষ / অব্রাত্যজনের গান / শুদ্ধান্তঃপুরের আচার্য / গান দিয়ে দ্বার খোলা / অন্তর্মনের গায়িকা

(গ) সাহিত্য

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় / স্মরণ বিস্মরণ

পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৮৯ (১৩৯৫ ব.)। (৮), ১৯২ পৃষ্ঠা। ৪০ টাকা

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

[উৎসর্গ] : আমার অধ্যাপক/ ড. ভবতোষ দত্ত / শ্রদ্ধাভাজনেষু

প্রসঙ্গক্রম : অবহেলিত উত্তরাধিকার / গদ্যের কড়া হাতুড়ি, পদ্যে/ স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব / দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি / বাংলা গানে, বিলাতি চাল / পুত্রের চোখে পিতা / পরিশিষ্ট / নির্দেশিকা

[প্রারম্ভে 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা মুদ্রিত।]

(ঘ) শিক্ষা

১। লেখাপড়া করে যে

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৩/ মাঘ ১৪০৯। [১২], ১৮৪ পৃষ্ঠা। ৮০ টাকা।

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ দেব

[উৎসর্গ] : আমার সহাধ্যায়ী / অমিতাভ দাশগুপ্ত, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, তারাপদ রায়, নিত্যপ্রিয় / ঘোষ, সুনন্দ সান্যাল, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, শীতল / চৌধুরীকে। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি স্মৃতি

দিয়ে ঘেরা সময়ের স্মরণে।

সূচি : [আত্মপক্ষ] / ১/ সেই ট্রাডিশন সমানে / পাখি সব করে রব / ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে
২/ টিউশনি পড়া / শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে / লেখাপড়া করে যে
৩/ আমছাত্রদের বৃত্তান্ত / ওরে ভীরু, তোমার হাতে

(ঙ) আখ্যান

১। সদর-মফস্বল

প্রজ্ঞা প্রকাশন, নভেম্বর ১৯৯০ (১৩৯৭ ব.)। (১০) - ২৩৮ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা (প্যাপিরাস সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১ (১৪০৭ ব.)। ১০০ টাকা।)

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

স্কেচ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

বর্ণলিপি : অজয় মিশ্র

[উৎসর্গ] : শ্রীমান্ ধীরেন দেবনাথ / স্নেহভাজনেষু

রচনাক্রম :/সদর মফস্বল / শহর-অশহর/ চেনা-অচেনা/ ধর্ম-অধর্ম/ জীবন-জীবিকা/ শিক্ষা-অশিক্ষা

['আত্মপক্ষ' শিরোনামে ভূমিকা।]

[প্যাপিরাস সংস্করণে স্কেচগুলি বাদ গেছে।]

২। নির্বাস / পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় / ও / খালেদ চৌধুরী / চিত্রিত

থীমা, (১৯৯৫), (১৪০২ ব.)। (৮) + ১৯৭ পৃষ্ঠা। (১২০ টাকা)।

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

[উৎসর্গ] : শঙ্খ ঘোষ / অগ্রজপ্রতিমেষু

[সূচী] : ১/ গ্রামের পাঁচালি / নগরতলি / কলিকাতা কোলাজ
২/ প্রমোদ ভ্রমণ / চেরাগ আর রোশনি
৩/ নির্বাস /সরযূর সাক্ষাৎকার

[প্রথমে 'আত্মপক্ষ' নামে ভূমিকা।]

৩। পঞ্চগ্রামের কড়চা

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা ১৯৯৫ (১৪০১ ব.)। (১২), ১৬০ পৃষ্ঠা। ৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

[উৎসর্গ] : আমার দাদাদের / 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি'

বিক্রয়ক্রম : (আত্মপক্ষ)

১/ গ্রাম থেকে গ্রামে / গ্রামে-গ্রামান্তরে

২/ গ্রাম শহর ▢ শহর ▢ গ্রাম

৩/ গ্রামের পাঁচালি

৪। মাটি-পৃথিবীর টানে

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৯ (১৪০৫ব.)। (১০), ১৮০ পৃষ্ঠা। ৬০ টাকা।

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

[উৎসর্গ] : শ্রেয়া আর সন্দীপ - কে

বিষয়ক্রম . আত্মপক্ষ/'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকুবি'/দুলাল দত্ত যুগ যুগ জীয়ে/ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে/'মানুষ মানুষ সবাই বলে'/একজন আস্ত মানুষ/মানুষের যাপন বৃত্তান্ত/পুকুরের মত মানুষ/অন্যতব মানুষ/অসম্প্রদায়ী মানুষ/ লোকায়ত মানুষ/জনারণ্যে অন্য মানুষ

(চ) বিচিত্র

১। রূপে বর্ণে ছন্দে

সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়াবি ২০০৩ (১৪০৯ ব.)। (১০), ২১৯ পৃষ্ঠা। ১০০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

[উৎসর্গ] : উদ্যোগী পুস্তক প্রকাশক/শ্রীমান অনুপকুমার মাহিন্দাব/ও/নিঃস্বার্থ পুস্তকপ্রেমী/শ্রীমান রমাপ্রসাদ দত্ত-কে/স্নেহোপহার

সূচিপত্র : ১/ হিন্দু মুসলমানেব কিস্‌সা/ভাবনা আমার পথ ভোলে/বিশ্বায়ন ও বাংলার গ্রাম

২/ সীমানা ভাঙা ধর্ম/আসলে কি শহুরে বুদ্ধির গোপন ছক/তৃতীয় বাংলা ভুবন/জল শুধু জল

৩/ কভি চাল কভি গম/গা নেই, গয়না আছে/ 'শ্রদ্ধাঞ্জলী'/স্টেশনে জাগিছে শ্যামা/কমিউটারের সংজ্ঞা/নিত্যযাত্রার পাঁচালি/ রেলগাড়ি ধায়'

৪/ জাদু-বাস্তবের শৈশব/আমার সন্তান যেন থাকেদুধে ভাতে/ চোখের অন্বেষা/ লোকায়তের নেপথ্যে/ আকাশবাণী/আগমনীর আগমনে/চিরসখা, ছেড়ো না/বই

৫/ গভীর গোপন

[প্রথমে 'আত্মপক্ষ' নামে ভূমিকা]

(ছ) কিশোর পাঠ্য

১। লালন

প্যাপিরাস, শ্রাবণ ১৪০৫/আগষ্ট ১৯৯৮। (৬), ৬৪ পৃষ্ঠা। ২০ টাকা।

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

[উৎসর্গ] : শ্যামল-ঝর্ণা-চয়নকে/সস্নেহে

[৮ টি অধ্যায়ে লালন ফকিরের জীবনী লেখা হয়েছে মুলত ছোটদের জন্যে। বইয়ের প্রারম্ভে 'নিবেদন' নামে ছোট ভূমিকা রয়েছে।]

(জ) শিল্পকলা

১। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প/ও/মৃৎশিল্পী সমাজ

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতা-র পক্ষে কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৫ (১৩৯২ ব.। [১৪]+১০৭ পৃষ্ঠা। মানচিত্র, আলোকচিত্র। [৪০ টাকা]।

প্রচ্ছদ : অসিত পাল

[উৎসর্গ] : প্রয়াত জেহাদন নবী মোল্লার স্মৃতিতে

[সন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সস-এর কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ সিংহ লিখিত মুখবন্ধ/ভূমিকা/স্বীকৃতি।]

শেষে ৩টি পরিশিষ্ট ছাড়াও রয়েছে কয়েকজন মৃৎশিল্পীর বক্তব্য ও তথ্য, কয়েকজন মৃৎশিল্পী পত্নীর বিবরণ, 'কৃষ্ণনগর মৃৎশিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর তথ্য ও হিসাব, পরিবারের গঠন প্রকৃতি, লোকসংখ্যা, রোজগারী লোকের বিন্যাস, মাসিক মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে পারিবারিক বিন্যাস, বৃত্তিগত বিন্যাস, শিক্ষাগত বিন্যাস, সাক্ষরতার হার, নারীশিক্ষার অবস্থানুযায়ী পরিবারের বিন্যাস-সারণী। সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার নির্বাচিত তালিকা/নির্দেশিকা।]

২। চালচিত্রের চিত্রলেখা

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৩/মাঘ ১৩৯৯। [১২], ৯৫ পৃষ্ঠা। রঙিন ও সাদা-কালো আলোকচিত্র। ৪০ টাকা।

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

অন্যান্য ছবি : দেবব্রত ঘোষ, সুশোভন অধিকারী, আশিস চৌধুরী

[উৎসর্গ] : 'বারোমাস' সম্পাদক অশোক সেন/এবং/'এক্ষণ' সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য-কে

বিষয়ক্রম : আত্মপক্ষ/চালচিত্রের কথা/চালচিত্রের চিত্রকর

(ঝ) সম্পাদিত সঙ্কলন

১। অমৃত-যন্ত্রণা/সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত/প্রেমের কবিতার সংকলন

পূর্বমেঘ প্রকাশ ভবন, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ (১৯৫৬)। (৪), ৩৮, [২] পৃষ্ঠা। ১ টাকা।

প্রচ্ছদপট শিল্পী : সুনীল চক্রবর্তী

প্রকাশে সহায়তা করেছেন : অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিত্যপ্রিয় ঘোষ/নির্মাল্য আচার্য। সুস্মিতা আনওয়ার। সুফিয়া চৌধুরী।

[শেষ প্রচ্ছদে উল্লেখ ছিল, 'বিশ্ববিদ্যালয-সংশ্লিষ্ট সতেরোজন কবির প্রেমের কবিতার এই সংকলন।]

ফটিক জল প্রকাশনী, পুনর্বিন্যস্ত নতুন সংস্করণ : পৌষ ১৪১০ (২০০৩)। ১১২ পৃষ্ঠা। আলোকচিত্র, পাণ্ডুলিপি সংস্করণের যথাযথ প্রতিলিপি। ৫০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

আলোচিত্র : শীতল চৌধুরী

[উৎসর্গ] : বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায়/যাঁরা নিজেদেব মেলাতে চান

বিন্যাস : আত্মপক্ষ/শিশির কুমার দাশ ও 'অমৃত-যন্ত্রণা'-র কাহিনী/'অমৃত-যন্ত্রণা' পান্ডুলিপি সংস্করণের যথাযথ প্রতিলিপি/'অমৃত-যন্ত্রণা' প্রথম সংস্করণের পাঠ/পরিশিষ্ট ১/পরিশিষ্ট ২

২। আধুনিক বাংলা গান/ সুধীর চক্রবর্তী/সম্পাদিত

শ্রীমতী নমিতা মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবেশক : প্যাপিরাস, ১ বৈশাখ ১৩৯৪ (১৯৮৮)। (৮), ১৮৬ পৃষ্ঠা। ২৫ টাকা।

প্রচ্ছদশিল্পী : দেবব্রত ঘোষ

সূচি : সংকলন প্রসঙ্গে আত্মপক্ষ/প্রস্তাবনা/রবীন্দ্রনাথ' ঠাকুর/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়/রজনীকান্ত সেন/অতুলপ্রসাদ সেন/সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়/হেমেন্দ্রকুমার রায়/তুলসী লাহিড়া/দিলীপকুমার রায়/কাজী নজরুল ইসলাম/সজনীকান্ত দাস/হীরেন বসু/প্রেমেন্দ্র মিত্র/শৈলেন রায়/অজয় ভট্টাচার্য/বাণীকুমার /সুবোধ পুরকায়স্থ/অনিল ভট্টাচার্য/নিশিকান্ত/ বিমলচন্দ্র ঘোষ/প্রণব রায়/জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র/হেমাঙ্গ বিশ্বাস/বিনয় রায়/পরেশ ধর/মোহিনী চৌধুরী/ সলিল চৌধুরী/শ্যামল গুপ্ত/ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
জীবনীপঞ্জি

৩। বাংলা দেহতত্ত্বের গান/সুধীর চক্রবর্তী/সম্পাদিত

প্রজ্ঞা প্রকাশন, বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯০ (১৩৯৬ ব.) [৬] [৮] ১১২। পৃষ্ঠা। ৩২ টাকা।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সুশোভন অধিকারী

বর্ণলিপি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বিষয়ক্রম : সংকলন প্রসঙ্গে/বাংলা দেহতত্ত্বের গান : ভূমিকা/সংকলিত গান ও গীতিকার/গীতি সংকলন/অর্থসংকেত

৪। **জনপদাবলি/ইহবাদী লোকায়ত মানবমুখী/বাংলা গানের সংকলন/সুধীর চক্রবর্তী/সম্পাদিত**

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০মে ২০০১ [১৪০৭ ব.]। [৬]-২১৫ পৃষ্ঠা। ৭০ টাকা।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

[উৎসর্গ] : শ্রী অশোক রায়/শ্রীনুপুরিকা রায়/স্নেহাস্পদেষু

[সূচী] : নিবেদন/আত্মপক্ষ/বর্ণনুক্রমিক সূচি:গীতিকার ও গান সহায়ক বই/গীতিকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য ও পদাংশের টীকা ও

[দুই বাংলার অনেক জনপদ থেকে সযত্নে আহরিত ৬৫ জন গীতিকারের ১৫০টি গানের সংকলন।]

(এও) সম্পাদিত নিবন্ধ

১। **রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প/সুধীর চক্রবর্তী/সম্পাদিত**

অচলায়তন প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৬৮ (১৯৬১)। [১৬]+২০৮ পৃষ্ঠা। ৫ টাকা।

প্রচ্ছদ : সুনীল চক্রবর্তী

[বীরেন পাল কৃত মাটির রবীন্দ্র মূর্তির আলোকচিত্র ব্যবহার করে প্রচ্ছদপট ও নামপাত্র অঙ্কন করেছেন সুনীল চক্রবর্তী। আলোকচিত্র তুলেছেন সত্যেন মণ্ডল।]

উৎসর্গ : 'আজি হতে শতবর্ষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/ কৌতূহল ভরে।'

২। **দিলীপকুমার রায়/স্মৃতি-বিস্মৃতির শতবর্ষ/সম্পাদক/সুধীর চক্রবর্তী**

ধ্রুবপদ, পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, জুলাই ১৯৯৭ (১৪০৪ ব.)। [৮], ২৩১ পৃষ্ঠা। আলোকচিত্র। ৮০ টাকা।

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

সূচি : [প্রস্তাবনা/স্বীকৃতি]

বাঁশি। জয় গোস্বামী/ভাবের নতুন জগৎ। সাহানা দেবী/সুরভিত স্মৃতি : দাদাজী। ইন্দিরা দেবী/দিলীপকুমার জন্মশতবর্ষ। অন্নদাশঙ্কর রায়/দিলীপকুমার গানে, প্রাণে ও প্রেমে। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়/'এ ধরায় দে বিদায় অধরায় প্রাণ চায়'। অশোক মিত্র/দিলীপকুমার রায়। পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ছান্দসিক দিলীপকুমার। নীলরতন সেন/তীর্থঙ্কর দিলীপকুমার। অলোক রায়। সুর বনাম সুরবিহার। শঙ্খ ঘোষ/দিলীপকুমারের গান। সুধীর

চক্রবর্তী/দিলীপকুমার রায়ের সুর। সুমন চট্টোপাধ্যায়/গ্রামাফোন রেকর্ডে দিলীপকুমার। স্বপন সোম

দিলীপকুমারের পত্রসম্ভার/দিলীপকুমার রায় : জীবনপঞ্জি ও বংশতালিকা

পুনর্মুদ্রণ/পত্রপ্রবন্ধ : প্রসঙ্গ লঘুগুরু ছন্দ/কান্তকবি ও ভক্তিসাধক

৩। বাংলার বাউল-ফকির/সুধীর চক্রবর্তী/সম্পাদিত

পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ১৯৯৯ (১৪০৬ ব.)। [৮], ২৬৫ পৃষ্ঠা। চিত্র। ১২৫ টাকা

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ।

[উৎসর্গ] : লালন শাহ্ ফকির/হাসন রজা উদাস/নবীনদাস খ্যাপা/তিন সাধকেব চিরায়ত স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয় সূচি : সংকলন ও লেখক প্রসঙ্গে/আত্মপক্ষ

বাউল-ফকির বিষয়ে বাঙালির প্রথম সরেজমিন লেখা-মৌলবী আবদুল ওয়ালী/সুফি-সন্ত-বাউল-বঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/পশ্চিমবঙ্গে বাউল ধর্মবিষয়ক অধ্যয়নের বিভিন্ন ধারা-রমাকান্ত চক্রবর্তী/বাউল চিনি কী প্রকারে-অরুণ নাগ/গুপ্ত দেহ-সাধনা এবং তার সমাজতত্ত্ব শক্তিনাথ ঝা/বাউলের মূল্যবোধ.কিছু ভাবনা-বিকাশ চক্রবর্তী / বাউলগানে রূপকল্প-রণজিৎ সিংহ/বাংলাদেশের বাউলদের চালচিত্র-আবুল আহসান চৌধুরী/বাউল গান : একটি মধ্যবিত্ত ভাবনা-আহমদ মিনহাজ

বাউল জীবনের কথা।। বাউলের চরণদাসী-লীনা চাকী/বাউল ও বিদেশীনি লিয়াকত আলি/বাউলের আউলকথা-উৎপল চক্রবর্তী/গোপ্য সাধনার কথকতা-অনুপম দত্ত

সাক্ষাৎকার/প্রসঙ্গ : বাংলার বাউল গান-খালেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। পুনর্মুদ্রণ।। বাউল প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত-র বক্তব্য/বাউলগান বিষয়ে রবীন্দ্রভাষ্য/'বাউল ধ্বংসে ফৎওয়া'য় ব্যক্ত মতামত/বাউলপ্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস/বাউলতত্ত্ব : আহমদ শরিফ/বাউল-তত্ত্বের পূর্বাভাষ : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল/বাউলগান বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য চিত্রকরসূচি। বর্ণানুক্রমিক।। অনুপ রায়/অপূর্ব সেনগুপ্ত/কামরুল হাসান /কে জি সব্রহ্মণ্যম/কৃষ্ণেন্দু চাকী/খালেদ চৌধুরী/গোপাল সান্যাল/ গৌতম ঘোষদস্তিদার/তপন কর/দিনকর কৌশিক/দেবব্রত ঘোষ/ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/দেবাশীষ দেব/নরোত্তম রায়/নন্দলাল বসু/পূর্ণেন্দু পত্রী/যুধাজিৎ সেনগুপ্ত/রণেন আয়ন দত্ত / রামকিঙ্কর / রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়/লালুপ্রসাদ সাউ/বিশ্বজিৎ মণ্ডল/শ্যামলবরণ সাহা/সতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/সমর মুখোপাধ্যায়/সনৎ কর/স্বপন

বিশ্বাস/সুধীর বিশ্বাস/সুব্রত চৌধুরী/ সোমনাথ ঘোষ/সোমনাথ হোর/হিরণ মিত্র

৪। যৌনতা ও সংস্কৃতি/সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০০২ (১৪০৯ ব.)। [১৭], ৩৪৯ পৃষ্ঠা। রঙিন ও সাদা-কালো আলোকচিত্র।.২৫০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সোমনাথ ঘোষ

[উৎসর্গ] : শ্রী তপন মুখোপাধ্যায়/শ্রী ভারতী মুখোপাধ্যায়কে/সস্নেহে

সূচিপত্র : [প্রস্তাবনা/সংকলন প্রসঙ্গে/লেখক পরিচয়]

১/ যৌনতা ও সংস্কৃতি-প্রদীপ বসু/আদিম যৌন-ভাবনা ও যৌন-প্রতীক-দিব্যজ্যোতি মজুমদার/ভারতের রূপসংস্কৃতি ও যৌনতা-দিলীপকুমার ভারতী/ভারতীয় সংস্কৃতিতে যৌনতা-কিছু 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো'! সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/'শ্বেতসভ্যতা' ও 'কৃষ্ণযৌনতা' : সার্টজে বার্টম্যানকে খুন করল কে?-ঈপ্সিতা চন্দ/ লোকায়ত দেহতত্ত্ব-শক্তিনাথ ঝা/আদিরসাত্মক বাংলা গান : ১৭৫০-১৯০০-রমাকান্ত চক্রবর্তী/ভাবতীয় চিত্রকলায় আদিরস-সন্দীপ সরকার/যৌনতা : নারীবাদের আলোয়-যশোধরা বাগচী/সমকামিতা ও সংস্কৃতি : দেশ ও বিদেশ-অভিজিৎ গুপ্ত/চলচ্চিত্র, যৌনতা, দর্শকসমাজ-এস.ভি.শ্রীনিবাস/সৌন্দর্য ব্যবসার অন্তরালে-সুচিত্রা ভট্টাচার্য / বলিউডের প্রেমের ছবি : অন্দর বাহিরের সূত্র-শিলাদিত্য সেন

২/ যৌনতা : বাংলা কথাসাহিত্য-সুমন ভট্টাচার্য/নাটকে যৌনতা : বাংলা নাটকে-শেখর সমাদ্দার/যৌনতার ক্লাস ও বাংলা কবিতা-জহর সেনমজুমদার/রবীন্দ্র চিত্রকলায় নগ্ন পুরুষ ও নারী-সুশোভন অধিকারী/বাংলা গানের শরীর অশরীর রঙ্গন চক্রবর্তী/নারী আলোচনায় যৌনতা বনাম সংস্কৃতি : তসলিমা নাসরিনের সাহিত্য-সুতপা ভট্টাচার্য/ধরি মাছ না ছুঁই পানি : বাঙালি সমাজে যৌনতা স্ল্যাং-এ ও প্রবাদে-অভ্র বসু

৩/ কলকাতার যৌনপল্লী-দেবাশিস বসু/যৌনশিক্ষা : একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা-স্বপ্নময় চক্রবর্তী/যৌন কাজ কি কাজ? স্মরজিৎ জানা।

গ্রন্থ আলোচনা

(ক) লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি

ক. ১ সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান

ক. ১.১ আলোচক : শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ পৃথিবীর পয়লা নম্বর অধ্যাত্মবাদের দেশ—এ অপবাদটা আমরা প্রায় বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছি। অধ্যাত্মবাদের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের স্বীকৃতি থেকেই মেনে নিতে হয় যে এ দেশের সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মৌল অন্বিষ্ট হলো ঈশ্বরানুসন্ধান। সেই অনুসন্ধান প্রয়াসে ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে, ঈশ্বর সাধনার পথ এবং পদ্ধতি নিয়ে মার্গ বৈচিত্র্য আর মতপার্থক্য আছে। এবং আছে বলেই সেইখানে ভক্তি-আপ্লুত তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের যত ভিড় আর তর্ক। এ ব্যাপারে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই। এবং কৌতূহল আছে বলেই এ নিয়ে দীর্ঘকাল বহু গবেষণা আর অনুসন্ধান, আলোচনা আর গ্রন্থ-রচনা অব্যাহত রয়েছে। এ গবেষণা বা আলোচনা আমাদের হয়তো বা ঈশ্বর-সমীপবর্তী হতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করে, ভজন-পূজা-সাধন পদ্ধতির অনেক দুরূহ রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়, সব শেষে অধ্যাত্মবাদ-আকীর্ণ ভারতভূমির রহস্যময় অস্তিত্ব প্রসঙ্গে আমাদের মনের মাঝে এক ত্রস্ত সম্ভ্রম জাগায়। হয়তো বা এ জাতীয় গবেষণা-আলোচনার সেটাই একান্ত লক্ষ্য। এবং লক্ষ্য বলেই পল ব্রান্টনের 'এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া' বা প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' জাতীয় গ্রন্থ, আমাদের দেশ-পরিচয় সমৃদ্ধি বা সাহিত্য রসপিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যত বা না হয়, আমাদের অধ্যাত্ম অনুসন্ধিৎসার ব্যাপারে অনেক বেশি আবশ্যিক আশ্রয় গ্রন্থ। দৈবরহস্য উদ্ঘাটন বা ঈশ্বরসমীপবর্তী হবার অভীপ্সা যেখানে ভগবদ্‌বিশ্বাসী জনসমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত, সেখানে আমাদের কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসার মোড় বিজ্ঞানসম্মিতির পথে ফেরানো সহজসাধ্য নয় কোনোক্রমেই। নয় বলেই অক্ষয়কুমার দত্তর (১৮২০-১৮৮৬) 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩)-এর মতো গ্রন্থে বর্ণিত, তেত্রিশ কোটি উপাস্য দেবদেবী সম্বন্ধে ভক্তিব্যাকুল মানুষের দেশে, তেত্রিশ কোটি না হোক কয়েক সহস্র উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে আমরা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছি। অথচ এই সহস্রাধিক উপাসক-সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে ভারতীয় জনজীবনের প্রকৃত ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ—তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং আর্থনীতিক ভিত্তিভূমির পরিচয়। কিন্তু এ যাবৎ এ কাজে আমাদের গবেষক-সম্প্রদায়ের প্রয়াস খুব প্রশংসাযোগ্য তা বলা চলে না। নইলে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের পর ঐ ধারার একটি বইয়ের জন্য আমাদের একশো পনের বছর অপেক্ষা করতে হতো না।

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বা তাঁর বইয়ের নাম অক্ষয়কুমার দত্তর সূত্রে একত্র উচ্চারণের পিছনে উভয় গ্রন্থকে সমমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। উভয়

গ্রন্থেব পরিক্রমণসূত্র এক নয়। অক্ষয়কুমার তাঁর গ্রন্থে উপাসক-সম্প্রদায়ের সামূহিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, আর শ্রীচক্রবর্তী তাঁর ২২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে একটিমাত্র সম্প্রদায় নির্বাচন করেছেন, যার সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে পঁচিশটি বাক্যের অধিক ব্যয় কবা হয় নি। শ্রীচক্রবর্তী লোকসংগীত সংগ্রহের তাগিদে তিন হাজার গান সংগ্রহ করে 'গানের ভিতর দিয়ে' লোকজীবনের অন্তরের ইতিহাস সন্ধানে প্রয়াসী। তিনি লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়কে বুঝতে চেয়েছেন তাদের গানের চাবি দিয়ে। সুধীরবাবু গান খুঁজতেই বেরিয়েছিলেন। যে পথে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, মনসুরউদ্দিন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মতিলাল দাস আর আশুতোষ ভট্টাচার্য আমাদের সঞ্চয়ের গোলাবাড়িকে ভরিয়েছেন, সে পথে তিনি হাজার গান সংগ্রহ করে তাঁর অস্বস্তি কাটে না যে গানগুলির অন্দরমহল তাঁর অজানা রয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধন-ভজন পদ্ধতির গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনে এক দিকে যেমন অধ্যাত্মবাদের মর্মোদ্ধারের নামে দৈববিশ্বাসের শীতলবারিতে অবগাহনের পরিতৃপ্তি, অন্য দিকে আবার গ্রাম থেকে সংগৃহীত 'গ্রাম্য গান' মাত্রেরই কাব্যিক উৎকর্ষ বিচারের সূত্রে পুঁথিপড়া জীবনের অহমিকা প্রকট হয়ে পড়ে। এই দ্বিবিধ বিপদ থেকে সমদূরত্বে থাকবার মানসে সুধীববাবু তাঁর আপন বাসভূমির পরিচিত পরিবেশে যে পাঁচটি গৌণধর্ম বহুলাংশে গাননির্ভর তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে ক্রমে বুঝতে পারেন যে তাঁর সংগৃহীত গানগুলিব ভিতরে রয়ে গেছে নানা নিগূঢ় সাংকেতিকতা, বিশেষ গৌণধর্মের বিশ্বাস আর আচরণবাদ এবং সমাজ ইতিহাসের একটা স্তরান্বিত পরম্পরা। এই বিবেচনায় সুধীরবাবুর অন্বেষণ লোকসংগীতের সাহিত্যিক ভাষ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, থাকে নি গুপ্ত সাধনমার্গের রহস্য উদ্ঘাটনের সূত্রে অধ্যাত্মবাদের ভক্তিবিহ্বল আপ্লবে নিমজ্জিত। তিনি খুঁজে ফিরেছেন সেই মানুষগুলিকে যারা উচ্চারণের নিষ্পেষণে ব্রাত্যজীবন মেনে নিয়ে যুগে যুগে ঢুকে যায় সর্পিল পথে প্রত্যন্ত গ্রামের গুপ্ত সাধনমার্গে অথচ প্রতিবাদের শস্ত্রটি রাখে উদ্যত তাদের গানে গানে। তিনি খুঁজে ফিরেছেন যারা এসব গান শিখেছে সেই আত্মগোপনকারী গৌণ-ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে যারা নিজেদের বাঁচাতে আত্মনির্ভর অথচ উচ্চতর সমাজ কাঠামোতে প্রতিবাদী জীবনের শরিক।

সুধীরবাবু একটি বিশেষ লোকধর্মসম্প্রদায়ের জন্ম ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্রনির্ভর বড়ো বড়ো ধর্মসম্প্রদায়সমূহের বাইরে যে গুরুবাদী ছোটো ধর্মসম্প্রদায়গুলি বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় আজ থেকে শ দুই তিন বছর আগে গড়ে উঠেছিল তাদের মূল প্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান চৈতন্যদেবের উদার বৈষ্ণব মতকে এবং সেইসঙ্গে সুফি আর বাউল মতকে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। চৈতন্যদেবের যথার্থ সামাজিক ভূমিকা আজও আমাদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। চৈতন্য-পরবর্তী বৃন্দাবনকেন্দ্রিক মননপ্রধান বৈষ্ণবধারা জ্ঞান এবং তত্ত্বের শীর্ণ আভিজাত্যকে সম্বল করে এখনো শাস্ত্রবাদী নৈষ্ঠিকতায় বিদ্বজ্জনের দার্শনিক ব্যাখ্যায় জনজীবন থেকে অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু জাতিবর্ণেব বিরোধ ঘুচিয়ে, শাস্ত্রের বিধান ভেঙে, শুধু হৃদয়ের নির্দেশে ভক্তিমান মানুষদের একত্র করতে চেয়েছিলেন যে পরিত্রাতা চৈতন্যদেব, তিনি দীর্ঘকাল উচ্চবর্ণ-কর্তৃক অত্যাচারিত অসহায় অথচ মুমুক্ষু মানুষদের বাঁচবার এক

পরম আশ্রয়স্থল ছিলেন। শাস্ত্রবাদী নৈষ্ঠিকতার বাইরে যে সাধারণ মানুষ তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন অসম্পূর্ণ ব্রজলীলার সম্পূরণে যেমন চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা, তেমনই চৈতন্য-পরবর্তী যুগেও প্রয়োজন রয়ে গেল অসম্পূর্ণ সমাজ আন্দোলন সম্পূর্ণ করবার জন্য নিত্য নব অবতারবাদের। প্রধানত এই ভাবেই গ্রাম-জীবনের গভীরে নানা প্রতিবাদী সাধক-সাধিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গৌণ ধর্মসম্প্রদায়। জনজীবনে যে ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষ এবং মোল্লাতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রবহমান ছিল তারই সূত্র ধরে সুফি আর বাউল মত এইসব গৌণ ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলে মিশে গিয়েছে।

সুধীরবাবু এই নির্ণীত সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় কয়েকটি গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। কর্তাভজা, লালনশাহী, বলরামশাহী এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করে তিনি সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং তার প্রধান গীতিকার কুবের সরকার অথবা কুবির গোঁসাইয়ের কথা আমাদের শুনিয়েছেন।

'সাহেবধনী' সম্প্রদায় কেন নাম হলো সে প্রসঙ্গে সুধীরবাবু কোনো আলোচনা করেন নি। সম্প্রদায়ের নামকরণের ব্যাপারের আমাদের ভরসা থেকে যায় অক্ষয়কুমার দত্তর গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃতাংশটুকু, যেখানে অক্ষয়কুমার বলেছেন 'এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে একজন উদাসীন বাস করিত।...বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া নিবাসী দুঃখীরাম পাল (সুধীরবাবুর অনুসন্ধান অনুযায়ী মুলীরাম বা মুলীচাঁদ) এবং হিন্দুমতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও একজন মোসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।'

আর দুঃখীরাম বা মুলীচাঁদের পুত্র চরণ পালের প্রত্যক্ষ শিষ্য কুবির গোঁসাই ছিলেন সাহেবধনীদের প্রধান গীতিকার—জাত যুগী, বৃত্তি তাঁত বোনা। যিনি পরম গর্বে বলেছিলেন 'আমার নাম কুবির কবিদার'। এই কুবির কবিদারের শিষ্য ছিলেন যাদুবিন্দু গোঁসাই। এই দুজনের নির্বাচিত নব্বইটি গান গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে সংকলিত হয়েছে চারটি বিশেষ পরিকল্পিত পর্যায়ে। এই গানের চাবি দিয়েই বুঝতে হবে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে। কারণ মানুষের প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে এমন এক একটা সম্প্রদায়, মানুষ ধরে তরে যাবার সাধনাই ছিল তাদের অন্বিষ্ট। এবং মানুষের কণ্ঠে গান হয়েই থেকে যায় সেই অন্তর আকৃতি— এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই সাহায্য করে শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর গ্রন্থখানি।

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর 'বৈষ্ণব ব্রতদিননির্ণয়' গ্রন্থে যে গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের এক দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়, যাদের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা 'পাষণ্ড' নামে ধিক্কৃত করেছিলেন, তা থেকে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় শ্রীসুধীর চক্রবর্তী যে ধারায় এই কাজের প্রস্তাবনা করলেন তার সম্পূর্ণতা কত পরিশ্রমসাপেক্ষ।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সাধনায় আর প্রতিবাদী চেতনাশ্রয়ী গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের গানে যে মৌলিক পার্থক্য ছিল তা প্রমাণিত হয় রামকৃষ্ণ-গীত কুবির গোঁসাইয়েব গানের শব্দ পরিবর্তনে। রামকৃষ্ণ যেখানে মনে করতেন, 'তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম

রত্নধন', কুবির সেখানে নির্দ্বিধায় বলে ছিলেন, 'তলাতল পাতাল খুঁজে পারি নাক রত্নধন'। কারণ রত্নধন পাতালে নয়, এই মানবতাবাদী জনধর্মের দৃষ্টিতে যথার্থ রত্ন হলো মানুষরত্ন—

এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ।
এই মানুষ ধরে যাবি তরে।

এ গান লালন ফকিরের একটি গানেরই প্রতিধ্বনি,

মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শূন্যকার।
লালন বলে মানুষ আকার ভজলে তরবি।

এবং এই কারণেই শ্রীসুধীর চক্রবর্তীর পরিশ্রম কোনো সাম্প্রদায়িক গূঢ় রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে না, মানুষের সংগ্রাম মানুষের অত্যাচারের এক আশ্চর্য ইতিহাস, যা একেবারে মাটির সমান্তরাল থেকে খুঁজে বার করে না নিয়ে এলে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা যায় না, তাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। গ্রন্থে হয়তো এখানে সেখানে পূর্বসূরীদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদলাঞ্ছিত তর্কের সুর ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার জন্য গ্রন্থখানি তার গৌরব হারায় নি, বা গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের স্তিমিত হবার কারণ ঘটায় নি।

আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ সম্প্রসারিত সেই বৃত্তিহুদার সাহেবধনী ঘরের সেবাইত শ্রীশরৎচন্দ্র পালের প্রতি, যিনি তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা করার ব্যাপারে এবং কুবির গোঁসাইয়ের গীতাদি প্রকাশের অধিকার এবং অনুমতি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগের প্রতি, যাঁরা এমন একটি গ্রন্থ মুদ্রণের অর্থসহায়তা করেছেন।

এই গবেষণাসংকুল বৈদগ্ধ্যের দিনে শ্রীসুধীর চক্রবর্তী যে বিষয় নির্বাচন করেছেন সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দচারণের অধিকারী—গান এবং গ্রাম উভয়েই তিনি সহজচারী। তিনি তাই বিষয়টিকে বৌদ্ধিক স্তরে নয়, মানবিক স্তরে সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন। কুবির গোঁসাইয়ের ভাষায়—

মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখি রে মন।
মানুষে বিশ্বাস কর রে পাবি রে মানুষের দরশন।
মানুষ নিত্য মানুষ সত্য ত্রিবেদ মানুষের গঠন যেমন
পঞ্চবর্ণ গাভীরে মন দুগ্ধ হয় তার এক বরণ।
মানুষ হয়ে মানুষ মানো মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো মানুষ রতন ধন।

বারোমাস.

ক. ১.২ আলোচক : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এই আশ্চর্য লোকধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম লিখিত কিছু তথ্য মেলে ১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইয়ে। পরবর্তীকালে কেউ কেউ বিক্ষিপ্তভাবে এদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রথম সবিস্তারে লিখলেন শ্রীসুধীর চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁর এই লেখালিখি পরের মুখে ঝালখাওয়া নয়। সরজমিনে হাঁটাহাঁটি করেছেন। জীবনের বহু দামি সময় খরচ করেছেন এই কাজের জন্য। এমন কী, পরিপ্রেক্ষিত অন্বেষণে সীমান্ত ডিঙিয়ে যেতেও ছাড়েননি। সাবেবধনীদের ডেরা নদীয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বৃত্তিহুদায়। অগ্রদ্বীপেও এঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। এঁদের মন্ত্র হল : 'ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনা দীনদয়াল নাম সত্য।' দীনদয়াল নামে এঁরা উপাস্য ঈশ্বরকে ডাকেন। এঁদের তত্ত্ব হল : 'আল্লা-মহম্মদ রাধা-কৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার' এবং ''আলালা আলজিহ্বায় থাকেন আপন সুখে/কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।' টাকরা হল মুখবিবরের উধর্বাংশ, জিভ যা ছুঁয়ে থাকে। মূলগুরু হলেন 'ফকির'। হাতে ফকিরি দণ্ড। মাথায় গুণ্ঠন টেনে আসনে বসে থাকেন। শ্রীচক্রবর্তী সঠিকভাবে সুফি ফকিরদেরও এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তাছাড়া এঁদের তত্ত্বে 'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী'। তার মানে হ্লাদিনী। বৈষ্ণব শাস্ত্রের রাধা। 'দীনদয়াল' শব্দের 'দীন' ইসলামি 'দ্বিন' অর্থাৎ পরমার্থ বলেই মনে হয়। আঠারো শতকে নদীযা অঞ্চলে অসংখ্য গৌণ লোকধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখা যায়। তাদের অনেকের প্রবর্তক মুসলিমও। বিশেষ করে এগুলির সমর্থক ও প্রবর্তকরা ছিলেন নিম্নবর্গীয় তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষ এবং হিন্দুধর্ম-ইসলাম ধর্মের অজস্র টুকরো টুকরো উপাদান মিলিয়ে-মিশিয়ে একটা সমন্বয়ের প্রবণতা চোখে পড়ে। ওই মাটিতে সেটাই অনিবার্য ছিল। গত সাত আটশো বছরে নদীয়ায় তিনটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা ধাক্কা দিয়েছে। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি নদীয়ায় ঢুকে বাংলার শাসনযন্ত্র দখল করেন। ১৪৮৫ অথবা ৮৬-তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। ১৭৫৭-তে নদীয়ায় পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশশক্তির সূচনা হয়। শ্রীচক্রবর্তী পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং ওইসব লোকধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভবের সম্পর্কের দিকে আঙুল তুলেছেন। খুব খাঁটি কথা। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতটি তো কয়েকশো বছর ধরে তৈরি ছিল। অর্থাৎ সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিত রীতিমতো ঐতিহ্যবান ছিল। ঐতিহ্যের উর্বর মাটি, নদীয়ার মাটিই জন্ম দিয়েছিল আশ্চর্য সুন্দর সব বৃক্ষলতার। সাহেবধনীরা সেই এক উদ্ভিদ।

শ্রীচক্রবর্তী সাহেবধনীদের উদ্ভবসংক্রান্ত তথ্য টুঁড়ে বের করেছেন। এঁদের প্রথম গুরু মুলিরাম বা মুলিচাঁদ। তাঁর পুত্র চরণই এই বিচিত্র লোকধর্মতত্ত্বের সাংগঠনিক চরিত্র দেন এবং কিছুটা প্রতিষ্ঠানিক আদলে যথার্থ ফোক রিলিজিয়নে পরিণত হয়। চরণশিষ্য কুবের বা কুবির এবং কুবিরশিষ্য যাদুবিন্দু ছিলেন সাহেবধনী ধর্মতত্ত্বের দুই বড় প্রবক্তা। কারণ তাঁদের গান বাঁধানোর এবং গাইবার প্রতিভা ছিল। শ্রীচক্রবর্তী কুবিরের ১২০৯ খানি গানের হাতে লেখা পুঁথি দেখেছেন। সাহেবধনীদের নামে চালু প্রায় আড়াই হাজার গানের খোঁজ পেয়েছেন। আলোচ্য বইয়ে তিনি কুবির ও যাদুবিন্দুর ৯০ খানি গান যুক্ত করেছেন।

কুবির প্রথম জীবনে কবিয়াল ও লোকগায়ক ছিলেন। তাই তাঁর গানে বাকচাতুর্য এবং বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-বেদনার অভিঘাতও বিচ্ছুরিত। সত্যিই তিনি লালনশাহের চেয়ে বড় দ্রষ্টা ছিলেন। রবীন্দ্রসংসর্গ লালনকে প্রখ্যাত করেছে এবং তাঁর গানে বহুক্ষেত্রে নাগরিক পরিশীলন-পরিমার্জনা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু কুবির অক্ষত আছেন। শ্রীচক্রবর্তী একেবারে নিখাদ কুবিরকে তুলে ধরেছেন। কোনোরকম কারচুপি ঘটেনি বলেই কুবিরের গানের গন্ধটি সোঁদা মাটির। এজন্যও শ্রীচক্রবর্তীকে ধন্যবাদ। কিন্তু 'সাহেবধনী' শব্দটি কি? শব্দটি নিয়ে কোথাও-কোথাও কিঞ্চিৎ জল্পনা চোখে পড়ে। এঁদের মু .লিম-সংসর্গ সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী এবং অন্যান্যরাও নিঃসংশয়। আমি নিঃসংশয় যে শব্দটি আসলে 'সাবেহজানী'। সাহেবজানী নামে কোনো মারফত তত্ত্ববাদী ফকিরই এ সম্প্রদায়ের মূলে। সাহেবজান নামটি মুসলিমদের কমন ও সুপ্রচলিত। নিম্নবর্গীয় বলেও নয়, গ্রামসমাজে বিকৃত উচ্চারণের জন্য সাহেবজানী হয়ে গেছে সাহেবধনী। সাহেবধনীদের গানে 'সাহেবধনী'র বাড়ি জঙ্গিপুর বলা আছে। শ্রীচক্রবর্তী জঙ্গিপুরে ঢুঁড়েও হদিস করতে পারেননি। পারার কথা নয়। ফকিররা সর্বচর। জঙ্গিপুরের ফকির নদীয়ার গ্রামে এসে মুলিচাঁদকে কৃপা করে গুপ্তবিদ্যা দান করতেই পারেন। তাছাড়া ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক বছর কেটে গেছে। গেঁয়ো যোগী ভিক্ষে পান না, এও একটা কথা। কেউ মনে রাখেনি। মারফত তত্ত্বপ্রবক্তা ফকিরদের সুপ্রচলিত টার্মগুলি সাহেবধনীদের টার্মে অবিকৃত দেখা যাচ্ছে। যেমন আল্লার আলজিহ্বায় থাকার কথা। এখানে অনুপ্রাসঘটিত একটা আলংকারিক ব্যাপারও আছে। কিন্তু সেটা আকস্মিকও কিছুটা। মারফত ফকির মুখে জোরে উচ্চারণ করেন 'লাইলাহা' এবং গলার ভেতর আলজিহ্বার কাছে উচ্চারণ করেন 'ইল্লাল্লাহ্'। এটি ওঁদের 'জিকির' (আরবি জ্বেক্র্) বা তপজপ। কুবিরের একটি গান খণ্ডিত আকারে আমি মুর্শিদাবাদের গ্রামে শুনেছি এবং নিজের লেখায় বহুবার ব্যবহারও করেছি। সেটি হল: 'রামকি রহিম করিম কালুল্লা কালা'। এতকাল পর শ্রীচক্রবর্তীর বইয়ে পুরোটাই দেখে অবাক ও খুশি হলাম। জানতাম না এটি কুবিরের বাঁধানো। কুবিরের আরও কিছু ইসলামি তথা মারফত টার্মসমন্বিত গান দেখলাম আলোচ্য বইতে। যেমন, 'আছে বারি পয়দা করি শরিক নাইকো তার'। মহম্মদের জ্যোতিতে বিশ্বসৃষ্টি হওয়ার কথাও আছে। কুবেরের মারফতি ফকিরসংসর্গ নিবিড়ই ছিল বোঝা যায়। একটি গানে স্পষ্ট করে সেকথা বলেছেনও।

আবার অন্যদিক থেকেও ভাবা যায়। গ্রামের লোক গায়করা গান লেখেন না বাঁধেন। তিনি লেখাপড়া জানা লোক হলে সেই বাঁধানো গান পরে খাতায় লিখেও রাখেন। অন্যকে দিয়েও লিখিয়ে নেন। এই লেখালেখির বেলায় অন্যের বাঁধানো গানও আত্মসাৎ করা হয়। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কুবিরের গানগুলির কাঠামো, বাগরীতি, শব্দযোজনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। এতে চুরি বোঝাবে না, স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদার হাতে উপাদান সংগ্রহই বোঝাবে। তা সত্ত্বেও শ্রীচক্রবর্তীর বিস্তারিত বিশ্লেষণে সাহেবধনীদের স্বাতন্ত্র্য সুসাব্যস্ত হয়েছে।

কর্তাভজাসম্প্রদায়ের সম্পর্কে সব তথ্য বিশ্লেষণ করেও তিনি দেখাতে পেরেছেন, আপাতদৃষ্টে যা মনে হোক, এঁদের একই বৃক্ষের দুটি শাখা বলা উচিত হবে না। তবে তাত্ত্বিক

সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। কর্তাভজাদের আদিগুরু 'আউলেচাঁদ' নামটিও সম্ভবত কোনো মুসলিম ফকিরেরই। আউল আরবি শব্দ। মানে আদি বা প্রথম। আবার 'অউলিয়া' থেকেও আউলে হতে পারে। 'আউলিয়া'ও আরবি শব্দ। মানে দিব্যপুরুষ। মুসলমানদের চাঁদ নাম সুপ্রচলিত। সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিবোধে বড় জোর সিদ্ধান্ত করা চলে, গুপ্তবিদ্যার অধিকারী মুসলমান ফকিরদের সূত্রে নিম্নবর্গীয় হিন্দু ভক্তরা এই দুটি সম্প্রদায় গড়েছিলেন। কবচ, তুকতাক, ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকায় নিয়মিত অর্থসংস্থান মোটামুটি প্রতিষ্ঠানিক চারিত্র দিয়েছিল উভয়কে। কিন্তু কর্তাভজাদের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির কারণ অন্যতম গুরু দুলালচাঁদের শিক্ষাদীক্ষা, কলকাতার কাছাকাছি ডেরা থাকা, উচ্চবর্ণীয়দের মধ্যে শিষ্যলাভ ইত্যাদি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকার দরুন তো বটেই, সাহেবধনীদের ধর্মীয় আচার ও তাত্ত্বিক বার্তায় ইসলামি টার্মের বহুল সংসর্গও হয়তো তেমন ব্যাপকভাবে হিন্দু সমাজকে কাছে টানতে পারেনি।

শ্রীচক্রবর্তী খোলা মন নিয়ে নানা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহেবধনীদের দেখেছেন। আধুনিক সামাজিক নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বা লোকসংস্কৃতি গবেষণায় প্রযুক্ত মেথডলজির যান্ত্রিকতা ও বিদেশি গড়ন সম্পর্কে তিনি সচেতন। কিন্তু সঠিক মেথডলজির প্রয়োজনীয়তা আছে। ইদানীংকার 'সাব অল্টার্ন স্টাডিজে'ব দৃষ্টিকোণ থেকেও পরীক্ষা করা দরকার। কারণ সাহেবধনীদের ধর্মাচার এবং তাঁদেব গানের ভেতর প্রচুর সামাজিক-অর্থনৈতিক উপাদান ছড়ানো। তার চেয়ে বড় কথা, শ্রীচক্রবর্তীর উক্তি 'সবটাই দ্রোহ থেকে জন্ম নেয়নি', কিন্তু প্রচণ্ড একটা প্রতিবাদী সুরও কানে আসে, যা তিনিও শুনেছেন। এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটি বেশ জোরালো এবং তা শুধু তাত্ত্বিক বা মরমী বোধসঞ্জাত নয়, বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতজনিত আবর্তও সৃষ্টি করেছে। প্রাত্যহিকতার গ্লানি ও হতাশার সূক্ষ্ম টানাপোড়েনকেও বর্ণাঢ্য মাযার স্তরে প্রতিবিম্বিত করেছে।

এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী চিন্তাভাবনা যে নিম্নবর্গীয় সমাজে কত রূপ পরিগ্রহণ করে, তার লেখাজোখা নেই। শ্রীসুধীর চক্রবর্তী এদিক থেকেও একটা বড় কাজ করেছেন। নিষ্ঠাবান গবেষক এবং সরেজমিন অনুসন্ধানী হিসেবে তাঁর এই কাজ বাংলার এক পুরনো ধূসর পর্দা উন্মোচন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বাংলার এই লোক ঐতিহ্যটি খুঁটিয়ে জানেন। এতদিন পরে আশ্বস্ত হওয়া গেল যে এমন একজন গবেষক আছেন, যিনি ভেকধারী গ্রাম্য গায়ক দেখলেই তাঁকে 'বাউল' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন না। তিনি জানেন, 'আমাদের দেশে বাউলসুর বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে তার সংজ্ঞা খুব ধূসর।' অর্থাৎ সেই ভেদাভেদজ্ঞান তাঁর আয়ত্তে, যাতে রোহিণীকে বিড়াল বলে ভুল হয় না।

বইয়ের সঙ্গে সাহেবধনীদের আচাব-অনুষ্ঠানসংক্রান্ত ছবি, তাঁদের গুপ্তবিদ্যার কিছু নমুনা এবং এলাকার মানচিত্র থাকায় সমগ্র পটভূমি এবং জীবন অভিব্যঞ্জিত হতে পেরেছে। বইটি শিক্ষা-সংস্কৃতি অভিমানীদের পড়া উচিত। এই অসাধারণ কাজটির জন্য শ্রীচক্রবর্তীর প্রচুর প্রশংসা ও অভিনন্দন প্রাপ্য।

দেশ
১৫ মার্চ ১৯৮৬

বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক কেতাবী ইতিহাসের পাতায় আঠারো শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির চালচিত্র মানেই হাফ আখড়াই, তরজা-কবি খেমটা আর ছড়া-নকশার ভাঁড়ামি বলে জেনেছি। পুরোনো মোগলাই আমল মুখ থুবড়ে পড়েছে, নতুন বিদেশী কোম্পানির আমলের ভ্রূণাবস্থা। সম্প্রতি বেশ কয়েক জন নব প্রজন্মের গবেষক বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে বাংলার অর্থনীতি রাজনীতি, ধর্মও সংস্কৃতির সংঘাত-সমন্বয়ের খনি থেকে লোকসাহিত্যের ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন। আমাদের আলোচিত গ্রন্থের লেখক-গবেষক ডঃ সুধীর চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। এই গ্রন্থের আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখক সঠিকভাবেই প্রচলিত পুঁথিপড়া ভায্য বা মেথডোলজির যান্ত্রিকতাকে কটাক্ষ করেছেন। তবে এই সঙ্গে যদি এটাও স্পষ্টভাবে বলতেন যে, লোকসঙ্গীত গবেষণা ও পর্যালোচনার ভাববন্দী দৃষ্টিকোণ অচল, তবে মন্তব্যটি আরও পূর্ণাঙ্গ হত। এই গ্রন্থের সবচেয়ে যেটা মূল্যবান ও চমকপ্রদ দিক সেটা হল, পাঁচ বছরে তিন হাজার কর্তাভজা-সহেবধনীদেব লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেও সেইসব গানের অন্দরে পুবোপুরি ঢুকতে না পারায় লেখকের অস্বস্তি। তাঁর কথায়, "মনে হল আমাদের ইংরাজী বিদ্যালয়কেন্দ্রিক লেখাপড়া আব উচ্চশ্রেণীর মানুষের লেখা অভিজাত শিষ্ট সাহিত্যপাঠের বাইরে একটা উদার আত্মনির্ভর অথচ প্রতিবাদী জীবনের ছক লুকিয়ে আছে।" মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এ যাবৎ সংকলনের অধিকাংশ গানই ধর্মসঙ্গীত। দ্বিতীয়ত, বাউল গানই ধর্মসঙ্গীত। দ্বিতীয়ত, বাউল গানকে কেবলই মিষ্টিক ধর্মসঙ্গীত বলে এ যাবৎ যে ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে ৩া সর্বাংশে সত্য নয়। আলোচ্য 'সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান' গ্রন্থে সংকলিত গান ও ডঃ চক্রবর্তীর মূল্যায়ন পাঠে এই গভীরতর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা ও দিক নির্দেশ ফুটে উঠেছে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন, শশিভূষণ প্রমুখ মনীষা সতেরো আঠারো সতকের গৌণ ধর্মসম্প্রদায়গুলির গানে সন্ত-সুফিদের ধর্ম-সমন্বয়ী উপাদান সঠিকভাবে খুঁজে পেলেও এই গ্রন্থেই প্রথম ঐ সব গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ী কবি সাধকদেরও সামাজিক পরিচয়, তাঁদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-কাঠামোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পীড়ন, তাঁদের দুঃখবরণ ও প্রতিবাদী ভূমিকা ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে স-তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

দশম শতাব্দীতে মুসলমান পরীদরবেশ ও সুফি সাধকরা ভারতে প্রবেশ করে এখানকার তান্ত্রিক যোগধর্ম ও বৌদ্ধ থেরবাদের প্রভাবে পড়ে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলা তুর্কী অধিকারে আসার সঙ্গে সুফী সাধকরাও তাদের মারিফতী বা মরমীয়া ভাবাধারার চাষবাস এখানকার উদার সজল-শ্যামল মাটি আর কল্লোলিনী নদীর ভাষায় মিলে যায়, মিশে যায়। যোড়শ শতকের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ও চৈতন্য চরিতামৃত আখ্যানেও সুফীদের সহাবস্থানের উল্লেখ আছে। চৈতন্যদেবের পর একশো বছর যেতে না যেতেই বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয় ধারা শুকিয়ে যায় শাস্ত্র-মননের উচ্চমার্গে ও বৌদ্ধতন্ত্রের বিকৃত আচার-সর্বস্বতায়। এই সময়েই নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান জেলার

মরমীয়া উদারনৈতিক সুফী সাধকদের চলাচল বেড়ে যায়। ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সামন্ততন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রহরারূপে মোল্লাতন্ত্রের পাশে এই উদার মানবধর্মী সুফীদের প্রতি একই সঙ্গে নিচুতলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দলে দলে আকৃষ্ট হয়। এরা একই নিঃশ্বাসে রাধাকৃষ্ণ আল্লার সুল উচ্চারণ করেছে। এমনকি সমকালের আধিপত্যকাম খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধেও লৌকিক সংস্কৃতির প্রতিরোধ গড়ার জন্য তাঁদের গানে 'ঈষু'কেও মিলিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে গ্রামের হাজার হাজার কৃষিজীবী, তাতি, কামার, জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ভক্তশিষ্য হয়েছে। ঘোষপাড়ার কর্তাভজারা ছিল তুলনায় রক্ষণশীল ও উচ্চবর্ণপ্রসূত।

এই গ্রন্থে সাহেবধনীদের আড়াই হাজার গানের মধ্যে ৯০টি এই ২২৬ পৃষ্ঠাকে গ্রন্থে বাখা হয়েছে। এই সঙ্গে কর্তাভজাদের আউলেচাঁদ ও সাহেবধনীদের চরণ পালের, যাদুবিন্দু কুবিরচাঁদ, বাউলদের দুদ্দু শাহ এবং লালন ফকিরের জীবন এবং সৃষ্টিকর্মের তুলনামূলক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ ও যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের আঙ্গিকে সাহেবধনীদের গানে কিভাবে সমকালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পীড়ন-নির্যাতন চলছে, নিচুতলার গ্রামীণ শ্রমজীবী হিন্দু-মুসলমান জনসমাজের মানুষকে কী দুঃসহ বাস্তবতার জীবন-সংগ্রাম করতে হচ্ছে তার উচ্চমান গীতিক প্রতিফলনগুলি লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্দেশ করে আঠারো শতকের বাংলার ইতিহাসের নতুন মূল্যবান উপাদানও আগামী গবেষক-প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে সংকলিত গানগুলির জন্য লেখক একাধিক মূল পুঁথির সন্ধান পেয়ে ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে দিল্লীর আই সি এস এস আর-কে দিয়েছেন (১৯৭৮)-'মাইনর রিলিজিয়াস সেকটস অফ নদীয়া' নামে ইংরেজি গবেষণাপত্র এবং ১৯৮৪ সালে 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এইসব কাজই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত গ্রন্থের চেহারা নিয়েছে। গ্রন্থটিতে সাহেবধনীদের উদ্ভব কেন্দ্র, আঠারো শতকের আর্ট প্লেট ছবি ও মূল পাণ্ডুলিপির ফটো-ব্লক স্থানে পেয়েছে। প্রচ্ছদ অলংকরণ সুরুচিপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস রাখি, গ্রন্থটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সবার কাছেই সমাদৃত হবে।

ক. ২ বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান

ক. ২.১ আলোচক : অশোক সেন

সচরাচর লোকধর্ম নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসায় এমন সব ঝোঁক এসে পড়ে যা ঠিক মতো চেনাজানার অনুকূল নয়। কখনো আমরা অচেনাকে আবিষ্কারের রোমাঞ্চে পুলকিত, কখনো বা বিজ্ঞানের জগতে গ্রাম্য আচার-অনুষ্ঠানের অর্থহীনতা প্রমাণ করতেই আগ্রহী। বর্ণ-ব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্মগোষ্ঠীর উৎপত্তি, বিকাশ আর পতনের অভিজ্ঞতায় নির্যাতিত মানুষের জীবনভর সহিষ্ণুতা আর প্রতিবাদের নানা রকম পরিচয় ছিল। সেখানে আপস সত্য, প্রতিবাদও সত্য। কেবল সহাবস্থান নয়, অনবরত পরস্পর বিরোধের মোচড়ে মোচড়ে তাদের নানারূপে জড়ানো মতিগতির অন্ত নেই। সনাতনপন্থী সমন্বয়বাদের বিচারে আপসকেই ভাবা হয় চিরন্তন সামাজিক সংহতি। কিন্তু লোকমানসের অন্তর্লীন রহস্যে প্রতিবাদের ব্যঞ্জনা উপেক্ষাব নয়। আর কী কারণে, কেমন ভাবে সে বশ্যতা স্বীকার করেছে, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় সমাজ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বোঝাপড়ায় বিশেষ জরুরি। কোশাম্বির অসামান্য বিশ্লেষণ তার গুরুত্ব নির্দেশ করেছে।

সম্প্রতি সুধীর চক্রবর্তীর লেখাব লোকধর্ম প্রসঙ্গে তন্ময় অনুসন্ধান এবং আলোচনার পরিচয় পেয়েছি। সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর বই ১৯৮৫তে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৪র শারদ সংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকায় 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' শিরোনামে তাঁব লেখাটিতে আমরা এক বিশিষ্ট জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধানের সূচনা দেখেছিলাম। 'বারোমাস'-এ তাঁর এই চেনাজানার জগৎ নিয়ে কয়েকটি লেখা বেরিয়েছে। আলোচ্য বইটি এই ধারাবাহিক নিরলস গবেষণার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুধীর চক্রবর্তীর কাজের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তিনি শুধু ধরাবাঁধা কেতাব এবং তত্ত্বকথার ওপর নির্ভর করেন নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্রামে গ্রামে, মেলায় মেলায় ঘুরে সংগ্রহ করেছেন মুখে মুখে গড়ে-ওঠা ইতিহাস (oral history)। লোকধর্মের যে সম্প্রদায সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান, তাদের জীবিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তায বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই-সব সম্প্রদায়ভুক্ত আপামর জনসাধারণের মেলায়, বার্ষিক উৎসবে ঘুরে ঘুরে নানা স্তরের মানুষে মানুষে জড়ানো আচার-অনুষ্ঠান, সম্মিলনের সত্যিমিথ্যে উপলব্ধি করেছেন; বলতে পেরেছেন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অজস্র আলেখ্যতে লোকধর্মের কাহিনী।

সুধীর চক্রবর্তীর লেখা কখনোই দার্শনিক প্রমাণসর্বস্ব নয়। মানবিক সংবেদনের গুণে তা ধন্য। আমরা যাকে বলি গবেষকের তথ্য তার সঙ্গে লেখক মেলাতে পাবেন জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভব। এবকম পথের দিশা উনিশ-বিশ শতকে আমাদের কোনো কোনো মনীষী দেন নি তা নয়। কেন আরো সম্পূর্ণ বিশ্লেষণে তা অনুসৃত হয় নি সে বুঝতে অন্য গবেষণার প্রয়োজন আছে। যুক্তিতে কুণ্ঠাহীন অক্ষয়কুমার দত্তই তো 'ভাবতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায' বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর উইলসন-এর

'এসিয়াটিক রিসার্চ'-এর পরিধি পেরিয়ে অক্ষয়কুমার যে-সব ধর্মগোষ্ঠীর কথা লিপিবদ্ধ করেন, সেই বাইশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল কর্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, বলরামীর মতো লোকধর্মের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দী, ব্রজ-ভাষায় রচিত সব আদি গ্রন্থ এবং তদনুযায়ী উইলসন-কৃত ইংরেজি লেখার সীমানা ছাড়িয়ে অক্ষয়কুমার অবশ্যই খানিকটা বিশিষ্ট অন্বেষণের পরিচয় দেন।

মনে পড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সেই মন্তব্য যে ভ্রমণশীল ভিক্ষাজীবীরা আমাদের দেশে বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন। ভুল হোক, নির্ভুল হোক, কথাটি কেবল কোনো দার্শনিক উপপাদ্য ধরে নিদ্ধান্ত সাজাবার ইঙ্গিত নয়। বহুজনের জীবন ব্যেপে ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জড়িত এই পরিণাম। সামাজিক ইতিহাসের তেমন জিজ্ঞাসা আমাদের জ্ঞানচর্চায় খুব পাত্তা পায় নি।

আরো উল্লেখযোগ্য 'বাংলার ব্রত' বইটিতে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি! আধুনিক নৃতত্ত্বের জটিল কাঠামো-বিন্যাস এবং তার বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ তখন তো দূরের কথা। তবু শিল্পীব ধারণা—'অন্যব্রত' হলেও আর্যদের চেয়ে অনার্যরা সভ্যতায় নীচে ছিল তা বলা যায় না। অনার্য ব্রত, অনুষ্ঠান, জীবনচর্চায় অবনীন্দ্রনাথ তাদের অন্তরে একটি সুঠাম, সুশোভন বিন্যাস ধরতে পারেন। আর ইতিহাসে শাস্ত্রীয় গডাপেটার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য তো বেশ র‍্যাডিকাল, 'হিন্দুধর্মের এই উদারতার পিছনে রয়েছে সম্পূর্ণ অনুদার ভাবটি,—সবাই মিলে নিজের নিজের ধর্মাচরণ কবতে থাকে এটা নয়, সবই আসুক এক হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কবলে; এবং এরই জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়াজালেব মতো দেওয়া হচ্ছে।

এমন সব দৃষ্টান্ত শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মবাদ পেরিয়ে সমাজসংস্কৃতির সংগঠন এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণের লক্ষণ আছে। শরৎচন্দ্র রায়-এব পথিকৃৎ ভূমিকা এবং 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকার আদি পর্বে অনেক প্রচেষ্টার কথা ভুলবার নয়। বর্ণব্যবস্থায় বাঁধা সমাজেও যে বুদ্ধিমত্তাকে নির্মলকুমার বসু তারিফ করেছিলেন তা ঠিক শোষণের অনুমোদন নয়। সর্বব্যাপী এক সমাজবোধেব সক্রিয় ভূমিকাই সেখানে বড় কথা। ধনবাদী আত্মকেন্দ্রিকতার বিকল্প এক সমাজবিবেকের চিন্তা নির্মলবাবুকে আকৃষ্ট করে। সেই জোরে গ্রামসমাজের শিকড় থেকে সমবায় এবং ঐক্যের বিস্তারে তাঁর আস্থা ছিল। গান্ধিজির সমাজচিন্তাও এরকম বিশ্বাসের প্রেরণায় জাতীয় স্বাধীনতার অন্বিষ্ট খুঁজেছিল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের কবলে আমাদের যে আধুনিক যুগ তথা ধনতন্ত্রের বলপূর্বক সূচনা ও বিকাশ তা চিরদিন সব মিলিয়ে নিতান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত। স্বাধীনতার পরে মুখোশের জাঁকজমক অনেক বেশি। কিন্তু তার আড়ালে অগণিত ভদ্রেতব মানুষের জন্য নিরবধি অত্যাচার আর দারিদ্র্যই বরাদ্দ রয়েছে। তাদের নিরুপায় জীবনমনে প্রাক্-ধনতান্ত্রিব সমাজবিবেকের আশ্রয় খোঁজা স্বাভাবিক। কিন্তু সনাতন অনুশাসনের পাকে পাকে এই আশ্রয়ের মরীচিকা নীচের তলার জনগণকে দাসত্বের প্রতিবিধানে বাঁধতে পারে। এই লোকজীবনের, লোকধর্মের, লোকসংস্কৃতির সারল্য আর সৌন্দর্য নিয়ে নিছক রোমান্সের অর্থ নেই। সমাজস্থিতি সম্পর্কে যে সরল আস্থায় তারা জীবনের স্বপ্ন দেখে, তাই

আবার প্রতিবাদের শক্তিকে আপসের মায়ায় আচ্ছন্ন করতে পারে। তখন তো ছলেবলে কেবল সংগঠিত আধিপত্যের বেড়াজাল! তেমন সংগঠনে পিছিয়ে থাকার পাত্র নয় পুঁজির শক্তি ও শোষণ।

সমসাময়িক সমাজরাজনীতির গতি প্রকৃতি এই আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু লোকধর্মের স্বরূপ অন্বেষণেও সে চাপ থাকতে বাধ্য। ইতিহাসের অতীত থেকে বর্তমান পরিণাম সবটাই তো আমরা আজকের চোখেই দেখব। অথচ যাদের নিয়ে আমাদের রোমান্স, কিংবা যাদের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত করা আমাদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায়, তারা অনেক দূরের মানুষ। আমাদের সঙ্গে জীবনচর্চা, শিক্ষাদীক্ষা, যাবতীয় ধ্যান-ধারণাতেই তাদের বিপুল ব্যবধান। আপসে হোক, প্রতিবাদে হোক, কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের কাঠামোয় তার স্বকীয় বিন্যাস অনুগতদের আত্মপরিচয়ের স্তরে স্তরে মূর্ত হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয়ের এমন-সব প্রশ্ন নিয়েই সুধীর চক্রবর্তী বিভিন্ন স্তরে অন্বেষণ এখানে তাঁর কাজের বৈশিষ্ট্য।

'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলাহাড়িদের জীবনবৃত্তান্ত ছিল। এ বইতে লেখক বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত ধর্মমত এবং বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি আর বিকাশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাত্তরটি গানের সংকলন। বলাহাড়িদের মূলকেন্দ্রগুলির কয়েকটি আজও টিঁকে আছে যেমন নদীয়ার নিশ্চিন্তপুর; বর্তমান বাংলাদেশে বলরামের জন্মস্থান মেহেরপুরের কেন্দ্রটির এখন নিতান্ত ভগ্নদশা। পরে গড়ে উঠেছে নূতন কেন্দ্র পুরুলিয়ার দৈকিয়ারিতে, বাঁকুড়াব শালুনিতে। গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে এই-সব কেন্দ্র-বিষয়ক তথ্য আছে। হাল আমলে এমনসব সভাসমিতিব নমুনা আছে যেখানে কেবল ধর্ম নয়, রাজনীতি, দেশনীতি নিয়ে বক্তৃতায় প্রচলিত। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর ছিয়াত্তর বছন আগে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে দুটি চমৎকার কাহিনী আমরা পাই; বলরামপন্থীদের ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষ এবং অন্ত্যজ জাতিদের দুরবস্থা তার বিষয়।

১৭৮০ খৃস্টাব্দের কিছু আগে-পরে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) বলরাম হাড়ির জন্ম। জাতে হাড়ি। গ্রামপ্রান্তে মালোপাড়ায় ছিল তাঁর বাসস্থান। জমিদারবাড়িতে পাহারাদারি তাঁর জীবিকা। গৃহবিগ্রহের অলংকার চুরি গেলে জমিতার মল্লিকদের বাড়িতে তিনি চোর অপবাদে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হন। প্রতিক্রিয়ায় বলরাম উদাসীন হয়ে যান। তারপরে গড়ে ওঠে তাঁর বিশিষ্ট ধর্মমত এবং সম্প্রদায়। অনুগামীদের মধ্যে উচ্চবর্ণের লোক কেউ ছিলেন না। তাঁরা সব হাড়ি, মালো, মুচি, ডোম, বাগ্দি, বেদে, নমঃশুদ্র, যুগী, মাহিষ্য আর মুসলমান। হিন্দু শিষ্যরা বলতেন বলরাম, মুসলমানদের আখ্যায় হাড়ি-আল্লা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কেন একাধিক গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব, বইটিতে তার ঐতিহাসিক কার্যকারণের কিছু আলোচনা লেখক করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, নবাবী আমলের অবক্ষয়, ইংরেজ অধিকারের সূচনা। সব মিলিয়ে সমাজের আগাপাস্তালা যে অবস্থায় পড়ল তাতে বর্ণব্যবস্থার অত্যাচার অনাচার অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছয়। তখন

নিম্নবর্গের অন্ত্যজ মানুষেরা শাস্ত্রশাসন ও জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদের উপায় খোঁজে। আর 'বলরাম এ সব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একক মানুষ নন। তিনি এই বেদনা থেকে উঠে আসা এক ব্যথিত মানুষ। শুদ্ধসত্ত্ব ও বৈরাগী, উদাসীন অথচ প্রতিরোধকামী, একজন অবমানিত শূদ্রনেতা' (পৃঃ ২৫)।

নিপীড়ন বাধানিষেধ সত্ত্বেও সমাজে তাদের এক নির্দিষ্ট জায়গা আছে এই আস্থায় নিম্নবর্গের মানুষ বর্ণব্যবস্থাকে মেনে নেয়, সুধীর চক্রবর্তী সম্ভবত বলতে পারতেন সমাজবোধের সেই ব্যাপ্তি তখন সংকটগ্রস্ত। অনিবার অত্যাচারে প্রতারণায় নিপীড়িতের জীবনমন থেকে ঐ ব্যবস্থার ন্যায়সঙ্গতিতে আস্থা হারিয়ে যায়। আগাগোড়া ধর্মের প্রতিবিধানে গ্রথিত ছিল সেই ন্যায়সঙ্গতির জগৎ। তাই বিকল্প ধর্মের গঠনে প্রতিবাদের প্রকাশ। নিম্নতম স্তরের অন্ত্যজ মানুষেরা সে প্রতিবাদে শাস্ত্রশাসনের জগৎটাকেই বাতিল করতে চায়। উচ্চবর্ণের জাতিগত উৎকর্ষ তো তারা মানেই না, মানে না মোক্ষের আদর্শ, গঙ্গাজলের শুদ্ধি, সংস্কৃত মন্ত্রের দৈব আবেদনে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তো বটেই, এমন-কি চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার রূপও গ্রাহ্য নয়। হাড়িরাম তত্ত্বে শিবঠাকুরের কিছুটা খাতির আছে, কারণ দেবতাদের মধ্যে তিনি নাকি পরকীযাবাদী নন। গৃহীর সংযত যৌনজীবনের উপলব্ধি তাঁর আছে। তাই বলাহাড়িদের বিশ্বাস—'কিঞ্চিৎ জানে মহেশ্বর'। এই সূত্র ধরে লেখক হাড়িরাম তত্ত্বের সঙ্গে শৈব ভাবনাব, অদ্বৈত ভাবনাব ও নাথ যোগীপন্থার সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন।

জমিদারবাড়িতে নির্যাতিত হওয়ার পবে বিবাগী জীবন, আর তার পরে নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা, এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে বলরামের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের নানা কল্পকাহিনীর বিবরণ লেখক দিয়েছেন। হাড়িরাম যে এক অলৌকিক ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ তার বহু দৃষ্টান্তে এ-সব কাহিনীর নির্মাণ। অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক এবং বাস্তব মিলেমিশে এক বিশিষ্ট ইচ্ছাপূরণের আবেদন গড়ে তোলে। যেমন হাড়িরামের ঘরে আগুন লাগায় যে জমিদার, প্রবল অকাল বর্ষণে তার সমৃদ্ধ গোলবাড়ি অতলে তলিয়ে গেল, সেই ধ্বংসের চিহ্ন হয়ে আছে 'গোলবেড়ের দহ'। এক উকিলবাড়িতে চাকরের কাজ করলেও যথাস্থানে যথাসময়ে প্রকাশ পায় যে বলরাম প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষ সিদ্ধযোগী। হাড়িরামের ধর্মগত, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জাতিতত্ত্ব পরস্পর সংলগ্ন। এই প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তী বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উল্লিখিত লোকধর্ম সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রকৃত তাত্ত্বিক এবং দীক্ষিত গায়কদের সঙ্গে কথাবার্তায লেখকের বোঝাপড়া বেশ গভীর। বলাহাড়িদের মধ্যে এক মাহিষ্য ব্যতীত অন্য সব জাতি হিন্দুসমাজের নিম্নতম স্তরের অন্তর্গত। উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় দেবদেবীর বিকল্পে তাঁরা হাড়িরামকে সৃষ্টির উৎস বলে চিহ্নিত করেন। হাড়ের স্রষ্টা হাড়ি এবং হাড়-হাড্ডি-মণি-মগজ-সমন্বিত মানবদেহের ধারণায় যুগপৎ অবয়ব আর শারীরক্রিয়া সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রাকৃত উপলব্ধিতেই এই ধর্মতত্ত্বের সূচনা। মানব শরীর ব্যেপে হাড়িরাম। সেই অমূল্য সংস্থানে জাতিতত্ত্বের, ভাবসত্ত্বের বিন্যাস।

হাড়িরাম সম্প্রদায়ের নিপাট বাংলায় লেখা তথা উদ্‌গীত প্রাত্যহিক রক্ষামন্ত্রে গড়ন,

কালের চাক, পাখা, তার, থাম প্রভৃতি কারিগরি শব্দের ছড়াছড়ি। তা সংস্কৃত মিশ্রণ অথবা বৈষ্ণব বীজমন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। লোকজীবনের যে স্তরে এই ধর্মের সূচনা এবং বিস্তার, মন্ত্রগীতের বিন্যাস তার পরিচয় বহন করছে। লোকধর্মে দেহতত্ত্বের প্রাধান্য নিয়ে অনেক আলোচনা একটি বিশিষ্ট লক্ষণকে সচরাচর গুরুত্ব দেয়না। লোকজীবনের যে অবস্থায় নিঃস্ব দরিদ্রজনের পক্ষে বাইরের কোনো উপকরণের অধিকার নিতান্তই সাধ্যাতীত, সেখানে নিছক দৈহিক সত্তাকে মানুষ বড় করে আঁকড়ে ধরে, তার মধ্যেই জীবনের সব সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে চায়। সেরকম মানুষই তো বার বার লোকধর্মের আশ্রয়ে ইহকাল পরকালের অবলম্বন খুঁজেছে।

আসঙ্গের খুঁটিনাটি নিয়ে আদিখ্যেতা আর যৌনমিলনের বাড়াবাড়িতে অপচয়ের দিকে নিশ্চয় আছে। আবার আমাদের মধ্যবিত্ত মোহ বা ধিক্কারের সীমায় তা নিয়ে অচেনার উত্তেজনাতেও ঠিক সুস্থ মতির পরিচয় নেই। বলরামী তত্ত্বে কিন্তু সংযমেরই বেশি গুরুত্ব। ধর্মের বিধানে দীনদরিদ্র গৃহী জীবনের করুণ পরিস্থিতিও প্রকাশিত। যে-সব জাতি নিয়ে বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের গঠন তাদের অনেকেই চোর- ডাকাতিতে অভিযুক্ত। বলাহাড়িদের বিধান যে সন্ধে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সঙ্গমে জাত সন্তান চোর, গুণ্ডা, ডাকাত বা দস্যু হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রাত বারোটা থেকে ভোর পর্যন্ত সেই সঙ্গমের সময়, যা নাকি জন্ম দেয় সর্বলক্ষণযুক্ত, দেবগুণ-অন্বিত সন্তানের। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে রাত বারোটার পরে নরনারীর নিদ্রাবস্থার সম্ভাবনা বেশি।

কেউই চায় না তার সন্তান হোক চোর ডাকাত। হাড়ি রামীদের পক্ষে সে আশঙ্কা সদাই প্রবল। তাই ধর্মের বিধান সংযমের প্রয়াসকে শক্তি জোগাচ্ছে, বাৎলে দিচ্ছে উন্নত প্রজন্মের সম্ভাবনা। সাধনমার্গের বিন্যাসে এয়োতন, বোধিতন, নিতান, খাসতন-এর ক্রমোন্নতি সংযমের আদর্শেই সংলগ্ন (পৃ১০৮-১১৫)। ধাওয়াপাড়া-নিবাসী হাড়িরাম সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক নেতা বা সরকার চারুপদ মণ্ডল লেখককে বলেছিলেন, 'কে আর চায় বলুন যে তার সন্তান হোক চোর বা ডাকাত। এইভাবে একটা সংযমের চেষ্টা আর কি' (পৃ.৭৮)।

এ যেন বংশবৃদ্ধি রোধ করে আগামী প্রজন্মকে যুগ যুগ ব্যাপী অস্পৃশ্যতা থেকে, নিঃসহায় দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে রেহাই দেওয়ার প্রয়াস। সেই অভিশপ্ত জীবনের চাপেই তো তাদের জীবিকায় আসে 'অপরাধ প্রবণতা'। তাই সংযমের বিধান এক অর্থে তাদের অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আসঙ্গের নিয়ন্ত্রণে তারা নিজেদের শারীরিক সংকল্পে উচ্চবর্ণের তথাকথিত শুদ্ধতা আর উৎকর্ষের জবরদস্তি বাতিল করতে চায়। আবার গায়ের জোরে, লাঠির জোরে তাদের যে প্রতিবাদ, সেই সূত্রেই উনিশ শতকে শূদ্রনেতা 'বলরামের চেলা' শব্দটি প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল (পৃ৭৬-৭৭)। সেই পরিচয়ে তারা 'ডাকাত', 'অপরাধপ্রবণ'।

সংযমের বিধানে যে মানুষ 'ডাকাত' ছেলের জন্ম দিতে চায় না, সেই আবার নিজের প্রাত্যহিকে নিছক বাঁচার তাগিদে গায়ের জোর এমন কি ডাকাতি ছাড়া খুবই সম্ভব নিরুপায়। চোর ডাকাতের জীবিকাও তো তাদের জীবনের নাচার প্রতিবাদে

চিহ্নিত। ধর্মের আশ্বাস দুঃসহ জীবনের মরিয়া প্রতিবাদকেই আরেক রূপান্তরে অনুমোদন দিতে চায়। অন্ত্যজ লোকজীবন এবং তার ধর্মের দ্ব্যর্থবোধক ব্যঞ্জনা এমনই দোটানায় চিহ্নিত। ধার্মিক সংযমে হিন্দুসমাজের ক্রীতদাস এই মানুষেরা দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি চায়। সে প্রয়াস তাদের কাছে তাদের মতো করেই সত্য। গায়ের জোরে প্রতিবাদের দিকটাও কম সত্য নয়। তাদের চৈতন্যে ধর্মীয় সমাজবিবেক, তার ঐশী অনুমোদন, আর বিদ্রোহের ইচ্ছা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বে বিরোধে আকীর্ণ ঐ দোটানাই সে জীবনের অবলম্বন।

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সংহারক। তাঁরা বলেন 'হেউৎ মউতের কর্তা'। তিনি আবার রক্ষাকর্তাও বটে। হাড়িরামের সৃষ্টি-লতিকার কিছু অংশ লেখক সারণিবদ্ধ করেছেন। হাড়িরাম থেকে হৈমবতী, যাঁর সন্তান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। উচ্চবর্ণের দেবতত্ত্বকে ভর করা হয়েছে ঠিক। কিন্তু অগ্রপশ্চাতের ক্রম উলটে তার প্রতি তাচ্ছিল্যও কম নয়। ব্রহ্মার থেকে যে বংশক্রম তাতে ডোম, মেথর, অসুরের স্থান রয়েছে। ডোম একটি সার্বিক (generic) জাতিগত নাম। তাদের নানা উপজাতির স্বীকৃতি এই সৃষ্টি-লতিকায় আছে। আর দেবতাবিরোধী অসুরদের স্থানও তাদের পাশাপাশি। যে কালু আর জীবন থেকে ডোম আর ভাঙ্গিরা তাদের উৎপত্তি নির্দেশ করে, লেখকেব উদ্‌ধৃত সৃষ্টি-লতিকায় তাদের দেখি খুড়ো-ভাইপোর সম্বন্ধে। বিস্‌লি এবং ব্রিগ্‌স-এর পরিবেশিত তথ্য, কোশাম্বির বিশ্লেষণ আর রণজিৎ গুহ-র আলোচনা থেকে তথ্যসূত্র নিয়ে সুধীর চক্রবর্তীর সিদ্ধান্ত যে হাড়িরামের জাতিতত্ত্ব নিছক একজনের নিঃসঙ্গ কল্পনা নয়। বহুযুগের স্মৃতিবাহিত কৌমচেতনা, জাতিগত পুরাণের বহুমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই সৃষ্টিতত্ত্বের কাঠামো।

উল্লিখিত তালিকায় আমরা প্রধানত অন্ত্যজ বর্ণের বিন্যাস পাই। আরো বিস্তৃত তালিকায় বিষ্ণুর বংশবৃত্তান্ত যা আছে তার সারাংশ লেখক জানান। হিন্দু মুসলমান উঁচু তলায় জাতিশ্রেণী বিভাজনের ছড়াছড়ি। পরাশর, নমস আর ঋষভেব মতো নামী দামী মুনিদের বংশানুক্রমে আছে জন্তু-জানোয়ার আর উদ্ভট সব নামাবলী। আর 'ভাটিজে বাড়িজে মুকুজে গাঙ্গাল ঘুষাল বাগজি লহড়ি ভদরীয়' ইত্যাদি বিকৃত জাতিনামে ধিক্কৃত ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ে তাচ্ছিল্যের অন্ত নেই। সুধীব চক্রবর্তী ঠিকই লিখেছেন যে উচ্চবর্ণের বর্ণবিন্যাসকে নয়-ছয় কবে হাড়িরাম সম্প্রদায উলটো এক সমাজভাবনার পরিচয় দেন।

অন্ত্যজ মানুষের শুদ্ধতার কঠিন সাধনা, অসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় জর্জরিত তাদের প্রতিবাদের মর্মে মর্মে নানা অর্থের অনুসন্ধান লেখক করেছেন। চরম কোনো সিদ্ধান্তের চেয়ে সংকেতময় ভাঙাগড়ার নির্দেশ সেখানে জরুরি। লেখকের রচনারীতি এই ভাবনার উপযুক্ত বিশিষ্ট সার্থকতায় সমৃদ্ধ। পরিশিষ্টে সংগৃহীত প্রতিটি গানের স্থান কাল বিষয়ে সম্ভব মতো পরিচয় পেলে ভালো হতো। বিশেষত বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের পরবর্তী প্রসারের সঙ্গে জড়িত গানগুলি চিনতে পারা প্রয়োজন। আশা করব এ-সব গানের পাঠ আরো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে লেখক নিজেই ভবিষ্যতে নতুন চিন্তার খোঁজ

দেবেন। এ কথা তাঁর অন্য বইতে সাহেবধনীদের গানগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

বইটিতে একটি বক্তব্যের গুরুত্ব খুব বেশি। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ওপর লেখক জোর দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ-র মূল্যবান একটি প্রবন্ধের ('The Career of an Anti God in Heaven and on Earth' in Ashok Mitra ed 'The Truth Unites--Essays in Tribute to Samar Sen', বাংলা অনুবাদ 'বারোমাস'-এর এপ্রিল'৮৬ সংখ্যায় বেরয়) কথা এসেছে। প্রতিবাদের স্বরূপে দোটানার পরিচয় কী ভাবে প্রকাশ পায়, সে কথা আগে বলেছি। আমার ধারণা রণজিৎ গুহ-র গবেষণারীতি এই দোটানার জটিল দ্বন্দ্বময় প্রকৃতি বুঝতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। তদানুযায়ী বইটিতে পরিবেশিত কোনো কোনো তথ্যের বিশ্লেষণে সুধীর চক্রবর্তী আরো তৎপর হতে পারতেন।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দীনেন্দ্রকুমার রায়-এর প্রবন্ধ থেকে উদ্‌ধৃত দুটি কাহিনী আমরা পাই। প্রথম কাহিনী উচ্চবর্ণের জাতিগর্ব নিয়ে বলরাম হাড়ির কঠোব বিদ্রূপের দৃষ্টান্ত। মেহেরপুরে কাছে ভৈরব নদীর ধারে সুবল চৌধুরী নামে এক চর্মকারের বাড়িতে বৎসরান্তে কালীপূজো হতো। এই উপলক্ষে প্রতিবেশী এক উচ্চবর্ণেব গৃহস্থের বাড়িতে সুবল চৌধুরী গ্রামের ভদ্রজনের ফলাহারের আয়োজন করেছিলেন। হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। কথাপ্রসঙ্গে বলরাম এক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণেব কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ক্রুদ্ধ হল এবং চামারের নিমন্ত্রণ নিযে কথা তোলায বলরামকে বলেন যে তার উক্তি জাতিনাশা। বলরামের উত্তর—আপনার মা অর্থাৎ মা কালী যে বাড়িতে অনায়াসে পুজো নিয়ে খেতে পারলেন সেখানে আপনি পাত পাড়লে জাত যাবে, এ কেমন কথা? তা হলে মা কালীকে একঘরে করুন।

দ্বিতীয় কাহিনীর বিষয় বলরামের এক চেলা বলাইয়ের ওপর জমিদারের অত্যাচার। জমিদারবাড়ির সামনে মাথা না নুইয়ে সে চলে যায়। জমিদারের আদেশ মতো পাইকেরা বলাইকে ধরে আনে। বলবান হলেও বলাই বিন্দুমাত্র বলপ্রয়োগ করে না। জমিদারকে প্রণামের কথায় সে বলে বলরামচন্দ্রের পায়ে যে মাথা রেখেছে তা আর কারো চরণে নোয়ানো সম্ভব নয়। তখন জমিদারের ভৃত্যরা বলাইকে প্রচণ্ড প্রহার করে। আহত বলাই বলরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা জানায়। বলরামচন্দ্রের অনুমতি পেলে যে দলবল নিয়ে জমিদারবাড়ি লুঠ করতে চায়। বলাই বলে, ইচ্ছা করলে সে জমিদারের মুণ্ডু ছিঁড়ে আনতে পারে। বলরামচন্দ্র মধুর বাক্যে বলাইকে শান্ত করেন। তাঁর কথা, 'আজ যদি তুমি কোন বনে গিয়া বাঘের হাতে পড়িতে, সেই বাঘ যদি তোমাকে কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কবিত, তাহা হইলে কি তুমি আমার কাছে সেই বাঘের নামে নালিশ করিতে আসিতে? তুমিও মনে কর, তোমাকে বাঘে ধরিয়াছিল। তুমিও সকল ক্ষোভ ত্যাগ কর, কখনও কাহারও কোন ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। অন্যের ক্ষতি করা মানুষের ধর্ম নয়। আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম, তুমিও তাহাকে ক্ষমা কর।'

প্রথম কাহিনীতে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত যে ব্যবস্থাকে বাতিল করে, দ্বিতীয় কা।হনাব ক্ষমায় আবার তাকে মেনে নেওয়ার আবেদন। সেখানেই দোটানা। লোকধর্মের সমগ্রতায় এর কোনোটাই উপেক্ষার নয়। লোকজীবন আর মনের সমগ্র মানচিত্রেই তার পবিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব। অসহায় অন্ত্যজ মানুষের এক কঠিন সাধনা বলাহাড়ি সম্প্রদায়েব শ্রুতিতে, প্রবচনে, জাতিতত্ত্বে, সৃষ্টিতত্ত্বে যে প্রতিবাদকে প্রকাশ করছে, সে কথা সুধীর চক্রবর্তী ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু যে দোটানায় ঐ প্রতিবাদের স্তরে স্তরে অনবরত ভাঙাগড়ায় লোকজীবনে প্রতিবাদ এবং বশ্যতার টানাপোড়েন সমানেই চলছে, তার সম্যক বিশ্লেষণ লেখক এখনও করেননি। উপরন্তু বলাই যখন একা, তখন না হয় বাঘ তাকে আঁচড়ে-কামড়ে রেহাই পেল। কিন্তু গোটা জনপদের ওপর যদি বাঘের থাবা এসে পড়ে! তবে তো সবাই মিলে তাদের সাধ্যমতো হাতিয়ার নিয়ে বাঘ নিধনেই ছুটে যাবে। তখন কী গতি হবে বলরামচন্দ্রের বাণীর , তাঁর চেলারাই বা তখন সে মন্ত্রের কোন্ অর্থ খুঁজে পাবে? বইটিতে রচনা এবং সমীক্ষার উৎকর্ষ এই সব বোঝাপড়ার প্রয়োজনকে অনিবার্য কবে তোলে।

বাবোমাস
এপ্রিল ১৯৮৭

ক. ২. ২ আলোচক : **সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

"জলের সুঁই পবনের সুতো'—এমন আশ্চর্য চিত্রকল্প যারা গানে ভাবতে পারে, তারা জীবনের রূপদ্রষ্টাই শুধু নয়, তাদের একটা জীবন সম্বন্ধে গূঢ় গভীর তত্ত্বও থাকে। আর যিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই গানগুলি সংগ্রহ করে আনেন, তিনি নিজেই ঐ তত্ত্বের তাত্ত্বিক না হতে পারেন, কিন্তু নিম্ন বর্গের ইতিহাসচর্চায় তাঁর নিবিড় আগ্রহই যে তাঁর জিজ্ঞাসাকে বিশিষ্ট করে তোলে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক হিসাবে এ বই অবশ্যই বলাহাড়ি সম্প্রদায় নামে স্বল্পজাত ধর্মীয় গোষ্ঠীর অজানা ধর্মতত্ত্বের পরিচায়ক, এক হিসাবে সে পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যজ জীবনের এক স্বতন্ত্র লৌকিক ধর্মচর্চার ইতিবৃত্ত, কিন্তু এ ছাড়াও বইটির আরেকটু পরিচয় আছে। অন্ত্যজ মানুষদের প্রতিবাদী সামাজিক দৃষ্টি কেমন ভাবে তাদের সম্প্রদায়গত ধর্মসাধনার মধ্যে অনুস্যূত হয়েছিল গ্রন্থকার তা গভীর অভিনিবেশে উন্মোচন করেছেন। সুধীর চক্রবর্তীকে আমরা এতকাল একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসু হিসাবে জেনেছি। তাঁর 'সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান' বইতে ও 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধিক জীবনের আর এক মাত্রার প্রমাণ দিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে বোঝা যায় তাঁর জিজ্ঞাসা তাঁকে নিরন্তর চলিষ্ণু

রেখেছে। ব্রতমনস্ক অবিচলতায় গভীর থেকে গভীরে নামতে নামতে তিনিও পেয়ে গেছেন এক 'অধর পাখি'র তল্লাস।

বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের সাধকেরা যে 'অনুরাগ মার্গী' সমাজবহির্ভূত সাধক, বিদগ্ধ পূর্বাচার্যেরা সে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কিন্তু সুধীরবাবুই প্রথম অধীত পূর্বসূত্র অর্জিত সরেজমিন অভিজ্ঞতা এবং আধুনিকতম নিম্নবর্গীয় ইতিহাস ভাষ্যপাঠের আলোকে সমস্ত বিষয়টির নূতন উপস্থাপনা সম্ভব করেছেন। হয়তো যে সামাজিক আর্থনীতিক পটভূমিকায় বলরাম হাড়িকে বিচার করলে লেখকের নতুন ইতিহাস ভাষ্য আরো পূর্ণতা পেত সেই বিচারে কিছুটা ন্যূনতা আছে। তথাপি এই গৌণ ধর্মের সাধকেরা মূল্যবোধের যে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন লেখকের সে সম্বন্ধে বাস্তব ব্যাখ্যাটি অভ্রান্ত। যদি তিনি 'প্রতিবাদী' এই বিশেষণটিকে আরো কিছুটা তথ্যনির্ভর করতেন—যা করা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল—তা হলে আমাদের আশ মিটতো। আরো একটা কথা এখানে বলে রাখি। রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টিনেশা ভরা সন্ধ্যা বেলা/ কোন বলরামের আমি চেলা'—এই গীতাংশটিতে রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ার বারখেদা অঞ্চলের বলরামীদের প্রমত্ত দুর্বার জীবনযাপনের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত রেখে গেছেন—এ অনুমান বড়ো অপুষ্টি জীর্ণ। তবে এ সকল গৌণ আপত্তি বলেই অগ্রাহ্য করা যাবে। আসল কথা হল বলরামীদের জীবনচর্যার শুদ্ধতার দিকটিকে তিনি ঠিক ধরেছেন। উদাসীন এবং প্রতিরোধকামী এক অবমানিত শূদ্র নেতা যে জীবনমান নির্দেশ করে গিয়েছিলেন তার ফলে তাঁর অনুগামীরা সুদ নেয় না, মালা পরে না, মন্ত্র নেয় না, গঙ্গাস্নান করে না, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। তারা সখাসখী তত্ত্ব মানে না। তাদের ধর্মাচরণে নারী সঙ্গী নেই। তাই বিকৃতির অবকাশ নেই। গুরু নেই বলে শোষণ নেই। তাদের এই জীবনাচরণই ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ সম্বন্ধে তাদের সমালোচনা। সুধীব চক্রবর্তী নির্ভুল আলো জ্বেলে এই মৌল মূল্যবোধের উৎস খুঁজেছেন। আর সব থেকে আশ্চর্য তাঁর গানের সংগ্রহ। সে গানে বারবার 'মানুষ' শব্দের প্রাধান্য। তত্ত্বে যাই হোক, সত্যে তা আজকের জিজ্ঞাসুদের কাছে দু শো বছর আগেকার এক সদ্য জায়মান মানববোধের সূত্র ধরিয়ে দেয়।

দেশ

২মে ১৯৮৭

ক. ৩ গভীর নির্জন পথে

ক. ৩. ১ আলোচক : অশোক মিত্র

সুধীর চক্রবর্তী গবেষক, কিন্তু গবেষণা-সর্বস্বতায় সমর্পিত পুরুষ নন। গবেষণার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা-অপ্রাসঙ্গিকতা তাঁকে ভাবায়। কী লিখলেন তা যে কেমন করে লিখলেন তা থেকে বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয় সে-বিষয়েও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর যে কোনো রচনার তাই আলাদা আকর্ষণ। তাঁর লেখা কোথাও ছাপা হয়েছে খবর পেলে বর্তমান সমালোচককে তাই অস্থিরতাপীড়ায় ভুগাতে হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে; সেই লেখা সংগ্রহ করে পড়ার পরই রোগের উপশম ঘটেছে। 'গভীর নির্জন পথে'-তে যাঁদের সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তীর প্রধান ঔৎসুক্য, তাঁদের বিষয়ে বর্তমান সমালোচকের স্বভাবঅনীহা। কিন্তু সেই অনীহাও এই গ্রন্থ থেকে যুগপৎ জ্ঞান-তথা রস-সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা স্তুতিকথা নয়, কবুলতি। বর্তমান আলোচনা সম্ভবত ভগ্নাংশিক হতে বাধ্য, কারণ লেখকের ও সমালোচকের দৃষ্টিকোণে প্রচুর অমিল। আগ্রহের উচ্চাবচতা থেকে এক ধরনের অত্যুচ্ছ্বাস, নয় তো বাড়তি নীরবতাবোধ, সঞ্চারিত হয় কখনো কখনো। কিন্তু জনৈকের আবেগমালা তাঁর প্রতিবেশী নাগরিকের মানসিকতাকে সমান পরিমাণে আলোড়িত করবে এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। 'গভীর নির্জন পথে' অথচ ভাবিত করে, এবং তা করে বলেই আলাদা করে শ্রদ্ধার উপচার দাবি করতে পারে এই প্রবন্ধগুচ্ছ।

রচনাগুলিকে সমাজ-অন্বিৎসা বা আপাতকাহিনী, যা খুশি বলুন, নামে তেমন-কিছু এসে যায় না। সব লেখককেই যে বিন্যাসের প্রথাগত ব্যাকরণ মেনে চলতে হবে তা তো নয়, সমাজের স্বাস্থ্যের জন্যই মাঝে মাঝে মহাভারততের একটু অশুদ্ধ হওয়া ভালো। বিশেষ করে সুধীর চক্রবর্তী যেহেতু, যাঁদের বর্ণিত করেছেন তাঁরা এক হিশেবে নিজেরাই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী। অবশ্য প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণে যে জঙ্গি ভাব থাকে, আলোচ্য গোষ্ঠী-বা সম্প্রদায়-ভুক্তরা সব ক্ষেত্রে ততটা চরম আচরিক নন, তাঁরা প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম তথা সূত্রের বেড়াজাল প্রধানত এড়িয়ে চলতে চান মাত্র। একটি বিশেষ বাঙালি ঐতিহ্য সুধীর চক্রবর্তীকে মোহাবিষ্ট করেছে। এমন হতে পারে ঐতিহ্যটি বিশেষরূপে বাঙালিও নয়, হয়তো যে-কোনো সংস্কৃতির ছায়াতেই এ ধরনের ঐতিহ্য বিকশিত হয়ে ওঠার রেওয়াজ। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে চারিতার্থতার অন্বেষণ করেন, ধর্মানুরক্ত মানুষ প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস অতিক্রম করে অন্যত্র ঢুঁড়ে বেড়ান ঈপ্সিত শান্তি। ভক্তিরও 'প্রকৃতিভেদ আছে, আকৃতি একই নদীতে বহতা হতে রাজি নয়, এমনকি কোনো-কোনো বিশেষ অবস্থায় মহানন্দকে ছাপিয়ে অজস্র শাখানদী-উপনদী।

বেশ কয়েকশো বছর ধরেই ধর্মীয় প্রকাশের এই বহুগামিতা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য জড়ানো। মন্দির-মসজিদ গমগম করছে, গৃহস্থরা আসছেন-যাচ্ছেন, ভক্তিভরে প্রণাম করছেন, আর্জি জানাচ্ছেন আরোপিত বিশ্বাস ঈশ্বরের কাছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান-নির্দেশ-ব্যাকরণ মাথা পেতে নিচ্ছেন কোনোরকম প্রশ্ন না করে, প্রাতিষ্ঠানিক

ধর্ম, কিংবা সেই ধর্মের 'সরকারি' প্রতিভূগোষ্ঠী, যখন যে-দাবি করছেন সঙ্গে সঙ্গে তা মেটানো হচ্ছে, পরিপূর্ণতম নিষ্ঠা, অখণ্ড বিশ্বাস, যেহেতু বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। কিন্তু পাশাপাশি বিপরীতমুখী স্রোতেরও প্রবাহ, কবি-বাউল-সুফি-দরবেশ-ফকির সম্প্রদায় প্রাতিষ্ঠানিক নিগড় মানেননি, ধর্মীয় ব্যাকরণের অনুশাসনে তাঁদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে, অন্তত তাঁরা দাবি করেছেন বন্ধ হয়ে এসেছে; অথবা যে-মুক্তির আনন্দ তাঁরা ধর্মাচরণ থেকে আশা করেছিলেন, তা আহরণ করতে পারেননি, অতএব তাঁদের বিকল্প প্রস্থান। তাঁরা নিয়মের বেড়াজাল ভেঙেছেন, ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাকে নিজেদের মনোমত নতুন করে সাজিয়ে নিয়েছেন, ব্যাকরণকে সরলীকৃত করেছেন, এক ধর্মের ব্যাকরণের সঙ্গে আরেক ধর্মের ব্যাকরণকে জড়িয়েছেন, কর্তাব্যক্তিদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক আতিশয্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ধর্ম যেখানে সামাজিক-আর্থিক অনাচারে পর্যবসিত, সেই অনাচারের বিরুদ্ধে লোকমত সংঘবদ্ধ করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন।'

এখানেও এক স্বভাবদ্বান্দ্বিকতার ক্রমশ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, বিশ্বাসের উৎসস্থল থেকেই প্রতিবিশ্বাসের স্পন্দন, ধর্মান্ধতার শরীর ফুঁড়ে প্রশ্নেব-জিজ্ঞাসার সন্দেহের মাথা তুলে দাঁড়ানো। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বঙ্গ ভূখণ্ড রাজনৈতিক দিক থেকে দ্বিখণ্ডিত, কিন্তু লোকধর্মের এই বিশেষ প্রবণতাকে দুই বাংলার প্রশাসনিক বিভেদ আদৌ বিচলিত করেনি, এখানে হয়তো সুফি মারফতীদের, কিন্তু মূল আবেগের প্রবাহ সর্বত্রই এক স্থিরবিন্দু থেকে বেরিয়ে অন্যত্র পরিক্রমণ করতে হবে, সহজ হতে হবে, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা অনুশাসনের থেকে মুক্ত হতে হবে।

সহজের অনুসন্ধান, অথচ সেই সঙ্গে গভীরেরও অন্বেষণ। এমন গভীরে কি পৌঁছে যাওয়া যায় না, শব্দ তার প্রাসঙ্গিকতা থেকে অপসৃত হবে, যেহেতু অভিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হওয়া গেছে, অতঃপর, লালন ফকিরের ভাষায়, 'নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে'? সুধীর চক্রবর্তী অন্তত পাঁচটি-ছটি এবম্বিধ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত কাহিনীস্থলে উপস্থাপন করেছেন, কর্তাভজাদের কথা, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বিবরণ, মারফতী সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত, গৌরাঙ্গ তান্ত্রিকদের নানা শাখা-প্রশাখার প্রসঙ্গ। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি জায়গায় মিল, আবার পাশাপাশি অজস্র মিলও। দাদাগিরি-গুরুগিরি-শরিয়াতের তথাকথিত উপরওয়ালাদের সদা চোখ-রাঙানোর বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই প্রব্রজ্যা, তবে কেউ-কেউ এখনো অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে দেহতত্ত্ববাদের এক বিচিত্র ধরনের সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন, এরই মধ্যে এক দল-দুই-দল আরো চরম প্রান্তে পৌঁছে গেছেন, ধর্ম তাঁদের কাছে যৌনতা-ঠাসা দেহতত্ত্বে গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে।

অন্য একটি ব্যাপারেও মিল। এটা বোধহয় অখণ্ড বাংলার জলহাওয়ার, গুণ, চারদিকে সুর ভেসে বেড়াচ্ছে, আকাশের আদলে, নদীর ঢেউয়ে, জমির ছলানিতে গানের মূর্ছনা। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে যেন মেনে নিয়েছেন সংগীতের আশ্রয় ছাড়া অন্বিষ্টতে পৌঁছনো অসম্ভব প্রস্তাব। প্রত্যেকেই তাই তত্ত্বকে গানের বাঁধুনি পরিয়ে দেন, সহজিয়াতম সুর সেই গানের একমাত্র সৌষ্ঠব। বাঙালি কথকতা সংগীতের মধ্যবর্তিতায়

নিজেকে বিকশিত করে, পরগনা-বা জেলা-বিশেষে গান-গাওয়ার ধরনে কিছুটা বিশিষ্টতাব রঙ লাগে, আউলিয়ার গান আর গৌরাঙ্গপ্রেমের গানের অন্তবর্তী পার্থক্য বাক্যবন্ধনে শুধু নয়, সুরের বিন্যাসেও তা বিধৃত হয়। কিন্তু, সমস্ত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই, গান গানই থাকে, গানই প্রধান এবং, বলা চলে, একমাত্র অবলম্বন, গানকে কখনো সংহিতা বা হাদিশের সুদূরত্বে পৌঁছে দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় অপর মিল, যেহেতু অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যুদ্ধঘোষণা থেকেই সম্প্রদায়গুলির অভ্যুদয়, তারা অনেকাংশেই সবরকম গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল যেমন সহজিয়া জাদুতে পরস্পরে মিশে যাচ্ছেন, হিন্দু-মুসলমানও যাচ্ছেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ই ঘোর ঈশ্বরবাদী, কিন্তু প্রতিটি সম্প্রদায়ই, আকারে-ইঙ্গিতে হলেও, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আচরণিক উদাহরণ মারফৎ পর্যন্ত, এই প্রত্যয় উচ্চারণ করছেন : ঈশ্বরকে পেতে হ'লে তাঁকে ভজনার পাশাপাশি পরস্পরকে প্রেমেব নিগড়ে বাঁধতে হবে, লোকপ্রেমই ধর্ম, লোকানুরক্তিই প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ।

যেহেতু এঁরা 'প্রথা-বহির্ভূত' আচার-আচরণে নিজেদের দীক্ষিত করেছেন, অনেক সময় পোশাক-পরিচ্ছদে পর্যন্ত যে বিভিন্নতা স্পষ্ট, সমাজের বাইরে ঠারে ঠোবে তাই তাঁদের অবস্থান। আলাদা বলে কোনো কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে, অথবা কোনো-কোনো বিশেষ অঞ্চলে, হয়তো কোনো কোনো সম্প্রদায় ভক্তিভালোবাসার বাড়তি শিকার হয়েছেন, তবে সকলের ক্ষেত্রে এমনধারা ঘটেনি। তাঁরা প্রধানত আড়ালেই থেকেছেন, লোকপ্রবাদ মারফৎ তাঁদের কথা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলা থেকে জেলান্তরে মানুষজন জানতে পেরেছেন। প্রতীপ ব্যাপারও ঘটেছে। রাজশক্তি নিরপেক্ষ থেকেছেন, কিন্তু, যেহেতু তাঁরা একটু আলাদা, প্রাতিষ্ঠানিক অত্যাচার তাঁদের উপর বর্ষিত হয়েছে, এবং সে রকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছ থেকে তেমন বিশেষ নিরাপত্তা-ব্যবস্থাও তাঁদের জন্য করা হয়নি। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে শরীয়তীদের আক্রমণে মারফতী সম্প্রদায়ভুক্তদের গভীর সমস্যায় পড়তে হয়েছে। দেশটা সাংবিধানিক ঘোষণা অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু লোককে ক্ষেপিয়ে তুলতে সেই ঘোষণা তেমন বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি এখনো; সুতরাং সব ধর্মের গোঁড়ারাই সুবিধা-সুযোগ পেলেই সহজিয়াদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করেছেন, ভয় দেখিয়ে, এমন কি ঘব বাড়ি পুড়িয়ে, বা দৈহিক নির্যাতন করে, গ্রামছাড়া করার চেষ্টা করেছেন পর্যন্ত।

তবে সব ক্ষেত্রে তো লোকলজ্জা ভুয়ো বা অলীক ব্যাপার নয়। অনেকসময় নিজেদের পায়েই কুড়ুল মেরেছেন সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা, অথবা তাঁদের মধ্যে বিশেষ এক গোষ্ঠী এমন আচরণ করেছেন যে সাধারণভাবে মানুষের মনে প্রবল বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হয়েছে, একের অপরাধে বহুকে শূলে চড়াতে হয়েছে। যে কোনো আন্দোলনেই কিছুটা খাদ ঢুকতে বাধ্য, দেহতত্ত্বসর্বস্ব গৌরাঙ্গপ্রেমীদের মধ্যে এই খাদের প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক কারণেই একটু বেশি, কে আসল কে নকল ঋতুবিশেষে বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে, ভক্তির নামে অনেক কদর্য বেসাতি সংঘটিত হয়, ধর্ম ও ব্যভিচারের মধ্যে তখন আর কোনো ব্যবধান থাকে না, যার ভুক্তভোগী হতে হয় ধর্মমার্গে বিশ্বাসী, কিন্তু

শক্তির বর্মবিহীন, আউল-বাউল-উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত সবাইকেই।

অন্য যে সমস্যা ক্রমশ দেখা দিচ্ছে তা প্রায় আগে থেকেই অনুমানসম্ভব। 'প্রতিষ্ঠানবিরোধী' আন্দোলনও, একটি পর্যায় অতিক্রম করার পর, জড় প্রতিষ্ঠানের রূপ পেতে শুরু করে, গুরুগিরিকেই পরোয়া না-করার উদ্দেশ্যে যাঁরা একদা একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকেই নতুন গুরুর উদয় হয়, তেমন তেমন হ'লে তিনিও ক্রমশ গুরুগিরি ফলাতে শুরু করেন, এমন কি, প্রথাবহির্ভূত ভক্তিবাদীদের ক্ষেত্রেও, গুরুগিরিও, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হয়। যে কদাচার-কাষ্ঠানুশান ইত্যাদি পরিহাব করার লক্ষ্য মনে রেখে সহজিয়াদের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, সে-সমস্ত নিষ্প্রাণ অনুশাসনেরই পুনরাবির্ভাব ঘটে। চক্রবর্তীমশাই স্পষ্ট করে অবশ্য এই সম্ভাবনার আশঙ্কা ব্যক্ত করেনি। কিন্তু তাঁর একটি-দুটি বর্ণনা থেকে সন্দেহ না হয়েই পারে না যে সহজিয়াদের মধ্যেও, ইতস্তত, অচলায়তন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে।

গোটা দেশ, গোটা উপমহাদেশ, এখনো মধ্যযুগের মানসিকতায় বিরাজমান। অন্ধকারসমাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক ঝোঁকের যতদিন অবসান না ঘটবে, ততদিন, ধরেই নেওয়া যায়, জনতার অধিকাংশ ধর্মে মজে থাকবেন, এবং মজে থাকার অন্যতম বিকল্প দৃষ্টান্ত হিশেবে বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ও টিকে থাকবেন। এবং সেটাই যদি বাস্তব হয়, তা হ'লে কি সামাজিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে, প্রগতিশীল রাজনৈতিক অভিলক্ষ্য পরিপূরণের স্বার্থে, সহজিয়া আন্দোলনকে ব্যবহার করা সম্ভব? সুধীর চক্রবর্তী নিজে প্রশ্নটি উত্থাপন করেননি, কিন্তু, আমাদের পশ্চিম বাংলায় অন্তত, লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে আপাতত প্রচুর চর্চা চলছে, বহুবিধ লোকায়ত সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটিয়ে তাকে সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শের পরিচর্যায় নিযুক্ত করা নিয়ে আর্ত আগ্রহের পরিস্ফুটন ঘটছে। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখে কিছু কিছু ইতস্তত পরীক্ষা-অনুশীলনাদি ও শুরু হয়ে গেছে।

আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মানসিক বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে আউল-বাউল-ফকিরদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল এই সম্প্রদায়ের মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিসাধনের জাদুমন্ত্র জানেন, তাঁদের কাছ থেকে সেই গুপ্ত মন্ত্র আহরণ করে আপামর জনসাধারণের মধ্যে গানে-গানে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। বরাবরের বাউণ্ডুলে নজরুল এক প্রগাঢ় যন্ত্রণার চাপে গ্রামে গ্রামান্তরে জেলায়-জেলান্তরে সহজিয়াদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মাসের পর মাস ধরে, সম্প্রীতির বাণীঠাসা দিস্তা-দিস্তা গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু ছায়া পূর্বগামিনী, কী নাগর বাঙালি, কী গাঁইয়া বাঙালি, কী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, কী মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত, বাউল-ফকির প্রভৃতিদের তত্ত্বকথা-তথা আচরণ—বিচরণ দিয়ে অনুপ্রাণিত ধর্মসমন্বয়ের সম্প্রীতিঠাসা তাঁর রচিত গীতিপুঞ্জের দিকে কেউ ফিরেও তাকাননি; তখন অন্য উন্মাদনা, অন্য ঘোরগ্রস্ততা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রেমকথা-প্রীতিকথার যুক্তিবিন্যস্ত গানের বুনন হেরে গেল।

ঐ ইতিহাসেরই যে পুনরাবৃত্তি হবে না তা কে বলতে পারে? বাড়া ভাতে ছাই

দেওয়ার ব্যাপার নয় এটা, কিন্তু অন্য একটি সন্দেহও না হয়েই পারে না। সহজিয়া আন্দোলনও ভক্তিকে আশ্রয় করেই। অথচ যে সমাজপ্রগতির প্রয়োজনে লোকধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিচর্চাকে ব্যবহার করার প্রস্তাব তোলা হচ্ছে, তার মূল লক্ষ্য ভক্তিকে সরিয়ে সাধারণ মানুষেব মানসিকতায় যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। গাধাকে দিয়ে ঘোড়ার কাজ হয় না, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অভীষ্টের অন্তর্লীন বৈসাদৃশ্য আরো অনেক বেশি মূলগত সমস্যা-জড়ানো। যুক্তিবাদের প্রচার করবো, অথচ অন্ধ ধর্মাপ্লুতাকে সেই উদ্দেশে ব্যবহারও কববো, এই প্রাকরণিক সিদ্ধান্তে একটি প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা কাজ করছে। সুধীর চক্রবর্তী মশাই নিজে হয়তো এ ব্যাপাবে মনস্থির করতে পারেননি, নয়তো ঈষৎ কূটনৈতিকতার আশ্রয় নেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভবত শ্রেয় বিবেচনা করেছেন। প্রধান প্রশ্নটি তাই 'গভীর নির্জন পথে'তে অনুচ্চারিত। তবে তিনি অন্তত যে তাঁর শ্রদ্ধাসিঞ্চিত গবেষণাকর্মের উপসংহারেও নিঃসংশয় নন তার পরোক্ষ প্রমাণ 'গভীর নির্জন পথের উল্‌টো বাঁকে' শিবোনামায় একটি পরিশিষ্ট জুড়ে দেওয়া। বিশ্বাস বনাম যুক্তি, ভক্তি বনাম বিজ্ঞান, বাঙালি মন জুড়ে এই তীব্র দ্বান্দ্বিকতা অব্যাহত। চক্রবর্তী মশাই কখনো এদিককার গালগল্প শুনিয়েছেন, কখনো ওদিককাব; দু'দিকেই কাহিনীর মোহিনী আকর্ষণ তুচ্ছাতিতুচ্ছতাকে পেরিয়ে। পাঠককে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়, তা হ'লে তাঁকে নিজস্ব যুক্তিভক্তির নিক্তি প্রয়োগ করতে হবেই। নিরপেক্ষ থাকলে চিত্তে অবশ্যই সুখের উদ্রেক হয়না। কিন্তু চক্রবর্তী মশাই হয়তো ইঙ্গিত করতে চাইছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুখের চেযে স্বস্তি ভালো · ভক্তিও পছন্দ নাস্তিকতাও পছন্দ, অবস্থা-বিশেষে। তবে এটা তো ব্যক্তিগত বাছাবাছিব ব্যাপার। এবং জোড়াতালি দিয়েই তো বাঙালি সমাজ চলছে, আমরা বিপ্লবেও আছি ঘুষ খাওয়াতেও আছি।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৯০

ক. ৪ ব্রাত্য লোকায়ত লালন

ক. ৪. ১ আলোচক : রমাকান্ত চক্রবর্তী

পাঁচটি সুবিস্তৃত অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে লালন এবং অন্যান্য ফকিরবাউলদের সম্পর্কে বহু তথ্য দেওয়া হয়েছে, এবং এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে কিছু দুষ্প্রাপ্য উপাদান। অসামান্য নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা এ রচনায় সর্বত্র প্রকাশিত; তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লালন সম্পর্কে লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা। যা প্রচলিত শিষ্টবর্গীয় মূল্যায়নে প্রায়শ দুর্লক্ষ্য। লেখকের ভাষা সুন্দর, বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল এবং সিদ্ধান্তসমূহ তথ্যেব ও যুক্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্বে যাঁরা বাঙালিদের বিশিষ্টতা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁরা নানা কারণে বাঙালি ফকির-বাউলদের অগ্রাহ্য করেন। এখন এ সত্য প্রতিপন্ন যে, যদি নিম্নবর্গীয় ধর্মকে অবহেলা করা হয়, তবে বঙ্গসংস্কৃতির বিবরণ বহুলাংশে অপূর্ণ এবং অপরিণত থেকে যাবে। সমন্বয়, অসাম্প্রদায়িকতা, সম্ভাবনা, জগৎ ও জীবনের রহস্য সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা, সঙ্গীত যদি সংস্কৃতির লক্ষণ রূপে বিবেচিত হয় তবে এই সমস্ত লক্ষণই লোকস্তরে ফকিরবাউলদের ধর্মবিশ্বাসে ও জীবনাচরণে, গানে, অল্পবিস্তর দেখা যায়। লেখকের আলোচনায় তা সুস্পষ্ট। স্তর ভেদে এটিও বঙ্গীয় সংস্কৃতি যার দুর্মূল্য দীপ্তি শুধু চক্ষুষ্মান গবেষক দেখতে পান।

প্রথম অধ্যায়ের (পৃ.১৭-১২৬) বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছে লালন-আবিষ্কারের বিচিত্র তথ্য; লালনচর্চার ক্রমবর্ধমান পরিধি; লালনের জাতি-পরিচয় সম্পর্কে ঘনীভূত বিতর্ক; পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান 'সুফী'-সাধকরূপে তাঁর পুনর্বাসন, লালনতত্ত্বের উদ্দেশ্যমূলক ভাষ্য রচনার কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস; লালন ও ফকিরদেব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের জঘন্য অপপ্রচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে(পৃ. ১২৭-১৭৫) বিস্তারিত ভাবে অধীত হয়েছে লালনের সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। লেখক এটা দেখাতে পেরেছেন যে, লালন "নিম্নজীবনের শিকড়" থেকে, এবং প্রধানত ধর্মবিশ্বাসের পরিব্যাপ্ত ক্ষুদ্র ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁর অনেক গানের বাণীতে তা দেখা যায়, অনুভব করা যায়। প্রধানত এই কারণেই বঙ্গীয় রেনেসাঁস্-এ তিনি এবং অন্যান্য ফকির বাউলরা যেমন ছিলেন মহিমান্বিত, তেমনি ছিলেন অপরিচিত, রেনেসাঁস্-এর আধুনিক নাগরিক বৃত্ত থেকে নির্বাসিত। লেখক প্রসঙ্গত অন্যান্য ফকির ও বাউলদের কথাও আলোচনা করেছেন। কলকাতা থেকে কিছু দূরে মধ্যবঙ্গ কুমারখালি কুষ্টিয়া শিলাইদহে যে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল, লেখকের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনায় তা পরিস্ফুট। এ ধরনের খবর এখন ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ১৭৬-২১৭) লেখক দেখিয়েছেন যে, "লোক ধর্মের দিগন্ত বহুল প্রসারিত এবং ঔদার্যে অনাবিল" (পৃ১৭৭)। প্রসঙ্গত তুলনামূলকভাবে আলোড়িত হয়েছে সাহেবধনী, কর্তাভজা, বলাহাড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি, "বর্তমান" এবং "অনুমান" ভিত্তিক

বিশ্বাসের বৈপরীত্য, এবং ফকির-বাউল সাধনায় যৌনতার স্থান। চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃ.২১৮-২৪৫) দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যাত হয়েছে লালনগীতির আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা। লেখক অবশ্য জানেন যে, তাঁর ব্যাখ্যায় অনুপপত্তি থাকতে পারে কারণ এসব গানের প্রকৃত তাৎপর্য অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নির্ণেয়। তাঁর দুটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন যে, লালন ফকির ছিলেন, বাউল ছিলেন না(পৃ.২২০)। লালন ইসলাম-বিরোধী ছিলেন না, ছিলেন "ইসলাম ধর্মবিধির সমান্তরাল বা ভিন্ন ভাষ্যকার" (পৃ.২২৩) শেষ অধ্যায়ে বহু নিদর্শন সহ লেখক প্রমাণ করেছেন যে, যাঁরা লালনগীতির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। এসব অনুবাদে লালনের আন্তর উপলব্ধি ও অনুভূতি প্রকাশিত হয়নি।

সুরচিত এবং গুরুত্বসম্পন্ন এই গ্রন্থের কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখ্য। আখ্যাতে লালনকে 'ব্রাত্য লোকায়ত' বলা হয়েছে। এই শব্দদুটির যে বিশেষ অর্থ আছে, তা লালন সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে কি না, এ প্রশ্ন তোলা যায়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে 'ব্রাত্য'রা আর্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠান করতেন না। এ কারণে তাঁরা "আউট্‌কাস্ট্‌" রূপে বিবেচিত হ'তেন। ইংরেজি শব্দটির অর্থ ঠিক জাতিচ্যুত নয়, সমাজচ্যুত। লালন.সমাজচ্যুত হননি। কিন্তু তিনি জাতবিচার মানতেন না। তাই তাঁকে কি 'ব্রাত্য' বলা যায়? 'লোকায়ত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক। কিন্তু লালন তো নাস্তিক ছিলেন না।

ওদিকে সমাজে বাস করতেন বলেই তাঁর দশ হাজার শিষ্য-শিষ্যা ছিল। আখ্যাতে এই দুটি শব্দের ব্যবহার যেন কেমন কেমন ঠেকে।

দ্বিতীয় ত্রুটি এবং গুরুতর ত্রুটি পুনরুক্তি; যেমন, লালন-বিদূষণের বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ উক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত সিরাজ শাহ্ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচনা নেই, অথচ লালন বারবার তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। লালনের গুহ্য সাধনা কতটা সিরাজের, কতটা লালনের তা এই বই পড়ে বোঝা গেল না। চতুর্থত লালনগীতিতে সুফি এবং বৈষ্ণব প্রভাব পূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। নিম্নবর্গে তৃণমূলস্তরে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাভ্যাস সম্পর্কে লেখকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অবশ্যই সমাদরণীয়। কিন্তু এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, এসব ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাভ্যাস প্রধানত অতীন্দ্রিয়বাদকে ও গুরুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, এবং তাদের প্রভাবে নিম্নবর্গের সংস্কৃতি অনাধুনিক স্তরে প্রস্তরীভূত হয়েছে। তার প্রাসঙ্গিকতা পর্যন্ত ক্রমশ খর্ব হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টি সম্পর্কে এ গ্রন্থে লেখক প্রায় কিছুই লেখেননি।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৫ আগস্ট ১৯৯৩

বেশ কিছু কাল থেকেই আমাদের দেশে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটছে। শিক্ষিত নাগরিক সমাজ যে শিক্ষা এবং জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তার সঙ্গে লোকজীবনের প্রায় কোনোই যোগ নেই। গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে যে জীবনচর্যা প্রচলিত, তার কোনো পরিচয়ই আমরা এতকাল রাখি নি। ভদ্র বা উচ্চবর্গের শিক্ষিত সমাজ ধর্মাচবণে যেমন বেদ পুরাণ স্মৃতিকে অনুসরণ কবে এসেছে তেমনি শিক্ষাদর্শে দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নীতি-তত্ত্বকেই জেনে এসেছে। শিক্ষিত সমাজে লোকজীবন সম্বন্ধে ধাবণা ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট। গত তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রীয় ধর্মাদর্শের পাশে যে একটা অত্যন্ত সজীব সচল লোকধর্ম এবং লোকজীবনধারা বয়ে চলেছে, এ সম্বন্ধে আমবা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছি। আমাদের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম আমাদের যে শিক্ষায় অভ্যস্ত করে তোলে, তার সঙ্গে দেশের এই জীবন ও সমাজেব কোনো যোগ নেই— যোগের কথা কল্পনাও কবি নি। এই শিক্ষা যে সৃষ্টিশীল নয়, এটা তারই প্রমাণ। ববীন্দ্রনাথ একথা চিরকালই বলে গেছেন। ১৯১১-তে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামক বিখ্যাত ভাষণে তিনি আমাদের ইংরেজি স্কুলে-পড়া বিদ্যাকে চতুষ্পার্শের সজীব জীবনের অনুসন্ধান অনুশীলন ও গবেষণায় স্বাধীন ও প্রয়োগসিদ্ধ করে তুলতে আহ্বান করেছিলেন।

দীর্ঘকাল চলে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সেই পথনির্দেশ বিশেষ কাজে লাগে নি। লোকসাহিত্য নিয়ে দীনেশচন্দ্রের মতো কেউ কেউ কাজ করলেও লোকজীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে কাজ শুরু হতে দেরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ১৯০৫তে প্রবাসী প্রত্রিকায় বাউলের গান সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি তিনি গান হিসাবেই সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের ধর্ম বিশ্বাসের অনুসন্ধান বা বিচারের জন্য করেন নি। তবে ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় দর্শন সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে বাউলের ধর্ম এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস মতো ব্যাখ্যা করেছিলেন। আজকালের গবেষকরা হয়তো বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাখ্যা বস্তুতই তাঁর নিজের কল্পিত মানবধর্মেরই ব্যাখ্যা, বাউলের ধর্ম বস্তুগত ভাবে দেখলে হয়তো ঠিক তা নয়। সে-কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত এই ধর্মকে স্বাধীন ভাবেই পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তার উপরেই জোর দিয়েছিলেন। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের ওই ব্যাখ্যা দ্বারা কিংবা তাঁর ইংরেজি বই 'রিলিজন অব ম্যান'-এর পরিশিষ্টে সংযোজিত ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবন্ধ দ্বারা বাউল ধর্মের প্রচলিত রূপটিকে বোঝা যাবে না। অন্তত সুধীর চক্রবর্তীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা-লব্ধ 'গভীর নির্জন পথে'র মতো বই পড়লে তাই মনে হবে। ইতিমধ্যে শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা 'Obscure Religious Cult' বা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল' বইতে এই লোকধর্ম সম্বন্ধে এমন সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে যা শিক্ষিত সমাজ আগে ভাবতে পারে নি।

অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মূলত শাস্ত্রধর্ম অববম্বনেই লোকধর্মের আলোচনা করেছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্কারবর্জিত মুক্ত দৃষ্টিতে এর আলোচনা হতে আরও কয়েক বৎসর কেটে গেছে। ইদানীং কালে লোকসাহিত্য চর্চার পথিকৃৎ আশুতোষ ভট্টাচার্য নৃতাত্ত্বিক রীতিতে এর আলোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর আলোচনাও ছিল ভাবনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ভেরিয়র এলউইনের সাহচর্যের ফলেই সম্ভবত। তাতে শাস্ত্রীয় রীতি পরিত্যক্ত হওয়ায় আধুনিক গবেষণার পথ সুগম হলো সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষয়টা হয়ে দাঁড়াল নিছক তথ্য ও বিবরণমূলক।

এই পরিপ্রেক্ষিকায় সুধীর চক্রবর্তীর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' বইটি দেখতে হবে। এতে তিনি বাউল ফকিরদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা শাস্ত্রমূলকও নয়, নৃতত্ত্বমূলকও নয়। তিনি এদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের জীবন এবং তত্ত্বকে তাদের দিক থেকেই বোঝবার চেষ্টা করেছেন। আবার এটাও ঠিক যে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেও বস্তুনিষ্ঠতার অভাব ঘটতে পারে। সুধীর চক্রবর্তীর বইতে যে তা হয় নি, এটাই তাঁর অসামান্য বৈশিষ্ট্য এবং দুর্লভ যোগ্যতা। বলতে বাধা নেই যে শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্যের পর তিনি আর একটি তৃতীয় রীতির প্রবর্তন করলেন।

তাঁর এ বইতে লালন সম্পর্কে এ-পর্যন্ত যত কাজ হয়েছে, যত রকমের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ তা আছেই, সেই সঙ্গে আছে উত্তর রাঢ় নদিয়া যশোর অঞ্চলের লোকধর্মের নানা শাখা প্রশাখার প্রত্যক্ষ বিবরণ । সে বিবরণ যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে ইতিহাস সন্ধানের দ্বারা। সরকারি দলিল, সেন্সাস রিপোর্ট তাঁকে সাহায্য করেছে এবং বহু পুস্তিকা ও গ্রন্থ যা অনেক সময় অকিঞ্চিৎকর যা সম্প্রদায় নিবদ্ধ বলে মনে হবে, বহু সমর্থন ও তথ্য তিনি সে-সব জায়গা থেকেই পেয়েছেন। এই সব উৎসগ্রন্থ সন্ধানে তাঁর দক্ষতাও আমাদের বিস্মত করে। কিন্তু এ-সব পরিপূরক অথবা সমর্থন মাত্র। এ-বইয়ের মূল বক্তব্য তাঁর নিজের এবং সে বক্তব্য নির্ভেজাল মৌলিক। লালন সম্পর্কে আজকের বাংলাদেশে প্রচুর লেখা হয়েছে, তাতে যেমন আছে সম্প্রদায়ান্ধতা, তেমনি আছে মুক্ত দৃষ্টি। এ-দেশে লালনের গানের প্রতি প্রীতি গড়ে উঠেছে— রবীন্দ্রনাথই তার মূল কারণ। আবার বাউল ধর্ম ও আচার সম্পর্কে বিরূপতাও এদেশে আছে।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মার্জিত অভিজাত রুচিতে বাউলের আচার অনুষ্ঠানকে মেনে নিতে বাধত। তাই সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য নেই। সুধীর চক্রবর্তী বাউলের গান সম্পর্কে তাঁর গভীর রসবোধের যেমন পরিচয় দিয়েছেন, তাদের আচার অনুষ্ঠান (আধুনিক রুচিতে যতই বর্জনীয় মনে হোক) সম্বন্ধেও তাঁর সমান জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সেই অধিকার যে কতখানি তা বোঝা যায় বাউলের গানের গূঢ় অর্থনির্ণয়ে এবং তাদের পারিভাষিক শব্দ বিশ্লেষণে। এ সব অর্থে তাঁর প্রবেশাধিকার জন্মেছে নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে বাস করে, তাদের গৃহে রাত্রিবাস করে, দীর্ঘ আলাপ আলোচনায় প্রহর কাটিয়ে, তাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে। বস্তুত তার পূর্ববর্তী বই 'গভীর

নির্জন পথে'তেই তাঁর সেই সব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার রম্য কাহিনী ছিল। এ-বইতেও ওই নামে একটি অধ্যায় আছে, তাতে বাউল ফকিরের সাধনপদ্ধতির আলোচনা আছে।

প্রসঙ্গক্রমে 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' বইয়ের একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার উল্লেখ করি। শরীয়ত-মানা শাস্ত্রাচারী গোঁড়া মুসলমান বাউল ফকিরদের ঘৃণা করে এসেছে শাস্ত্রত্যাগী বলে। লালনকেও তারা সহ্য করতে পারে নি। লেখক নদিয়া অঞ্চলে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতিনীতি পর্যালোচনা করে দেখেছেন। মারফতী সাহিত্য, মুসলমানী গদ্যে লেখা নানা পুঁথি-কিতাব, তাদের ধর্ম সমাজ সংশ্লিষ্ট বই, জওয়াবে এবলিস, তালীমুদ্দিনের মতো অনুশাসনমূলক বই, 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' ইত্যাদি ধৈর্য সহকারে পড়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং লক্ষ্য বুঝবার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। মুসলমান ধর্ম সমাজ সম্পর্কে বই বর্তমান বাংলাদেশে যথেষ্ট লেখা হচ্ছে। এদিক সম্বন্ধে আমাদের প্রায় কিছুই জানা নেই। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অনেক বিচিত্র রীতিনীতির পরিচয় লেখক দিয়েছেন। বাংলার লোকায়ত ধর্ম হিন্দু সহজিয়া মুসলমান সুফী এবং তাদের নানা রূপের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। এর সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবও আছে। প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকের ধর্মপ্রচারও এই অঞ্চলের লোকজীবনকে কম প্রভাবিত করে নি। এ বিষয়েও সুধীর চক্রবর্তী যথেষ্ট খোঁজ খবর নিয়েছেন। মুসলমান ধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্মের দ্বন্দ্ব-প্রতিযোগিতার বিবরণও অত্যন্ত কৌতূহলজনক। জন জমিরুদ্দিনের কথা আমরা কজনই বা জানি।

মোটের উপর লালনকে কেন্দ্রে রেখে লেখকের মনন ও সিদ্ধান্ত বাঙালি সংস্কৃতির এক ব্যাপক ক্ষেত্র পরিক্রমণ করেছে। লালনের গানের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ নির্ণয়ে তাঁর স্বাভাবিক রসবোধ পাঠককে মুগ্ধ করবে। লালন সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য গানের সূত্রেই জেগেছিল। কিন্তু তারপর শুধু গানের কাব্যমূল্য নয়, তাঁর গানের বিষয় ও বক্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে সুধীর চক্রবর্তীর এই বিস্তৃত গভীর তথ্যপূর্ণ লেখায় লালনের যে-ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হলো, তা এক কথায় চমকপ্রদ। লালনের নির্ভরযোগ্য জীবনকাহিনী নেই। এই দীর্ঘজীবী মানুষটি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। তারই মধ্য থেকে এবং বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ বর্ণনা থেকে লেখক লালনের একটা মূর্তি তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু লালনের জীবনটা যাই হোক, তাঁর গান থেকে লেখক তাঁর যে জীবন-দর্শনটি প্রস্তুত করেছেন তার মূল্য অসাধারণ। লালন কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন বলা কঠিন, তিনি হিন্দু না মুসলমান তাও জানি না, কিন্তু লালন মানুষে বিশ্বাসী এক প্রতিবাদী সাধক ছিলেন, তাঁর ধর্ম তাঁর নীতিবোধ মানুষের অস্তিত্বকে ঘিরে—এ কথাই সত্য। এই সূত্রেই লেখক দেখিয়েছেন আমাদের শাস্ত্রসম্মত জীবনধারার পাশে চির জাগ্রত রয়েছে এক প্রতিবাদী বিশ্বাসের ধারা। আমরা এতকাল তার সন্ধান রাখি নি। যখন শহরে মফস্বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো এসে পড়েছে এবং তারই প্রভাবে আমাদের যুক্তিবোধ নতুন করে জেগে উঠছে, ঈশ্বরের জায়গায় প্রত্যক্ষ মানুষকে বসিয়েছি, তখনও আমরা জানতাম না আমাদের ঘরে আর একভাবে এই ঘটনাই ঘটে চলেছে। তার জন্য কোমতের পজিটিভিজম যা ডারউইনের নিবর্তনতত্ত্ব জানতে হয়নি।

একে লেখকের একটা কেন্দ্রীয় বক্তব্য বলা যেতে পারে যা তিনি 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' বইতে বোঝাতে চেয়েছেন। সুধীর চক্রবর্তী দীর্ঘকাল যাবৎ লোকধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এসেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' এবং 'সাহেব ধনী সম্প্রদায় তাদের গান' একে একে লোকধর্মের এই প্রতিবাদী স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে এসেছে। এ দেশের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তিনি লোকধর্মের এই বিচিত্র প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে এসেছেন। বিস্তীর্ণতর পরিপ্রেক্ষিকায় অনুসন্ধান ও গবেষণা করলেও এই সত্যকেই পাওয়া যাবে হয়তো। চর্যাপদের সময় থেকেই শাস্ত্রবিরোধী এক বিবর্তনের ধারা আমরা দেখে আসছি। সুধীর চক্রবর্তী যা একটা অঞ্চলের সমীক্ষায লক্ষ্য করেছেন, তা বস্তুত এক চিরন্তন মানব সংস্কৃতিরই দ্বন্দ্বময় রূপ।

বক্তব্যে উপস্থাপনায় তথ্য ও তত্ত্ব-সন্ধানে 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' একটি অসাধারণ বই। এই বইয়ের হৃদয়গ্রাহিতার একটা বড় কারণ যে লেখকের সাহিত্যগুণান্বিত ভাষা, যে কোনো পাঠকই পড়লে তা বুঝতে পারবেন।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৯৩

ক. ১. ২. ৩. ৫ চারটি গ্রন্থের মিশ্র আলোচনা

আলোচক : **রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

হ্যাঁ, এবার আমরা বলতেই পারি, বাংলার গৌণ লোকধর্ম বিষয়ে সুধীর চক্রবর্তী মশায় তাঁর কাজের বৃত্তটি সম্পূর্ণ করলেন তবে! 'সাহেবধনী সম্প্রদায়: তাদের গান' দিয়ে যার সূচনা হয়েছিল, 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' দিয়ে তার উপসংহার রচনা করলেন তিনি। তথ্য এই যে, ষাট দশকের শেষে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লৌকিক গৌণ ধর্মের সবেজমিন তথ্য সন্ধান করতে গিয়েই নানা ধরনের গানের সঞ্চয় হচ্ছিল তাঁর। আর সেই সূত্রেই তিনি 'লোকধর্মের প্রাণবীজ' খুঁজে পেয়েছেন সেইসব গানেই। যদিও সেদিন তাঁর সামনে স্পষ্টত লক্ষ্য বলতে কর্তাভজা, সাহেবধনী এবং বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের মতো লোকধর্মই ছিল। কিন্তু কর্মসূত্রে মাঝে-মাঝেই তিনি লালন পন্থীদের সাক্ষাৎ পেয়ে লালনপন্থা কিংবা লালনগীতির রত্নদ্যুতিতে যে মোহিত হচ্ছিলেন, এও সত্য। তারপর, বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে তাঁর বাংলার গৌণ লোকধর্মেব বিচিত্র তথ্যতালাশের পাশাপাশি তত্ত্বতালাশেও। ঝুলিতে ভরে নিয়েছেন গান। ভরে নিযেছেন লৌকিক ধর্মসমূহেব গোপন, গভীর সব পথের সন্ধানী পথিকদের শব্দ আর নিঃশব্দেব তর্জনীসংকেতকে। তারপর সেসব গানের ভেতর দিয়ে যখন তিনি, তাঁদের ভুবনখানি দেখতে ও দেখাতে চাইলেন, আমাদের একটু একটু করে টনক নড়ল। একদিক থেকে নিশ্চয় বাংলা গানের এই রসিকজনটি তলে তলে বাংলার মুখকেই ভিন্নতর আলোয় দেখাতে চাইলেন। আর অন্যদিক থেকে নিশ্চয় একথা বলতেই পারা যায়, বাংলার লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় তাঁর আসনখানি পাকাপাকিই হয়ে রইল বাঙালি হিশেবে তাঁব নিজস্ব ঐতিহ্যকে চিনে, তাকে অর্জন করে নিয়ে। আমাদের আত্মবিস্মৃতির করুণ পরিণতিও যেন আবার এসবের ভেতর দিয়ে খানিকটা টের পাওয়া গেল। বাঙালির আত্মম্ভরিতায় তথাকথিত রেনেঁসাসের নাগরিক আস্ফালনে যেসব জিনিশ চাপা পড়েছিল, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেব প্রযত্ন সত্ত্বেও যে দিকটিকে প্রায় অন্ধকারেই রাখা হয়েছিল বলা যায় শহরে বিদ্বজ্জন সমাজের দূর পৃথিবীর গন্ধে মাতোয়ারা মনে, চক্রবর্তী মশায় সেইসব দিককেই ইউনিভারসিটি উইটসের থেকে খানিকটা মুক্ত করে, নব্য প্রজন্মকেও উৎসাহিত করলেন তাদের শিকড়গুলোকে চিনে নিতে। একদিক থেকে আমাদের মতো উনজনদের বরাত ভালো বলতেই হবে। ইদানীংকার সাব-অলটার্ন স্টাডিসের সব তত্ত্ববেত্তারা অবতীর্ণ হবার সূত্রে নানারকম লেখাপত্তর তো কতই বের হচ্ছে। আড্ডাধারী শহুরে বাবুরাও তো কত খোশখোরাকি গল্পগাছায় তথ্যের আছাড়ে বেধড়ক লোকসংস্কৃতি-চর্চাও করছেন! কিন্তু সুধীরবাবু যে বিল গাবানোর চেষ্টা করেন নি তা বেশ ভালোমতোই টের পাওয়া যায়। বরং মাছ ধরবার নাম করে বিল গাবায় যারা এমন দু-চারজনের নমুনা কিছু কিছু পেশ করে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন। 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'-এ তিনি তীক্ষ্মধী হয়ে সেই কাজটা বেশ ভালোমতোই করেছেন বলতে হয়।

যাই হোক, সাহেবধনী-বলাহাড়ি-ব্রাত্য লোকায়ত লালনকে নিয়ে যে ট্রিলজি গড়ে তুলেছেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমাদের মতো উনমানুষদের পক্ষে একদিকে যেমন 'গভীর নির্জন পথে'-র ভেতরই পাওয়া সম্ভব। তেমনই আরেকদিক থেকে এটা বলাও প্রয়োজন, উক্ত গ্রন্থখানি সাবলীল আখ্যানধর্মী রচনারীতির কারণেই লৌকিক গৌণধর্ম-সম্পর্কে আগ্রহী হবার পক্ষে পাঠকদের হাতে একেবারে একটি চাবি তুলে দেওয়াই হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, 'গভীর নির্জন পথে' ছাড়া বাকি তিনটি গ্রন্থের কোনোটাই কখনো যে পাঠককে বিমুখ করে না, বরং পাঠক খুশিমতো যেখান থেকেই পড়তে শুরু করুন-না-কেন, একসময় যে ঠিক এগিয়ে-পিছিয়ে পাতা উল্টে-উল্টে সূচনা থেকে উপসংহার অব্দি অবলীলায়--হয়ত কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েই--চলাফেবা করতে পারবেন, তা নিশ্চিত। তাঁর লেখার গুণপনা এমনই। তথ্য আর তত্ত্বকে এমন কবে মিলেমিশে সুখপাঠ্য করে তোলা খুব একটা দেখা যায়·কি? নির্দিষ্ট বিষয়-সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ সত্ত্বেও তো অনেক সময়ই বিমুখ হতে হয় লেককের প্রসাদগুণবোধের অভাবে। বড় পাওনা এটাও, তাঁর গ্রন্থপাঠে কখনোই ক্লান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না। সাম্প্রতিকের হদিশ তিনি রাখেন বলেই হয়ত তাঁর তার্কিকতাও শেষঅব্দি জপেনদাদেব বাকচাতুর্যকেও একটু কড়কে দিয়ে হিউমারে রসাপ্লুত করে। তাঁর গদ্যে দিয়ে হিউমারে রসাপ্লুত করে। তাঁর গদ্যে হিউমার-বঞ্চিত হয়েছি বলে তো কখনোই মনে হয় না। তিনি নিজে রসস্থ বলেই হয়ত অন্যের রসবোধের কথাও কিছু ভাবেন। অধ্যাপকীয় চালে তো নয়ই, বরং সুলেখকের লিপি-প্রবর্তনায় তাঁর হাতযশ কিছু আছে বলেই হয়ত পণ্ডিত মহলের বাইরেও তাঁর লেখার সুখ্যাতি কিছু রটেছে।

যদিও বর্তমানে তাঁর পরিচিতি লৌকিক গৌণধর্ম-সংক্রান্ত সরেজমিন তথ্যসন্ধানে বিভিন্ন পুস্তকের প্রণেতা হিশেবেও বটে; আবার আরেকদিকে বাংলা গানের রসিকজন হিশেবে আলোচক হয়ে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ থেকে আধুনিক বাংলা গানের জগতে। তাঁর চার দশকব্যাপী লেখক জীবনে ইদানীংকার পরিচয়ে যে খানিকটা বিশেষীকরণ ঘটে গেছে তা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু তালাশ করলে দেখা যাবে একসময় তিনি এসবের বাইরেও অন্যধরনের লেখাও লিখেছিলেন যৌবনে। 'একজন অজ্ঞাত মহিলাকবি' শিরোনামে নীলনলিনী দেবীকে নিয়ে একসময় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সুধীরবাবুর ইদানীংকার পাঠকমণ্ডলী হয়ত সেসবের খবর ততটা জানেন না। কবিতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বহুদিনের । আর সেই যোগাযোগেই দেখতে পাই, আজকে তাঁব লেখালেখির ক্ষেত্রটি কিছু ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও কখনোই তিনি ভুলে যেতে পারেন না মনোভূমিতে উপ্ত এবং সুপ্তও কিছুটা বটে, সেই কাব্যবীজটিকে। এমন এমন সব গানের চরণ তিনি উদ্ধৃত করেন তাঁর গদ্যে, যাদের কাব্যরসেই চমৎকার উপভোগ করা চলে--তাদের ভেতর গহন কোন লৌকিকের ধর্মীয় পরিভাষা রয়ে গেছে, তার হদিশ নিতে প্রাথমিকভাবে হয়ত মন ততটা চলিষ্ণু থাকে না আর। কিন্তু তিনিই আবার কাব্যাবেগকে সরিয়ে রেখে তাঁর যুক্তিধর্মী মনটিকে সক্রিয় করে আমাদেরও যেন তার অনুবর্তী হতে বলেন।

যখন তিনি লেখেন—"লোকায়ত জীবনে আমি কখনো অলৌকিক দেখি নি' (গভীর নির্জন পথে; পৃ.২৬৯), কিংবা যখন লেখেন—

'বারখেদার ফকিরকে দেখে একটা কথাই মনে হতে লাগলো যে মানুষ খিদে তেষ্টা শ্রান্তি সব কিছুকেই জয় করেছেন।...কিছু না হোক্ ষাট সত্তর মাইল হাঁটতে হয়েছে। অথচ এখানে আসা ইস্তক এই মানুষটা খাড়া বসে আছেন। মাঝরাত পর্যন্ত সারাক্ষণ বসেছিলেন শব্দগানের আসরে। এখন দলের সবাই ঘুমে কাদা অথচ ফকির একলা বসে আপন মনের গভীরে জপ করছেন। এরা নাকি শ্বাসের মধ্যেই জপক্রিয়া করে, শ্বাসেই এদের নামাজ। সে নামাজ অবশ্য বাতুন বা অপ্রকাশ্য। রাতের ত্রয়সী নামাজ থেকে শুরু হয়েছে শ্বাসের ক্রিয়া, শেষ হবে খুব ভোরে, সেই ফজর নামাজের সময়।

আমার ঘুমও নেই, নামাজও নেই। আমি নিঃসঙ্গ জিজ্ঞাসু। আমার সঙ্গী বলতে রবীন্দ্রনাথের সেই গান : 'ফিরি আমি উদাস প্রাণে। তাকাই সবার মুখের দিকে তাকিয়েই যে আমার জীবনের অর্ধেক কাটলো। এইসব আপাত অর্থে অজ্ঞ মূর্খ মানুষগুলো আমাকে যা শিখিয়েছে জানিয়েছে তার কণামাত্রও কি পেয়েছি শিষ্ট বিদ্বান মহলে? এই তো সন্ধ্যেবেলাতেই মোহন খ্যাপার মত সাধারণ স্তরের গায়ক আমাকে যে পথরেখা দেখালো তা কি আমার বিদ্যেবুদ্ধির পুঁজি থেকে কোনোদিন বেরোতো? বসে আছি ময়দানী বিবির হাতে তৈরি নক্‌শী কাঁথায়। তাতে জড়িয়ে আছে যে-সেবাধর্মের তাপ, যে সুন্দরের অভিবন্দনা তার কি আমি প্রতিদান দিতে পারবো কোনোদিন? অনিমীল চোখে বসে আছেন বারখেদার ফকির। জীবনের কত বড় সম্পদ আর সম্পন্নতা পেয়ে গেছেন আপন অন্তরে। সে শান্তি, সে-নিশ্চিতি কি একটুও আছে আমার অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতায়? এই সবই ভাবছি, আবার নবলব্ধ চৈতন্যতত্ত্বের কথাও ভাবছি। সেই যে পাটুলী স্টেশনে বাউল গোঁসাই বলেছিলো, 'তোমার একটু দেরি আছে, তবে জানতে পারবে তাঁকে কত দেরি আর? রাতচরা পাখির হঠাৎ ডাকে চিন্তার সূত্র কেটে যায়। রাত কি তবে শেষ হয়ে এলো? যেন একটা শীতের কাঁপন শেষরাতে শরীরকে জানান দেয়। একটু একটু চোখ জ্বলে। আমি খুব নির্ভার শূন্য মনে আশ্চর্য এই মানব পরিবেশে খানিকটা বিস্ময় পোহাই। শস্যের গন্ধ ওঠে উদাসী।' (গভীর নির্জন পথে; পৃ ২৪০-২৪১)

আবার এমন কথাও যখন দেখি—

'আমি দেখতে থাকি এই শ্রীশ্রী জায়গা। সন্দিহান মন আমার সাড়া দেয় কই? আমার জড়বুদ্ধি মেয়ের জন্যে এখানে হত্যে দিলে সে সেরে উঠবে? ঘুচবে তার পঙ্গুত্ব? ফিরবে তার বোধ? কথা বলবে সে?

আমাকে ডাকবে সে 'বাবা' বলে? সে ডাক যে তার মুখে আমি কখনো শুনি নি! হে আহাদ ফকির, আমাকে বিশ্বাস দাও। তোমাকে ভরসা করবার মতো বিশ্বাস।.....

না মুহূর্তে যুক্তিবাদী মন শক্ত হয়ে ওঠে। বিশ শতকের শেষ দিকে দাঁড়িয়ে এ আমার কীসব উলটো ভাবনা।....পৃথিবী এগিয়ে চলবে এবং সভ্যতা। আণবিক যুগ তৈরি করবে অবিশ্বাস্য পৃথিবী, বৈদ্যুতিন কৃৎকৌশল রিমোট কন্‌ট্রোলে চালাবে যান্ত্রিক সমাজজীবন। আহাদদের গল্প তখনও থাকবে? বিশ্বাস করবে মানুষ সে-সব?

হঠাৎ সমস্ত আশ্রমটা আমার সামনে বিস্ফোরিত হয়ে গেল। যেন অন্তহীন ব্যর্থ রিক্ত মানুষের নিষ্ফল মাথাকোটা এখানে দারুণ শ্বাস ফেলছে। যেন আমার মেয়ের মতো ভারতের পাঁচ লক্ষ জড়বুদ্ধি সন্তান মুক্তি চাইছে অসহায় জীবন থেকে নিষ্ক্রমণের জন্যে। হতবাক আমার কাঁধে হাত রেখে বৃদ্ধ ওয়াসেফ বললেন : আপনার কষ্ট আমি বুঝছি। আপনার মধ্যে ভক্তি নেই। আপনি কোনোদিন শান্তি পাবেন না।

আমি অভিমান ভরে মাথা তুললাম আর মনে পড়ল সুফল সরকারের প্রত্যয়ভরা মুখখানা। সেই সঙ্গে তার তেজোদীপ্ত কথা; 'এ দেশটার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে ভক্তি। মানুষকে মাথা তুলতে দেয় না। আমার লড়াই এই নেতানো ভক্তির বিরুদ্ধে।' কথাটা মনে পড়া মাত্রই আমি শ্যাওড়াতলা ত্যাগ করলাম খুব দ্রুত পায়ে।'...(গভীর নির্জন পথে, পৃ.২৬৮-২৬৯)

এরকম আরো সব কথা আর আখ্যানের সম্মুখীন হয়ে স্বভাবতই কয়েকটি প্রশ্ন জাগে মনে। 'লোকধর্মের প্রাণবীজ' খুঁজতে গিয়ে কি ভদ্রমহোদয় গভীর নির্জনে তাঁর অন্তরগত জিজ্ঞাসায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আওতার বাইরে তবে লোকধর্মের বাউল-সহজিয়া টানে 'ধর্ম'-কেই অর্থান্তরে বুঝে উঠত চেয়েছিলেন? নিজের ধর্মজিজ্ঞাসা কি তবে সম্প্রদায়ের ধর্মমতের অনেক দূরে অনেক ঊর্ধ্বে কোথাও 'ধর্ম'-রই স্রোতল ধারায় আপন অস্তিত্বের অর্থসন্ধান করতে চেয়েছিল? ইউ জি সি, কি আই সি এস এস আর, কি সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা-বৃত্তি, আর পি এইড-ডি—প্রাপ্তির পার্থিব আনুকূল্যের হায়ারারকির বাইরে যে অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে মানবমনের গভীর নির্জন পথে গানের ভুবন দিয়ে জগৎ দেখার বাসনা—যে জগৎ আবার লোকায়ত হয়েও 'বাতুন বা অপ্রকাশ্য'—তার কোথাও কি তবে ছিল না, ভারতীয় সাধনার ধারায় ব্রাহ্মণ্যবাদের সমান্তরাল তো বটেই, এবং শরিয়তি কলমার সমান্তরাল লৌকিক গৌণধর্মের বিচিত্র আকীদা নিয়েই ধর্মের ভিন্নতর, ঈমানের ভিন্নতর ব্যাখ্যানে গড়ে ওঠা লোকায়েতের কাছে নতজানু হয়ে, শব্দ আর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে শরীরমন্দির আর শরীরমসজিদের অর্থ বুঝে নেওয়া? ছিল। ছিল বলেই দেখা যায়, ব্যক্তিগত আর নৈর্ব্যক্তিকে মিলেমিশে তাঁর এইসব গ্রন্থে আসলে বাংলার গৌণ লোকধর্মের কথা বললেও তিনি, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

ঊর্ধ্বে প্রকৃতপক্ষে মানবের দেহতত্ত্বের ভেতর দিয়ে এক অর্থে বস্তুবাদী দর্শনের অন্যতর ভিত্তিভূমিই স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন হয়ত। একদিন, সদ্যপ্রয়াত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় আমরা যেমন 'লোকায়ত দর্শন'-এর ভিতর দিয়ে ভারতের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিকে খানিকটা বুঝে উঠতে চেয়েছিলাম; আজ, তেমনই সুধীর চক্রবর্তী মশায়ের মধ্যস্থতায় বাংলার গৌণ লোকধর্মের বিভিন্ন ধারায় সেই দর্শনেরই লৌকিক আবেদনের ভেতর দিয়ে, আমাদের মনের গভীরে সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের বীজটিকে উৎপাটিত করার প্রয়োজনে, আবারো প্রয়োজন হল 'ধর্ম'-র অন্তরগত অগ্নিটিকে, 'ধর্ম'-র অন্তরগত স্রোতাচ্ছ্বাসকে ধর্মতন্ত্রের ভস্ম আর বালির চড়ার বিপরীতে বুঝে-ওঠা।

আমাদের সময়ে মন্দির আর মসজিদ নিয়ে নিম্নরাজনৈতিক দাবাখেলায় যখন প্রতিটি সাধারণ মানুষের জীবন এবং যাপন প্রতিটি সাধারণ মানুষের জীবন এবং যাপন ছন্নমতি দাঙ্গায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, প্রতিটি ব্যক্তিগত সম্পর্কও যখন সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধিতে নিরূপিত হতে শুরু করে, তখনই প্রয়োজন পড়ে লালনের মতো সাধকের আজীবন সংগ্রামের কথা জেনে·নেওয়ার। জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে , সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করেও কীভাবে লালনের মতো মানুষকে নিয়েই সাম্প্রদায়িক ধর্মতন্ত্রের হামলায় প্রকাবান্তরে তাঁকেই হননের আয়োজন চলে। যূথাচারে কীভাবে 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া'-র মাধ্যমে ইসলামি আকীদার মৌলবাদী পথিকরা বাউলদের, মারফতি ফকিরদের সন্ত্রস্ত কবে তোলে। লালনকে কীভাবে সাম্প্রদায়িক করে তুলতে চায় মৌলবাদীরা। ওপর তলার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ছত্রছায়ার বাইরে কী ব্রাহ্মণ্যবাদী, ইসলামি প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে—সমাজের প্রান্তিক মানুষজন কীভাবে শ্রমবিভক্ত হয়েই নিজেদের যাপনের ভেতর ধর্মকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকেন, কীভাবে ভক্তিতে, সংস্কারে, কুসংস্কারে ছড়িয়ে থাকে তাঁদের অন্তরগত ঐক্যবোধ--প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেসব জানার। সুধীর চক্রবর্তী মশায় এইসব কিছু নিয়েই তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'-এ তো বটেই, অপরাপর গ্রন্থেও আমাদের দৃষ্টিকে ঘোরাতে চেয়েছেন সেই লৌকিকের দিকে—যেখানে তথাকথিত ভদ্রসমাজের চোখ সচরাচর চলে না, সেই উপেক্ষিত লোকায়তের দিকে। স্বার্থবুদ্ধিতাড়িত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেখানে বারংবার আঘাত হেনেছে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধের সেইসব কথা—

> 'মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

'মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র'--রবীন্দ্রনাথের এহেন কথায় স্মরণীয়তাকে মান্য করেই আমাদের বুঝে নিয়ে হয়, সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষজনের কাছে, জাতিভেদ আর বর্ণভেদ-শাসিত হিন্দুসমাজ এবং আশরফ ও আতরফে বিভাজিত মুসলমান সমাজের ধর্মতন্ত্রের আঘাতে বেদনার স্বরূপটি কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ি

এবং লালনের গানে কীভাবে বেজে উঠেছিল। এইসব গৌণ লোকধর্মের অঙ্গনে কীভাবে 'ভাবতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'-য় 'কবীর-দাদু প্রভৃতির শিক্ষা' এবং মুসলমান ভাব ও সাধনা'ও প্রভাব বিস্তার করে, সেটিও নিশ্চয় ভেবে দেখা প্রয়োজন আছে। ক্ষিতিমোহন সেন সেরকমই ভেবেছিলেন। 'বাংলা মগধের সহজমত, নাথমত, নিরঞ্জন-মতের প্রভাব যথেষ্ট' ছিল বলে তিনি জানিয়েছিলেন 'বাংলাদেশের খুশীবিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, বলরামী, ন্যাড়া, সহজী, বাউল, দরবেশ, সাঙ্গঁ, সংযোগী, যদুপতিয়া, কর্তাভজা প্রভৃতি দলের উপর'। আমাদের আলোচ্য চাবটি গ্রন্থের ভেতর বিভিন্ন গানের উদ্ধৃতি এবং সংকলনের দিকে তাকালে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যায় কবীর ও দাদূ-র পদাবলির অনেক কথাই যেন বাংলা ভাষান্তরে রয়ে গেছে যেসবের ভেতর। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধরনের ভেতর অধ্যাত্মগীতির রাজ্যপাট স্বভাবতই আমাদের দেশে সুচিরকাল যাবৎ জাতিভেদ ও বর্ণভেদের শাসনে, সামাজিক সম্পর্কগুলোব শ্রেণীবৈষম্যের বিচিত্র চেহারা থেকেই হয়ে উঠেছে পরমার্থসন্ধানী। পার্থিবর চেয়ে পরমার্থের সন্ধান বাংলার লোকসংগীতে যে বিস্তর, আর সেটা যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষজনের অবস্থানের পবিপ্রেক্ষিতেই, তাও আমরা খানিকটা বুঝে উঠতে পারি হযত। লোকজীবনের গান বলতে গেলে নিশ্চয়ই কেবলমাত্র অধ্যাত্মগীতিকেই বোঝায় না, এ আমরা জানি। কিন্তু জীবনের অনিত্যতার বোধে আক্রান্ত হযে যে অধিকাংশ গানেই অন্য সুর বেজে উঠেছে তা কি আমরা বুঝতে পারি না! সুধীরবাবু সাহেবধনী, বলাহাডি, লালনের গান এবং কর্তাভজাদের গান নিয়ে আমাদের আলোচ্য চারটি গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিস্তর আলোচনা করেছেন, তা তো একদিক থেকে বাংলার লোকসংগীতের অধ্যাত্মগীতিরই আলোচনা বলতে হয়। সুতরাং, তাঁর কাজের ক্ষেত্রে যে বর্গীকরণ ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। আর সেটা হয়ত তাঁর বিভিন্ন লক্ষ্যেব অন্যতমও ছিল।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান' গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই বাংলার গৌণ লোকধর্ম-সংক্রান্ত তাঁর কাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। উক্ত গ্রন্থে যখন তিনি জানান এক জায়গায়—

> বাংলা লোকসংগীতের প্রধান অংশ যে আসলে কোনো কোনো লৌকিক ধর্মের তাত্ত্বিক ভাষ্য তা অনেকসময়ে আমাদের মনে থাকে না। সেই গৌণ অনুষঙ্গ থেকে আলাদা ক'রে গানগুলি শুনলে বা সাহিত্যিক আলোচনা করলে তার অঙ্গহানি ঘটে। সেই ভুল কিছুটা করেন রবীন্দ্রনাথ, অনেকটাই করেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং 'লালন গীতিকা'র ভূমিকায় শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনা তো নিছক দর্শন। মনসুরউদ্দিন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বরং অনেকাংশে ক্ষেত্রগবেষণার কাদামাটিমাখা সত্য দেখেছেন। আসলে লোকধর্মের ভেতরকার ছোটখাট মতান্তর খুব সূক্ষ্ম। যেমন কর্তাভজাদের সঙ্গে সাহেবধনীদের অনেক বিষয়ে মিল আছে বিশ্বাসের দিক থেকে, কিন্তু আচরণের দিক থেকে আছে বেশ তফাৎ। লালনপন্থীদের

> সঙ্গে ফকিরিতন্ত্র ও বাউল মতবাদের ছোটখাট অনেক তফাৎ আছে। সাঁই-মত আর দরবেশীতন্ত্র এক নয়। খাঁটি ইসলামের সঙ্গে ফকিরদের সম্পৃক্ততা যতখানি, বাউলদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের সম্পৃক্ততা ততটা নয়। এসব স্পষ্ট করে বুঝতে গেলে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অর্জন করতে হয়, তাদের সঙ্গে ঘুরতে হয়। তারা শাস্ত্র মানে না কিন্তু তাদের মৌখিক আচরণবিধিতে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া আছে : 'আপন সাধন কথা, না কহিও যথাতথা।' এটা সব মরমী সাধক মেনে চলে, এমনকি সাধারণ অজ্ঞ জিজ্ঞাসুকে তারা খানিকটা উল্টোপাল্টা ব'লে অনেক সময় বিভ্রান্ত ক'রে দেয়। তাদের গানের ভাষা ও প্রতীক আমাদের অচেনা তাই প্রহেলিকাময়।

স্বাভাবিকভাবেই তখন আমাদের শহুরে জীবনের সীমাবদ্ধতায় নিজেদের অজ্ঞতার ব্যাপারে একটু সমঝে যেতে হয় বৈকী। এবং সেইসঙ্গে যখন দেখি তিনি লিখছেন—

> ....বিভ্রান্তি ভুলবোঝাবুঝি অপব্যাখ্যা প্রভৃতি বিতর্কিত ব্যাপারগুলি সরিয়ে রেখে লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির সবচেয়ে চিরজীবী অংশ অর্থাৎ তাদের গানগুলি আমরা যদি বুঝে নিতে পারি তবে আমাদের একটা সারস্বত উত্তরাধিকার লাভ হয়। সে কাজে গান জানার দিকটি যেমন জরুরি তেমনই গুরুত্বপূর্ণ গানগুলির ধর্মতত্ত্বগত বিষয় ও প্রকরণ বুঝে নেওয়া। সে-প্রয়াসের সূচনায় আমাদের স্পষ্টত জেনে রাখতে হয় যে বাউলধারা আর সহজিয়াধারা এক নয়। বাউল মতে ইসলাম-সুফিতত্ত্ব-ফকিরিতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে। সহজিয়া মতে মিশে আছে তন্ত্র-বৈষ্ণবধর্ম-নাথপন্থ। অথচ উভয়ের গানে শব্দ তত্ত্ব প্রতীক অনেকসময় এক।

অথচ, আমরা কত সহজেই আউল-বাউল জাতীয় শব্দ ব্যবহারে এঁদের ভেতরকার 'বিশ্বাসের বিচ্ছিন্নতা' এবং 'ভাবের সম্পৃক্ততা'-কে বুঝে না উঠেই-তালগোল পাকানো কোনো অস্পষ্ট ধারণায় প্রায়শই আমাদের অজ্ঞতাকেই শুধু নয়, রীতিমতো অশিক্ষার্থীর ভূমিকায় নিজেদের প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করি না! তথাকথিত আধুনিকতার হাত ধরতে গিয়ে আমাদের স্খলনের বিচিত্র নমুনার ভেতর এসবও রয়েছে।

সাহেবধনী, কি কর্তাভজা, কি বলাহাড়ি, লালনপন্থীদের বেলাতেই নয় শুধু, লৌকিক গৌণধর্মের দেহাত্মবাদী সাধনার ভেতর প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বস্তুবাদী দর্শনের বিচিত্র পথরেখা কীভাবে আকীর্ণ হয়ে আছে, তার অনুসন্ধান করতেই বা আমাদের কতটুকু আগ্রহ! সুধীরবাবু ঠিকই লিখেছেন—'তাদের মৈথুনাত্মক কায়সাধনার গুপ্ত ব্যাপার সম্পর্কে শহুরে গবেষকদের জানবার আগ্রহ অসীম'। আর সেই আগ্রহেই অতি উৎসাহী কোনো কোনো গবেষক যে গুরুতত্ত্বের গানকে মৈথুনতত্ত্বের গান হিশেবে ধরে নেবেন এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। এমনকী অতিবড় গানের ভাণ্ডারীরাও যে দেহতত্ত্বের গানকে অনেকসময় শ্রমজীবী মানুষজনের শোষণ-বঞ্চনার দরুন ক্ষুভিত অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের নিরিখেই ভেবে দেখেন সেও কি আমাদের অজানা! আর

দেখতে গিয়ে যে লৌকিক ধর্মগুলোর নিজস্ব ভাষ্য থেকে বিচ্যুত করে উচ্চবর্ণের ভাবনাজগতের ছাঁচে ফেলে তাদের ব্যাখ্যান তৈরি করেন তাও তো নেহাত বিরল ঘটনা নয়। সমস্যা এখানেই। কেবল যে এখানেই, এমন হয়ত নয়। লৌকিক গৌণধর্মগুলোর ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনই আবার দেখা যায় লোকপুরাণের পুনর্নির্মাণকল্পেও সৃজনশীল মাধ্যমের মানুষজন যতখানি তাঁদের মনের রঙে রাঙিয়ে তাদের গড়ে তোলেন, ততখানি ঠিক লোকপুরাণগুলোর নিজস্ব অবস্থানের প্রতি সবক্ষেত্রে বিশ্বস্ত থেকে নয়। এই যে তথাকথিত উন্নতমনস্ক উচ্চবর্ণের ভাবনাজগতে পুনর্বাসনের প্রয়াস লোকায়তকে ঘিরে, এর ভেতর অনেকক্ষেত্রে একটা গুপ্ত প্রভুত্বের মানসিকতা যে থেকে যায় না, তা কি খুব জোব দিয়ে আমরা বলতে পারি? এখন তো অনেকসময়ই আমরা ঔপনিবেশিক শক্তির চোখ দিয়ে দেখা আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যানের পাল্টা জবাবে দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে অনেককিছুরই নতুন ব্যাখ্যান নির্মাণ করতে চাইছি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের ভেতরই যে-লৌকিক অন্ত্যেবাসী, তার ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি আমাদের মনোভঙ্গিতে কোথাও খুব বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে? সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্রকে বিদেশী শক্তির নিরিখে না হয় বোঝা গেল, কিন্তু দেশের ভেতরই যে সাংস্কৃতিক স্বৈরতন্ত্র সুচিরকাল ধবে তার রাজ্যপাট কায়েম করে রেখেছে, তার খবর কতটুকু রাখি, তার উচ্ছেদে আমাদেব কতখানি আগ্রহ? একতার নামে, বৈচিত্র্যকে ঠেসে ধরতে গিয়ে ঐক্যের জম্পেশ বুলিতে, প্রতিমুহূর্তেই কি আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অবমাননা করছি না ক্ষুদ্রের স্বাযত্তকে? আজ যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতিসত্তার আন্দোলন দেখা যাচ্ছে, তার ন্যায্যতাকে কতটুকু আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝে উঠতে চেয়েছি? 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' নামক এক সরকারি বাঁধাবুলির চালনিতে কি সবকিছু ছেঁকে ফেলতে চাইছি না? বিপদ তো এখানেও। সমস্যা তো এখানেও রয়ে গেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমহামণ্ডলীর চাপে লৌকিক গৌণধর্মগুলোর নিজস্ব অস্তিত্বের সংকটের মতোই তো আজকের জাতিসত্তাগত আন্দোলনের পেছনেও রয়ে গছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রিকতার অতিরিক্ত ঝোঁক, নির্দিষ্ট একটা বলয়ের কিছু মানুষের পাটোয়ারি বুদ্ধির গুণাগার দিতে হচ্ছে অপরাপর অঞ্চলকে, সেখানকার মানুষজনকে। কখনো কি আমরা ভেবে দেখেছি কেন গৌণ লোকধর্মগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোর সঙ্গে মিশতে চাইবে? কী দায় আছে তাদের? বরং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোই নিজস্ব স্বার্থে গৌণ লোকায়ত ধর্মসমূহের কাছে এগিয়ে ওপর ওপর তাদের স্বাধিকারের কথা বললেও তলে তলে প্রকারান্তরে তাদেরই আত্মসাৎ করতে চাইবে। এই বিষয়টাই সুধীরবাবু তাঁর 'গভীর নির্জন পথে'-র গৌরাঙ্গের মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা' শীর্ষক অধ্যায়ে বুঝিয়ে উঠতে পেরেছেন।—

> মনে পড়া উচিত যে, চৈতন্যজন্মের অনেক আগে তুর্কী আক্রমণের মুখে, অত্যাচারের ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন, বর্ধিষ্ণু জনপদ থেকে বহু দূরের অনুন্নত প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে অনার্য সমাজ কাঠামোর এক কুসংস্কারান্ধ জনমণ্ডলী পূজা করতো

> তাদের কৌম দেবদেবী চণ্ডী, মানসা, ধর্ম বা অন্যকিছুকে। যাদের কোনো Anthropomorphic গঠন ছিল না, যাদের তারা খুঁজে নিয়েছিল পাথুরে নুড়ি বা সিজবৃক্ষে এবং এমনকি বন্য জন্তু ও সাপে। তাদের বানানো অপদেবতাদের রুদ্রকাহিনী ও প্রতিহিংসাপ্রখর ভযংকরতা নিয়ে তারা মুখে মুখে বানিয়েছিল মেয়েলি ব্রতকথা। ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চবর্ণযুক্ত নবাগত শিষ্টসমাজ অচিরে হিন্দু পুরাণের সঙ্গে কল্পনা কৌশলে ব্রতকথাগুলিকে মিলিযে মিশিয়ে তৈরি করে নিলেন মঙ্গলকাব্য। এইভাবে মুখে-মুখে বলা গ্রাম্য ব্রতকথা পেয়ে গেল মার্জিত সাহিত্যের উচ্চ সম্মান। কথকঠাকুররা সেই মঙ্গলগান গাইতে লাগলেন গ্রামে-গ্রামান্তরে। জীবিকার একটা পথও খুলে গেল। কেন না আসব বসতো এক মঙ্গ লবার থেকে আরেক মঙ্গলবাব পর্যন্ত। এইভাবেই অনার্য সমাজের কাঁধে হাত বেখে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরা (দু'দলই উপবীতধাবী) পেয়ে গেলেন সম্মান ও সম্ভ্রম। অন্ত্যজবাও খুশি হলো। কেন না তাদের কাহিনী পেল মান্যতা। তারা তো উঁচু হলো। এইভাবে সাপেব দেবী মনসা হলেন শিবের কন্যা আদিবাসী চণ্ডী হলেন দুর্গাব প্রতীক চণ্ডী। অচ্ছুৎ অশ্রুত ব্রাত্যকাহিনী পেল অভিজাতবর্গের স্বীকৃতি। ব্রাহ্মণ্যকরণ সম্পূর্ণ হলো।

অবশ্য, এই উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত 'অনার্য' ও 'কুসংস্কার' শব্দ দুটিব প্রসঙ্গে কেউ কেউ তর্ক তুলতেও পারেন। তথাকথিত আর্যরাও কি কুসংস্কারমুক্ত আজ? নাকি সেদিনও ছিল? আদিবাসী জনমণ্ডলীর ধর্ম-সংস্কৃতিকে উচ্চবর্ণের ধর্ম-সাংস্কৃতিক আচবণে 'দলিত' কবার নমুনা তো নেহাত কম নয়। সুতরাং আদিবাসী জনমণ্ডলীব ধর্মাচরণে নানান সংস্কারকে 'অনার্য সমাজ কাঠামোর কুসংস্কারান্ধ' বলায় কিছু তর্কের অবকাশ থেকেও যায়। দৃষ্টিভঙ্গির সেই পার্থক্যকে মান্য করেই আপাতত আমরা তর্কেব থেকে মুখ ফিবিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে আসতে চাই। সুধীরবাবু জানাচ্ছেন—

> শ্রীচৈতন্যের বেলাতেও ঠিক এমনই হলো। ব্রাহ্মণরা যখন দেখলো চৈতন্যের বিপুল প্রভাব, বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক গ্রহণীয়তা, যখন সমাজের বণিক সম্প্রদায় ও বৈশ্যশূদ্ররা তাঁকে মানতে লাগলো, তখন ব্রাহ্মণ সমাজ চৈতন্যকে নিয়ে লিখতে লাগলো শাস্ত্রটীকা-ভাষ্যজীবনী প্রসঙ্গে। হিশেব নিলে দেখা যাবে এখন পর্যন্ত যত বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থটীকা ও পদ সংকলন হয়েছে তার পনেরো আনাই ব্রাহ্মণপ্রণীত। অবশ্য তাঁরা হিন্দু বৈষ্ণব নন তখন আর। 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এরকম পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে কোনো ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব-দীক্ষা নিতে গেলে নিতে হবে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের কাছে। শূদ্র বৈষ্ণবের অধিকার নেই ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের। নরহরি, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এ নিয়ম মানেন নি। অবশ্যই তাঁরা বিরল ব্যতিক্রম। একথা ঐতিহাসিক সত্য, মূল ধারা ছিল ব্রাহ্মণমুখী।...

এবং বিমানবিহারী মজুমদারের কথা অনুযায়ী 'শ্রীচৈতন্যের ৪৯০ জন প্রত্যক্ষ শিষ্যের মধ্যে ২৩৯ জন ছিল ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৈদ্য, ২৯ জন কায়স্থ, ২ জন মুসলমান, ১৬ জন স্ত্রীলোক আর ১১৭ জন শূদ্র'। তাছাড়া

> 'চৈতন্য সমকালে ও পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে অর্থাৎ ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে কোনো সংহতির সম্পর্কও ছিল না। ফলে যে যার মত কাজ করে গেছেন। জাতিভেদ প্রথা বিলোপের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নির্দেশও ছিল না।'

কিন্তু, এই পরিপ্রক্ষিতেই স্মরণীয় হয়ে ওঠে গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দেব কথা। এবং চৈতন্য-পরবর্তীকালে বিবদমান শাখা-উপশাখায় বিভক্ত নেতৃত্বের স্বার্থান্বেষী পারস্পারিক বিদ্বেষের প্রসঙ্গও। ভক্ত আর গৌরের মাঝে গুরুত্ব মধ্যস্থতাকে তো কোনোভাবেই সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না। দীক্ষাগুরু যিনি তিনিই শিক্ষাগুরু। সুতরাং 'হরিভক্তি'-ব জন্যও প্রয়োজন হল গুরুর মাধ্যম। নৈষ্ঠিক 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব'দের 'হরিভক্তি বিলাস' যেহেতু আপন স্বার্থকেই বড় করে দেখল, তাই শূদ্রের ভিন্ন পথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। অশিক্ষায়, অল্পশিক্ষায় সেইসব মধ্যস্থতাকরীদের কায়েমী স্বার্থের যূপকাঠে বলি হতে হল নিম্নবর্ণের মানুষজনকেও। 'পবকীয়াবাদ, মঞ্জরী সাধনা, কি চৈতন্যের গুহ্যসাধনার' যেসব ব্যাখ্যান দাঁড়াল তা একপ্রকার অজাচারেরই শামিল হল বলা যায়। জট পাকাল বেশ ভালমতোই। কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই জটটা কীভাবে পাকাল, সেটা বেশ ভালকরেই সুধীরবাবু বুঝিয়ে উঠতে পেরেছেন। চৈতন্য পরবর্তী যেসব গৌণ লোকধর্ম বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষজনের কাছে পান্থজনের সখা হয়ে দেখা দিল তাদের বেশির ভাগের মূলেই দেখা যায় একজন করে ধর্মপ্রবর্তকের উপস্থিতি। সেইসব ধর্মপ্রবর্তকদের নামানুসারেই এক একটি ধর্ম গড়ে উঠেছে। আর এইসব গৌণ লোকধর্মের, উচ্চবর্ণের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কাছ থেকে 'পাষণ্ড' অভিধাই জুটেছিল অবশেষে। এমনকি 'পাষণ্ডীদলন' জাতীয় গ্রন্থরচনায় উচ্চবর্ণেব ধিক্কারই যে ঘোষিত হয়েছিল, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে! যেভাবে নৈষ্ঠিক শরিয়তি ইসলামসমাজ লালনপন্থী ও অন্যান্য ফকির বা বাউলদের ধিক্কার জানিয়ে 'বেশরা' নামে অভিহিত করে আরেকদিকে, তেমনিই। আর 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' (১৯২৫)-ও যে 'পাষণ্ডী দলন'-এরই আরেকটা মুখ সেও কি আর বুঝতে বাকি থাকে!

দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেব কিছুটা আগে থেকেই উনবিংশ শতাব্দির উপান্ত্য পর্যন্ত কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী' এবং লালনশাহীর প্রবর্তকদেব আবির্ভাব ও কর্মজীবনের সূত্রে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় দিকেই, শ্রমজীবী নিম্নবর্ণের মানুষজন এইসব লৌকিক গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। আর এই কালপর্বেই এইসব লোকধর্মের প্রবর্তকদের সূত্রে তো বটেই, বিশ্বাসী ভক্তকুলের ভেতর থেকেও জেগে উঠতে থাকে অধ্যাত্মগীতির এক বিচিত্র ভাণ্ডার। সেসবের বিশ্লেষণেই সুধীর চক্রবর্তী মশায় একদিকে যেমন 'সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান' এবং 'বলাহাড়ি

সম্প্রদায় আর তাদের গান' গ্রন্থ দুটিতে এইসব মত ও পথের পথিকদের পরিচয় দিয়ে বেশ কিছু গানের সংকলন করেন। তেমনই আবার তাঁর সংগৃহীত এইসব গানের ভেতর থেকেই তিনি বুঝে নিতে চান এঁদের পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পৃক্ততা ও বিচ্ছিন্নতার দিকগুলোও। এঁদেরই পাশে লালনশাহী গানের রত্নখনি থেকে পাকা জহুরির মতোই বেছে বেছে তিনি বুঝে উঠতে চান এবং বুঝিয়ে দিতেও চান তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এঁদের বিচিত্র স্তরগুলোকেও। 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'-এ এই কাজ তিনি যেভাবে করেছেন, তা দেখলে বাস্তবিকই মনে না হয়ে পারে না, লালনকে নিয়ে যে তাঁর ভাবনা এবং কাজের বৃত্তটি সম্পূর্ণ করবার উদ্যোগে একেবারে শেষ পর্যায়ে লালনের সম্পর্কে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন, সেটি একদিক থেকে যেমন খুবই সময়ানুগ হয়েছে। তেমনই এক্ষেত্রে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা তো বটেই, উপরন্তু যতদূর সম্ভব একেবারে হাল আমলের তথ্যাদি যুক্ত করে এই গ্রন্থে তিনি বাঙালির এক নিজস্ব সাধক-কবিকে জনসমক্ষে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থিত করে আমাদের বহু অজ্ঞতাকেই দূর করতে প্রয়াসী হলেন। একাজে তিনি অকৃপণভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মুক্তবুদ্ধি গবেষকদের কৃতকর্ম থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন তো বটেই, আবার পশ্চিমবঙ্গের অনেকেরও। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' দুই বাংলার যুক্তকর্ম বললেও কিছু ভুল বলা হবে না। বাংলাদেশে লালনকে যেমন একদিকে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকেই মৌলবাদী ইসলামসমাজের একাংশ জবর দখল করতে চেয়েছে, লালন যা নন সেটাই তাঁর ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছে। তেমনই আবার আরেকদিকে, উদারপন্থী মুক্তবুদ্ধির মানুষজনের একাংশের পক্ষ থেকে স্বাধ্যায় গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিসন্দর্ভ পেশকারী গবেষক ছাত্র ও তাঁর অধ্যাপকের ভেতর আকচা-আকচির কথাও জানা যায়। লালনের জীবনী নিয়ে কলমি পুঁথির জাল-জুয়াচুরিটাও শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের হাতে কীভাবে যশমৃগয়ায় পর্যবসিত হতে পারে, সে-কাহিনীও জানা হয়ে যায়।

আর এই-গ্রন্থ পড়ার সময় স্পষ্টতই বুঝতে পারি—নাগরিক জীবনে কবি রবীন্দ্রনাথ যদি একদিকে বাংলা কবিতাকে মহিমান্বিত করে থাকেন, তবে আরেকদিকে গ্রামীণ জীবনে সাধক লালনও তাঁর গানের কথায় আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন কবিতায় উত্তুঙ্গ শিখর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাকে আপন অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে পুনর্নির্মাণে পরাঙ্মুখ হননি। কিন্তু আমাদের কাছে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে অন্য একটা বিষয়। অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলায় সাহেবধনী, কর্তাভজা, বলরামী এবং লালনশাহী ঘরের উদ্ভব ও প্রচারের বিষয়টি, গৌড়বঙ্গে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বে দীর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে স্বভাবতই মনে হয়, এইসব লৌকিক গৌণধর্মের বলয়ে, নিম্নবর্গের মানুষজনের ধর্মীয় পরিচয় খুঁজে পাওয়ার ভিতর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকাটাও নেহাত কম কিছু না। বরং বেশি করেই তা ছিল বলে, সমাজের অন্ত্যেবাসী মানুষজনের ধর্মীয় আত্মপরিচয় খোঁজার ক্ষেত্রে এইসব গৌণ লোকধর্মের প্রবর্তকদের ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকেই যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল। শিষ্য-প্রশিষ্য মিলিয়ে এইসব

লোকধর্মের বিস্তার বাংলার বিভিন্ন অংশে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সর্বত্রই সামাজিক শ্রেণীবিভেদে জর্জরিত আমাদের সমাজে এঁদের ভেতরকার একটা বড়ো অংশই একত্র হয়েছিলেন নিম্নবর্গের ভেতর থেকে। মোটামুটিভাবে আমরা যদি হিশেবটা আঠার শতকের চারের দশক কি পাঁচের দশক থেরে উনিশ শতকের শেষ অব্দিই ধরে নিই, তাহলে দেখতে পাব শ দেড়েক বছরের সময়পর্বে বা তার কিছু বেশি, সাহেবধনীদের চরণ পাল, কর্তাভজাদের রামশরণ পাল, লালনশাহীর লালন এবং বলরাম হাড়ির জীবন ও কর্ম-প্রবর্তনায় অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলাকে কেন্দ্র করেই এইসব লৌকিক গৌণধর্মের বিস্তার হয়েছিল।

লক্ষণীয় এও যে, কোনো-না-কোনোভাবে এইসব গৌণ লোকধর্মের প্রবর্তকরা সূচনায় কোনো উদাসীন বা কোনো ফকিরের সান্নিধ্যে আসেন। দীক্ষিত এবং শিক্ষিত হন সেই উদাসীনের মাধ্যমেই। যদিও সুধীর চক্রবর্তী মশায় জানিয়েছেন 'হাড়িয়াম সম্প্রদায়' বা 'বলাহাড়ি মত'-এর প্রবর্তনায় কোনো অজ্ঞাত উদাসীনের উপস্থিতি নেই। কিন্তু সাহেবধনী এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা হয়েছিল। আর, 'লালনশাহী ঘর কোনো গৌণধর্মী মতবাদ কি না' এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ যেমন একদিকে। তেমনিই লালনের রহস্যময় জীবনকাহিনীর সূত্রেই এ ব্যাপার নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন—আমরা কেউ কেউ অনুমান করলেও করতে পারি, সেরকম কোনো রহস্যময় উদাসীনের মধ্যস্থতা এবং কর্তাভজাদের মতো লালনশাহী ঘর কোনো গৌণধর্মী মতবাদ কিনা সে বিতর্কে যাবার প্রয়োজনও আপাতত নেই আমাদের। কিন্তু এটা অন্তত স্পষ্টভাবেই বলা যায়, এইসব গৌণ লোকধর্মের মর্মমূলে হিন্দু-মুসলমান বিচিত্র বিশ্বাসের বিভিন্ন সূত্র পাওয়া যায় যেমন। তেমনই আবার আসাম্প্রদায়িক মনোভাবে সর্বমানবীয় কল্যাণবোধের শিক্ষাও এঁরা ধারণ করেছিলেন। মানুষে-মানুষে যে ভেদাভেদের আঘাতে জর্জরিত হয়েছে নিম্নবর্গের সমাজ, তাঁদের ধর্মীয় আত্মপরিচয় যে উচ্চবর্ণের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ধ্বনিত হবে, সেটাই হয়ত এইসব গৌণ লোকধর্মের প্রবর্তনায় অনিবার্য ছিল।

সুধীরবাবু এঁদের ভেতরকার পারস্পরিক বিশ্বাসের বিচ্ছিন্নতা এবং ভাবের দিয়ে যেভাবে বুঝে উঠতে চেয়েছেন সে সমস্তই তাঁর গ্রন্থ চতুষ্টয়ে প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেছেন। এমনকী, কোন লোকধর্মে কতটা হিন্দু বিশ্বাসের এবং মুসলমান বিশ্বাসের তো বটেই, খ্রিস্টীয়· বিশ্বাসেরও ছায়াসম্পাত ঘটলেও ধর্মতত্ত্বগত তুলনামূলক বিচারে পার্থক্য এবং প্রতিবাদও কোথাও কীভাবে ঘটেছে সেসবও জানাবার চেষ্টা করেছেন। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সূত্রটি হয়ত কর্তাভজাদের ক্ষেত্রেই আসতে পারে। উনিশ শতকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারিদের ভেতর থেকে যেমন, তেমনই আবার নিষ্ঠাবান হিন্দুদের তরফ থেকেও কর্তাভজাদের সম্পর্কে কিছু আগ্রহ দেখা দেয়। কর্তাভজারাই বোধহয় বাংলার গ্রামীণ পরিমণ্ডল ছাড়াও শহর কলকাতায় বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন অপরাপর লোকধর্মগুলোর তুলনায়। যদিও বলাহাড়িদের সম্পর্কেও সোমপ্রকাশ পত্রে প্রতিবেদনে লেখা .হয়, তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলো ছাড়াও কলকাতাতেও নাকি তাদের শিষ্য আছে। জনশ্রুতি বা প্রবাদ-আশ্রিত যে তা, সেরকমভাবেই জানানো

হয়। আর লালনের গান তো 'বীণা-বাদিনী' পত্রিকায় ইন্দিরা দেবীর কৃত স্বরলিপিতে প্রকাশ পায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। অবশ্য 'ভারতী' পত্রিকায় তারও আগে ১৩০২ বঙ্গাব্দে সবলাদেবী চৌধুরানীর প্রবন্ধে লালনগীতির প্রকাশ করেছিলেন। সুধীরবাবু তাঁর ব্রাত্য লোকায়ত লালন'-এ এসব তথ্য যথাস্থানে জানিয়েছেন, পাঠকরা গ্রন্থপাঠেই তা জানবেন।

এতদিনে যাঁরা সুধীর চক্রবর্তী মশায়ের এইসব কাজকর্মের সন্ধান পেয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু পড়লেও বা অনেকে এ সম্পর্কে তত অবগত যদি এখনো না হয়ে থাকেন, তাহলে বর্তমান আলোচকের প্রস্তাব এই—'গভীব নির্জন পথে' গ্রন্থটি দিয়ে শুরু করুন পাঠ। গ্রন্থটি ডাবল ক্রাউন সাইজে প্রায় তিনশ পৃষ্ঠার। মোট ছটি অধ্যায় আছে এই গ্রন্থে, যথাক্রমে—মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে, 'পৃথক আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী', 'আপনঘরে পরের আমি', 'গৌরাঙ্গে র মর্ম লোকে বুঝিতে নারিলা', এবং 'গভীর নির্জন পথের উল্‌টো বাঁকে'। এই বইটির রচনারীতির বৈশিষ্ট্য তাঁর অপরাপর বইগুলোর চেয়ে একটু ভিন্নগোত্রের। এর ভিতর আখ্যানধর্মী কারণেও খানিকটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ার আমেজ পাবেন পাঠক। সারা বইটিতে পাঠক বাস্তবিকই বুঝে নেবেন সুলেখকের লিপি প্রবর্তনায় বহু তথ্য আর তত্ত্বকথাও সুপাচ্য হয়ে ওঠে কীভাবে। খাকিটা হ্যান্ডবুক গোছের বলায় যদি আপত্তি না ওঠে, তাহলে বলতেই পারা যায়, চক্রবর্তী মশায়ের কাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে অন্তত এই বই থেকে পাঠক প্রাথমিক ধারণায় যথেষ্ট লাভবান হবেন।

এরপর বিস্তৃতভাবে জানতে গেলে বাকি তিনটি বইয়ের মরণাপন্ন হতেই হবে। বর্তমান আলোচক যদিও এভাবে অগ্রসর হননি। 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান' দিয়েই আজ থেকে বছর ছ-সাতেক আগে চক্রবর্তী মশায়ের লোকায়তবর্গের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু ওয়াকিবহাল হতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। সাহেবধনীতে পাঠক পেয়ে যাবেন উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচয় ছাড়াও কর্তাভজাদের সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা। একশ ছাপান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী মূল পাঠ্যাংশ ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়-ক্রমগুলো এরকম—'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী', 'একটি বৃক্ষের দুটি শাখা', 'আমার নাম কুবির কবিদার', 'সেবার্থে পরমতত্ত্বে সেবাদাসী চাই', 'আমার দুঃখের কথা রইল গাঁথা', 'রূপে নয়ন ডুবল নারে'। এরপর মোট নব্বইটি সাহেবধনী গানের সংকলন করা হয়েছে ১৫৮ পৃষ্ঠা থেকে ২২৩ পৃষ্ঠা অব্দি। গানগুলোকেও অধ্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এরকমভাবে—'মানুষতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব মাটিতত্ত্ব সমন্বয়তত্ত্ব', 'আত্মজৈবনিক আত্মদৈন্য আত্মবোধ', 'দেহতত্ত্ব বৃত্তিচেতনা যৌন-অনুষঙ্গ', 'দেহতত্ত্ব বৃত্তিচেতনা যৌন-অনুষঙ্গ'। গানগুলোর দুজন রচয়িতা যথাক্রমে কুবির গোঁসাই এবং যাদুবিন্দু গোঁসাই। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এক চমৎকার পাঠ পাওয়া যায় এখানে। অধিকাংশক্ষেত্রেই অবশ্য লেখক সুধীর চক্রবর্তীকে তাঁর অপরাপর গ্রন্থে সেকাজ করতেই হয়েছে। না করে উপায়ও নেই। তাছাড়া, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই গৌণ লোকধর্মের অবস্থানকেও পাঠক গ্রন্থেই নানানভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বইটিতে অবিভক্ত বাংলার আঠার শতকে নদীয়া জেলার একটি মানচিত্র আছে। সেখানে বিভিন্ন গৌণ লোকধর্মের আঞ্চলিক ভিত্তি, পীঠস্থান চিহ্নিত। তাছাড়া কিছু

ফোটোগ্রাফও আছে। যাদের ভেতর কুবির গোঁসাইয়ের গানের এক অনুলিখিত প্রতিলিপি এবং যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও রয়েছে। 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান'-এও উক্ত মানচিত্র আছে এবং উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের ফোটোগ্রাফ এবং দুটি আশ্রমের ছবিও পাওয়া যায়। এই বইটিতে একশ বত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী মূল পাঠ্যাংশ। চারটি শীর্ষকে বিভক্ত। যথাক্রমে—'কলিকালে মেহেরপুরে পূর্ণমানুষ', 'কর স্থিতি ওহে পিতাপতি', 'হাড় হাড়ডি মণি মগজ' এবং 'জলের সুঁই পবনের সুতো'। মোট একাত্তরটি গান তারপর সংকলিত হয়েছে। গানগুলো বিভিন্ন রচয়িতার নামের শীর্ষক চিহ্নিত এবং আটটি গান অনামী রচনা হিসেবে। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের একটি গান 'আজ তোমার ঐ চরণে এ অধীনে রোখে গো হাড়িয়াম'-এর স্বরলিপিও দেওয়া আছে পরিশিষ্ট : ১-এর আগে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত মেহেরপুরে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায মেহেরপুর নদীয়া জেলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসময় বাংলার বিভিন্ন অংশে এই সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রশিষ্য ছড়িয়েও পড়েন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়ার নিশ্চিন্তপুরে, পুরুলিয়ার দৈকিয়ারিতে, বাঁকুড়ার শালুনি গ্রামে বলরামীদেব সন্ধান মেলে। সুধীরবাবু তাঁর সরেজমিন তথ্যসন্ধানে এখানকার কথা জানিয়েছেন পরিশিষ্ট : ১ অংশে। বলরাম হাড়ি যে তাঁর চৌকিদারি কর্মে থাকাকালীন মনিবদের সন্দেহে উৎপীড়িত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে, পরে আবার ফিরে এসে বেশ কয়েক বছর পর তাঁর প্রতিবাদী ধর্ম সংগঠন গড়ে তোলেন সে সম্পর্কে নানারকম কাহিনীর প্রতিপাদ্যগুলো পরিশিষ্ট : ২-এ সন্নিবেশ করেছেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বিরোধী এই ধর্মে দেখা যায় ইসলামি প্রভাব বা সংক্রমণ অপরাপর লৌকিক গৌণ ধর্মগুলোর তুলনায় খুবই গৌণ। বরং নাথযোগীদের প্রভাব এখানে বেশি। যাঁদের আমরা তপসিলভুক্ত বলে জানি, বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় বলরামী মতের ধারকবাহক বলতে তাঁদেরই একাংশ। সুধীরবাবু জানিয়েছেন —

> এখানে পুরাণ মানে লোকপুরাণ। আধ্যাত্মিক ক্ষমতার একটি নমুনা, যেমন আগে বলা হয়েচে, আউলেচাঁদ কমণ্ডলুতে গঙ্গা পুরে নিলেন। দৈহিক ক্ষমতার নমুনা, যেমন হাড়িরাম তিন পদক্ষেপে পৌঁছে যান নিশ্চিন্তপুর থেকে মেহেরপুর। এভাবেই নিম্নবর্গের মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করেন নিজেদের অচরিতার্থ স্বপ্ন। আধ্যাত্মিক দুঃসাহস তাঁদের প্রথা ও প্রচলনের বিরুদ্ধতা করার শক্তি দেয়। তাঁরা উচ্চবর্ণের মূর্তি পূজা মানেন না। হাড়িরাম সম্প্রদায়ের একজন পদকার নারায়ণ দাস একটা গানে প্রশ্ন তুলেছেন : 'ঘট পূজে কিসের কারণ?' অর্থাৎ সবরকম আনুষ্ঠানিক রিচ্যুয়ালেই এঁদের অনাস্থা। এমনকি হাড়িরামকে তাঁরা প্রতিদিন যে-নৈবেদ্য দেন তাও পাক-করা সন্দেশ বা অন্য মিষ্টান্ন নয়। তাঁরা হাড়িরামকে নিবেদন করেন চাল জল আর গুড়।
>
> আশ্চর্য হয়ে আর একটি জিনিস আমি আবিষ্কার করি হাড়িরাম সম্প্রদায়

> তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে যে রক্ষা-মন্ত্র পড়েন তা যেমন নিপাট বাংলায় লেখা তেমনই বেলতলার সেবাপূজা বা হাড়িরাম পূজার অন্য অনুষ্ঠানে উচ্চারিত মন্ত্রগুলি লেখা হয়েছে স্পষ্ট ও সহজ বাংলায়। এমন আর কোন গৌণধর্মে আমি দেখিনি। সেখানে একটু সংস্কৃত মিশাল বা অন্ত বৈষ্ণব বীজমন্ত্র ক্লিং শ্লিং, যাকে বলে কামবীজ ও কামগায়ত্রী, তা আছেই। হাড়িরাম সম্প্রদায় তাঁদের উপাস্যকে একই সঙ্গে স্রষ্টা ও সংহারক মনে কবেন, ('হেউৎ মউতের কর্তা'), আবার মনে করেন রক্ষাকর্তা।...
> এখানে উল্লেখ করা উচিত যে হাড়িরামের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের সম্পর্ক প্রধানত পিতা-পুত্রের। সেই জন্যই হাড় হাড়্ডি মণি মগজ ব'লে উপাস্যকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাড়িরামীব বিশ্বাস করে তাঁদের শবীরে পিতার দান হলো চারটি : হাড়, হাড়্ডি (মজ্জা), মণি (শুক্র), মগজ। কাজেই চারচিজ দিয়ে দেহ গঠন হয়েছে।....
> হাড়িরাম তাঁর উপাস্যের চোখে কখনও গড়নদার, কখনও কাবিগর, কখনও কর্তা। আবার অন্য চোখে কখনও গোঁসাই, কখনও অর্বুৎশশী (অর্থাৎ অর্বুদ সংখ্যক চাঁদের সমাহার), কখনও বাচক, কখনও বামদীন।—
> (বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান, পৃ. ৭৯-৮০)

পাঠকবা বইখানি পড়লে এসব ব্যাপারে বিস্তাবিতভাবেই অবগত হবেন। এবং সেইসঙ্গে এই সম্প্রদায়ের গানের নমুনাও চাক্ষুষ করতে পাববেন।

'সাহেবধনী সম্প্রদায : তাদের গান', 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান' এবং 'গভীর নির্জন পথে'-র পর যখন সুধীর চক্রবর্তী মশায় 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন'-এ উপস্থিত করলেন আমাদের, বাস্তবিকই তখন এই তিনশ আটাশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে মালুম হল—এতদিন তিনি যা কিছু সংগ্রহ ও লিখিত আকারে প্রকাশ করেছেন তাদেব আবও ভিন্নতরভাবে ব্যবহারে যেন নিজের কাজেব বৃত্তটি একদিকে সম্পূর্ণ করতে চাইছেন। তাঁব সরেজমিন তথ্যসন্ধানের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফসলকে বহুস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে, আগের কৃতকর্মগুলোরও একটা সারসংক্ষেপে, লালনের প্রাপ্য মর্যাদাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধায় আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন আত্মবিস্মৃতির করুণ-পরিণতিকেও। গৌণ লোকায়ত ধর্মের কাজকর্মে তাঁর এই গ্রন্থের বহুস্তর ব্যাপ্তি দেখে মনে হয় বুঝিবা এটিই তাঁর ম্যাগনাম ওপাস। শুধু লালনই নয়, তাঁর পাশাপাশি কাঙাল হরিনাথ, মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন প্রমুখকেও যেভাবে উপস্থিত করেছেন সেদিনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, তা বাস্তবিকই তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচায়ক তো বটেই, ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং প্রকৃত সন্ধানীর মানসিকতাকেই প্রকট করে।

মোট পাঁচটি অধ্যায়ে এই গ্রন্থের মূল পাঠ্যাংশ বিস্তার লাভ করেছে। 'উৎসের দিকে', 'দেশ, কাল ও পাত্র', 'যুক্তি ও প্রতিবাদ', 'নির্জন এককের গান?' এবং 'ছড়িয়ে গেল সবখানে' শীর্ষক অধ্যায়ক্রমের পর উল্লেখপঞ্জী।

তারপর পরিশিষ্ট : ১ অংশে মৌলবী আবদুল ওয়ালির পরিশিষ্ট : ১ অংশে মৌলবী

আবদুল ওয়ালির ১৮৯৮ সালে পঠিত একটি প্রবন্ধ (ইংরেজিতে), পরিশিষ্ট : ২ অংশে দুদ্দু শাহ রচিত লালজীবনী, পুঁথির পাণ্ডুলিপির নমুনা সমেত, পরিশিষ্ট : ৩ অংশে লালনের 'ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ/ কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে / তুমি হেলায় যা করো তাই করতে পারো /. তোমা বিনে পাপীতারণ কে রে' গানটির ইন্দিরা দেবীর কৃত স্বরলিপি, এবং পরিশিষ্ট : ৪ অংশে লালনের প্রত্যক্ষ শিষ্য মন্দিরদ্দিন শাহের জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত একটি দরখাস্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালন ফকিরের স্কেচ, মনিরদ্দিন শাহর দরখাস্তের অংশবিশেষের প্রতিলিপি এবং লালন জীবন-বিতর্ক সংশ্লিষ্ট মানচিত্রও মুদ্রিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শিল্পী সোমনাথ হোর-কৃত প্রচ্ছদপট, নামপত্র এবং অধ্যায়শীর্ষের চিত্রণ এই গ্রন্থের পক্ষে বাস্তবিকই উপযোগী হয়েছে।

মূল পাঠ্যাংশের শুরুতেই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি কিছুটা চমকে দেবার মতো বৈকী। কিন্তু চমকানি দিয়ে বাজার মাত করা যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং একটা বিন্দু থেকে পরতে পরতে এক সিন্দুকে মেলে ধরতেই তিনি চেয়েছিলেন তা বেশ মালুম হয়ে যায় পাঠ শুরুর কয়েক পৃষ্ঠার ভেতরই। বিস্তর তথ্য তিনি হাজির করেছেন বিতর্কিত লালন জীবনীকে কেন্দ্র করে তো বটেই। উপরন্তু, লালনের সমসাময়িকতাকে বহুস্তর ঐতিহাসিক ঘটনাঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের এবং মানসেতিহাসেরও একাংশের উদ্‌ঘাটনে অনেকান্ত মাত্রায় ভরে ফেলতে চেয়েছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বহু কিছু। তাছাড়া, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ তো আছেই। আছে লালনের গানের ইংরাজি অনুবাদ প্রসঙ্গও। আমাদের মতো উনমানুষদের পক্ষে তো বটেই, অনেক শিক্ষিত মানুষজনকেও তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' বিভিন্ন ভাবনায়, প্রশ্নে, কিছুবা বিতর্কে, উত্তেজনায় কিছুটা বিস্মিত করবে বৈকী।

লালনের মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্তিকে কেন্দ্র করে দু-পার বাংলাতেই নানান লেখালেখি, অনুষ্ঠান, আলোচনাসভার আয়োজন হয়ে গেছে আমরা জানি। সুধীরবাবুর লালন-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো ১৯৯১-এর অক্টোবর থেকে ১৯৯২-রে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। বেরনোর সময়ই অনেকেই কিছু কিছু পড়েও নিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থবদ্ধ অবস্থায় কিছু পরিমার্জনার দরুন তো বটেই, কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্ধনের কারণেও হয়ত সামগ্রিকভাবে যা দাঁড়িয়েছে, তার আস্বাদ স্বভাবতই একটু অন্যরকম। পত্রিকায় পড়া এবং গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন অধ্যায়ক্রমে বিভক্ত হয়ে লেখকের প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তিক্রমে অগ্রসর হওয়ার ভেতর পাঠকের দিক থেকে অন্তত ভিন্ন ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হয়ই। যদি অবশ্য এরকম কাজে লেখকের গ্রন্থ-প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার অবকাশে বিভিন্ন অদল-বদল ঘটে। যাইহোক, এটা অন্তত বুঝতেই পারা যায়, 'সাহেবধনী' আর 'বলাহাড়ি' গ্রন্থ হিশেবে যেমন কিছুটা একগোত্রের, 'গভীর নির্জন পথে' এবং 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' কখনোই পরস্পর একগোত্রের নয়। রচনারীতির বিভিন্নতার কারণেই 'লালন' বরং প্রথম দুটির কাছাকাছি। কিন্তু এখানে আরো বিস্তার এবং স্তরগুলোও বিচিত্র।

সুধীরবাবুর আগে যাঁরা এসব নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের লেখা কিছু কিছু আমরা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও পড়েছি। তবে বাংলাদেশে লালন-চর্চার পরিধি সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তীর বইখানা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় সেখানে নানান স্তরে কীরকম সব কাজ হয়েছে। দুই বাংলার এক সম্মিলন যেন ঘটেছে এই গ্রন্থে। অন্তত মানসিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে যে বাঙালির পরিচয়, দেশভাগ হলেও, বাঙালি হিশেবে একটাই, এটা অন্তত বেশ ভালমতোই এই পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থের প্রণেতা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দুই বাংলার মুক্তবুদ্ধি মানুষের বিবেক, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের স্বঘোষিত অভিভাবকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' থেকে অনেকটাই সমর্থন পাবে সহযোদ্ধার সহমর্মিতায়, একথা আমরা বলতেই পারি।

প্রতিক্ষণ
আগস্ট ১৯৯৩

ক. ৬. পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব

ক. ৬. ১. আলোচক : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

[একই সঙ্গে 'পঞ্চগ্রামের কড়চা' বইটিরও আলোচনা করা হয়েছে।]

গ্রামবাংলার জনজীবন এবং সংস্কৃতির প্রতি সুধীর চক্রবর্তীর আগ্রহ ও আসক্তি প্রবল। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে বিস্তর অজানা তথ্য যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনই জানা তথ্যগুলিকেও নতুনতর ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করেছেন। কোনও জিনিসকে ঠিকঠিক জানতে বা বুঝতে হলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দরকার এবং সেই তাঁর আছে, কেননা তিনি শহরবাসী এবং বিদ্বান। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুঁথিগত জ্ঞান গভীর। তার চেয়ে বড় কথা, দেখার চোখ তাঁর আছে। আর একটা বিশেষ কথা, তাঁর এই অন্বেষণস্পৃহা নিছক হবি নয়। দেশের তৃণমূলে আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রগুলিকে তিনি পুনরুদ্ধার করতে চান। সেইসঙ্গে আবিষ্কার করতে চান সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিক রূপান্তরের বিচিত্র চরিত্রকেও। তাই প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কাজ করে চলেছেন, তা ঐতিহাসিকেরই কাজ। 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব' বইটিতে শ্রীচক্রবর্তীর অন্বেষণের গভীরতা ও বিস্তৃতি বিস্ময়কর। তা ছাড়া এ ধরনের কাজে বরাবরই তাঁর নিজস্ব একটি কথনরীতি আছে, যা কথাবস্তুকে নীরস নৈর্ব্যক্তিক বিবরণীতে পরিণত করে না। তিনি বিষয়গত বাস্তবতাকে বাস্তব চরিত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ করেন। অর্থাৎ স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই বিষয়কে প্রাণবন্ত করে তোলেন, যাতে একই সঙ্গে কথাসাহিত্যের সাবলীল একটি মাত্রাও যুক্ত হয়। তাঁর গদ্যের প্রসাদগুণে এটা সম্ভব হয়েছে। আমার ধারণা, শ্রীচক্রবর্তী ইচ্ছা করলে কথাসাহিত্যেও খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। বিশেষ করে তাঁর 'পঞ্চগ্রামের কড়চা' পাঠকেরা আমার মতে সায় দেবেন।

প্রথম বইটিতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু ছোট-বড় মেলা ও ধর্মীয় উৎসবের কথা আছে। সূত্রপাতে 'মেলার চিত্র ও চালচিত্র' অধ্যায়ে শ্রীচক্রবর্তী ঠিকই লিছেছেন, 'মেলার চিত্র ও চালচিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে।' কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি 'ক্রমবর্ধমান জুয়ার ঠেক' উল্লেখ করে দিব্যজ্যোতি মজুমদারের যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে ও দেশের মেলার একটি চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে হাস্যকর অজ্ঞতা তো আছেই, উপরন্তু শ্রীমজুমদারের বক্তব্য বস্তুত কোনও লোকসংস্কৃতিবিদের নয়, এক গোঁড়া আগন্তুক নীতিবাগীশের নিছক মতামতে পর্যবসিত হয়েছে। জুয়া এ দেশে বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত। জুয়া খেলায় বউকেও বাজি ধরার কিংবদন্তি সর্বত্র শোনা যায়। মহাভারতে পাশা খেলার এপিসোডটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই বাহ্য। বাংলার মেলায় জুয়া চিরকালই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবাল্য দেখে আসছি, জুয়া খেলা ছাড়া মেলা জমে না। তা ছাড়া অধিকাংশ মেলায় উদ্যোগের শরিক হয় জুয়াড়িরা। লোকসমাগমের উদ্দেশ্যে বহু মেলায় জুয়াড়িরা নিজেদের টাকায় ঝুমুর, খেমটা কবিয়ালি, তরজা, কথকতা, কীর্তন, যাত্রা, আলকাপ, পঞ্চরস,

লেটো ইত্যাদি জনপ্রিয় গ্রামীণ সংস্কৃতির আসর বসায়। পঞ্চাশের দশকে আমি যুক্ত ছিলাম, তখন এমনও দেখেছি, পদ্মা-সীমান্ত অঞ্চলে জুয়াড়িরাই মেলার উদ্যোক্তা এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহি জেলা থেকে রাতের মেলায় দলে দলে লোকজন এসে জুয়ার আসরে ভিড় বাড়াচ্ছে। 'বর্ডার-পুলিশ/বর্ডার মিলিশিয়া' জেনেও না-জানার ভান করে থেকেছে। দৈবাৎ তাদের ক্যাম্পে উচ্চপদস্থ কেউ এসে গেলে তারা জুয়াড়িদের আভাস দিত এবং মেলায় হানা দেওয়ার ভঙ্গি করত। তৎকালীন কোনও-কোনও বর্ডার ক্যাম্পের লোকেরাও জুয়াড়িদের সাহায্যে মেলা বসাত। এতে সীমান্তপ্রহরীদের যেমন পকেট ভারী হত, তেমনই তাদের একঘেয়ে কর্মজীবনে যথেষ্ট আনন্দের বৈচিত্র্যও মিলত। এইসব বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আমি অনেক গল্প-উপন্যাসে লিখেছি। জুয়াড়িদের প্রতিনিধিরা বহুবার বিভিন্ন অঞ্চলে আমার আলকাপ দলকে বায়না দিয়ে যেত। দলের আসরপ্রতি 'বেতন-ও এ সব ক্ষেত্রে ছিল বেশ চড়া। বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। গ্রামবাংলার মেলায়, আমার বাল্য ও কৈশোরে দেখেছি জুয়ার পাশাপাশি বারবনিতাদেরও সমাবেশ ছিল মেলারই চিরাচরিত স্বাভাবিক অঙ্গ। এ কালে তো নিছক ব্লু ফিল্ম শো দেখানো হয়, যা শুধু ছবি! তিরিশ-চল্লিশের দশকে প্রকাশ্য আসরে বারবনিতাদের সঙ্গে মানুষজন 'পেলা' ধরার ছলে যা-সব করত, তা একেবারে পাশবিক লীলা! উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের বহু মেলায় আনা হত মল্লারপুরের ঝুমুর দলকে, যারা আসলে বারবনিতা। তারা অশালীন আদিরসাত্মক নাচগানে প্রলুব্ধ করত মেলার মানুষকে। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমাদের পাশের গ্রাম গোকর্ণে শ্যামচাঁদের মেলায় ঝুমুর দলের আসরে বাল্যে যে অশালীন দৃশ্য দেখেছি, তা এখনও চোখে ভাসে। কাটোয়া এলাকার দৈধা-বৈরাগীতলায় মাঘ মাসে বৈষ্ণবসাধক গোপাল দাস বাবাজির আবির্ভাবতিথিতে বিশাল মেলা বসে। সেই মেলাতে একই দৃশ্য দেখেছিলাম। এই মেলা নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্প লিখেছিলেন। 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তিনি মেলাটির সবিশেষ বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, 'মাঘ মাসের শীতের মধ্যে দৈধার মেলায় গাছতলায় বসে মেলা গল্পটি রচনা করেছিলাম। রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়িদের জুয়ায় উন্মত্ত মানুষদের লক্ষ করেছি পাপ পঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যাবাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ করেছি.....।' তাঁর কথায়, 'বিরাট মেলা। লক্ষ লোকের সমাগম। ...সন্ধ্যার সময় থেকে মেলার আর এক রূপ। ...সারিসারি সুদৃশ্য চাঁদোয়ার তলায় তক্তাপোশের উপর পরে জুয়ার আসর। পাঞ্জাবি, পাঠান, বাঙালি জুয়াড়িরা আসে দেশ-দেশান্তর থেকে। ...একেবারে শেষপ্রান্তে বেশ্যাপল্লী, সেখানে জ্বলে ওঠে আলো। রাত্রি বাড়ে, তাণ্ডব শুরু হয়।' (আমার সাহিত্যজীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৭১-৭২ পৃঃ) এ ছাড়া তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের ঝুমুর দলটিতে পুরনো বাংলার গ্রামীণ মানসিকতা ও রীতি-নীতি-প্রবণতার যে চিত্র আছে, তা-ও একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কবি উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনায় তারাশঙ্কর মেলা ও ঝুমুর দলের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীচক্রবর্তী মেলার চিত্র ও চালচিত্র সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা

তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। যাই হোক, একালের মেলায় জুয়ার ঠেক বাড়তেই পারে। কারণ লটারি নামক জুয়ার পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিদিনের প্ররোচক-প্রচারক যখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, তখন জুয়ার রমরমা বাড়বে বই কমবে না। তবু বলব, মেলার জুয়া ঐতিহ্যগত এবং মেলারই একটা অঙ্গ, যা না থাকলে প্রকৃত মেলাবসিক মেলার প্রকৃত স্বাদ পাবেন না। খোলা আকাশের নীচে যেন এক জাদুপুরী মানুষজনকে প্রকৃতির মতো স্বাধীনতাময় করে ফেলে। 'হেসেখেলে নাও, দু'দিন বই তো নয়'। এটাই মেলার মূল থিম। বারবনিতা বা ঝুমুর দলের অভাব যে-মেলায়, সেখানে ব্লু ফিল্ম অস্বাভাবিক কিছু নয় এ কালে। বরং বহু মেলায় ক্রমে বারবনিতাদের সমাবেশ যে স্বাধীনতা-উত্তর কালে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, এটাও একটা রূপান্তর এবং রুচি পরিবর্তনের লক্ষণ। নৈতিক বিচারে এটা সুলক্ষণ বলা চলে।

শ্রীচক্রবর্তী মেলার রূপান্তর তীক্ষ্ণদৃষ্টে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ রূপান্তর অনিবার্যই ছিল। আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত ও প্রায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে। লোকসংস্কৃতির বাস্তব আধার যে সব পালাপার্বণ ধর্মীয় উৎসব এবং মেলা তাদের পরিবর্তনের সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। আর, লোকসংস্কৃতি এমনিতেই গতিশীল। যেহেতু লোকসংস্কৃতি স্থাণু নয়, সতত গতিশীল। তবে সে-গতি কখনও মৃদু, কখনও দ্রুত। উত্তরোত্তর পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এ দেশে। প্রথমে মহানগর, তারপর নগর এবং গঞ্জ থেকে তা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে। তাই মেলায় টয়ট্রেন, যান্ত্রিক নাগরদোলা, চাইনিজ ফুড কিংবা জ্যাকেট-জিনিস পরা বাউল দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সব মেলাই আদ্যিকাল থেকে ধর্মকেন্দ্রিক জনসমাবেশ উপলক্ষে গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া ধর্মস্থানগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন রাজা-জমিদার। কোথাও বা বিত্তবান বণিক, কোথাও ধনী প্রতাপশালী ব্যক্তিবিশেষ। তবে বিগ্রহমাহাত্ম্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার মাহাত্ম্যের সম্পর্ক আছে। প্রতিষ্ঠাতার প্রচণ্ড প্রতাপ ও প্রভাব থাকলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেরও মাহাত্ম্য বাড়তে বাধ্য। মুসলিম পিরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষক বা সেই পিরের মাজারের (সমাধিভবন) প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্কও একই ধরনের। বাদশা-আমির-রাজা-জমিদার যে-পিরের অনুগামী, সেই পিরের রবরবাও প্রবল হতে বাধ্য।

অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের মেলা থেকে শ্রীচক্রবর্তী এই গ্রন্থে মেলাপরিক্রমা শুরু করেছেন। এই মেলার বিচিত্র জনসমাবেশ থেকে তিনি কিছু-কিছু ভক্ত মানুষের কথাবার্তা যুক্ত করেছেন। তাতে দেবতার মাহাত্ম্যের চেয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের সারল্য, অন্ধ বিশ্বাস এবং ভক্তিতে গড়া বহুমাত্রিক মনোজগতের সন্ধান মেলে। ধর্মকেন্দ্রিক বলেই মেলাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে প্রচুর কিংবদন্তি, অলৌকিক গল্পগাছা এবং হরেক মিথ। এগুলিকে যুক্তিসম্মত করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের তথ্যও জুড়ে দেওয়া হয়। সিরাজ-উদ্‌দৌলার গুপ্ত ধনভাণ্ডার, নবকৃষ্ণ দেব এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে শ্রীচক্রবর্তী গোপীনাথ-বিগ্রহ সম্পর্কে যে কাহিনী শুনিয়েছেন, সেটি অবশ্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এর প্রামাণিক সূত্রও তিনি নির্দেশ করেননি। কারণ শেষাবধি তিনি নিজেই এটি 'জনশ্রুতি' সাব্যস্ত করেছেন।

তবে নবকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের নাম জড়িয়ে গোপীনাথের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করেছেন। 'দেবতার লোকায়ন' ব্যাপারটা অবশ্য হিন্দুধর্মেরই ঐতিহ্যগত একটি প্রবণতা। শ্রীচক্রবর্তীর মুনশিয়ানা এখানেই যে, তিনি বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে এবং বিশেষ করে মরমি গীতিসমূহের সন্নিবেশে অগ্রদ্বীপের মেলাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আসলে এটি বৈষ্ণবদের মেলা। সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক বলয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব এখনও বিপুল এবং নিম্নবর্গীয় স্তরেও শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা তাঁর সমকালে কতখানি ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল, তা বোঝা যায়। সেই ভাবধারা এখনও বহমান। এদিক থেকে লক্ষ করলে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে 'নদীয়া ও বর্ধমানের সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে বহু পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয় গোপীনাথ', শ্রীচক্রবর্তীর এই কথাটি ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম গোপীনাথ। তাই গোপীনাথ নামটি বৃহত্তর বঙ্গে সর্বত্র প্রচলিত। বরিশাল জেলার এক গোপীনাথ, মুর্শিদাবাদের গোকর্ণে এক গোপীনাথ—এরকম অনেক গোপীনাথকে আমি চিনি। গোপী গ্রাম্য উচ্চারণে 'গুপী' হয়, তা ঠিক। উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গায়েন'-কে (এবং বাঘা বায়েন) ভুললে কী চলে! অগ্রদ্বীপের দেবতা গোপীনাথ বৃহত্তর বঙ্গের সব ব্যক্তি-গোপীনাথের নামের উৎস নন। প্রসঙ্গত এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীচক্রবর্তী 'বাউলফকিরদের শব্দগান'-এর উল্লেখ করেছেন। 'শব্দগান' আমার আবাল্য পরিচিত। কিন্তু শব্দটির অর্থ এবং উৎস খুঁজে পাইনি। অবশেষে ১৯৯১ সালের ১৩ অক্টোবর রাত ১১টায় দূরদর্শনে জলন্ধর কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। অনুষ্ঠানটি 'বাবা শাহ্ ফরিদ' নামক একজন বিখ্যাত সুফি সাধকের জন্মোৎসব উপলক্ষে চিত্রায়িত হয়েছিল। জলন্ধরের ফরিদপুরে এঁর মাজার আছে। বিচিত্র ঘটনা, শিখরা এই সাধকের একান্ত অনুগত ভক্ত। জাফরান (গৈরিক) আলখাল্লা ও পাগড়ি পরা শিখ এবং মুসলিমরা সেখানে একত্রে সমাগত। মুসলিমরা গাইছিলেন 'কাওয়ালি' (ধর্মসঙ্গীত) এবং শিখরা গাইছিলেন 'শবদ্ গীত'। ভাষ্যকারের মুখে শুনেছিলাম পঞ্জাবি ভাষায় 'শবদ্' অর্থ ভক্তিগীতি বা ধর্মসঙ্গীত। আমার নোটবইয়ে সবটাই নোট করা আছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিখ ধর্মের বহু টার্ম আরবি হওয়ায় 'শবদ্' শব্দটি আরবি থেকে আসতে পারে। কেননা ফকির-দরবেশরা ভক্তিগীতি গেয়ে থাকেন এবং 'শবদ্' বাংলা 'শব্দ'-গান হয়ে উঠতেই পারে।

'কার্তিকের লড়াই' নিয়ে শ্রীচক্রবর্তী বিস্তারিত আলোচনাসহ কয়েকটি গ্রামে এতৎ সংক্রান্ত উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন। কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিক পুজো সর্বত্র 'কার্তিকের লড়াই' নামেই প্রচলিত। মুর্শিদাবাদের গোকর্ণে কুম্ভকার সম্প্রদায় এই পুজো করেন, বাল্যাবধি দেখে আসছি। এঁদের পদবি 'পাল'। মনে পড়েছে, ময়ূরবাহন কার্তিক সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় বহু বছর আগে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি মূল্যবান ও প্রামাণিক তথ্য সংবলিত আলোচনা করেছিলেন। তাঁর আলোচনার প্রেক্ষাপট মধ্য এশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সারা ভারতে এই দেবতার জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। শ্রীচক্রবর্তী বিভিন্ন পৌরাণিক সূত্র, জনশ্রুতি, সুজিত চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতো বিদ্বান ব্যক্তিদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক সূত্র থেকে প্রামাণিক তথ্য নিষ্কাশন

যুক্তিসম্মত নয়। তবে কম্পারেটিভ মিথলজির আলোচনা অবশ্যই কিছু ঐতিহাসিক সূত্র জোগাতে পারে। একটা সাধারণ সত্য হল, কোনও দেবতার পুজোর প্রচলন করতেই সেই দেবতা সম্পর্কে মিথলজি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বহু বিশিষ্ট মিথলজিস্টের মনে, Mythology is functional'। যাই হোক, আমার কাছে সুজিত চৌধুরীর বক্তব্যের চেয়ে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য অধিক তথ্যসম্মত ও প্রামাণিক বলে মনে হয়েছে। সুপ্রাচীন যুগে মধ্য এশিয়ার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত অবধি এই দেবতাব দাপট ছিল। পরবর্তী যুগে ক্রমশ অন্যান্য দেবতার মতো ইনি সারা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। আর দেবতার মূর্তির রূপান্তর তো দেশকালভেদে স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষেব আর্থ-সামাজির পরিবর্তনের তালে তাল মিলিয়ে উপাস্য দেবতারও বিবর্তন ঘটতে থাকে। লক্ষ করলাম, শ্রীচক্রবর্তী কোথাও-কোথাও মিথলজি ও জনশ্রুতিকে ঐতিহসিক বাস্তবতার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। কাটোয়ার জনসমাজের তথাকথিত 'মিলিট্যান্ট অংশ' এবং 'বহুখ্যাত গঙ্গারাঢ় অঞ্চলের বাঙালি যোদ্ধা বলতে এখানকার মানুষদেরই বোঝাত' ইত্যাদি বক্তব্যে সহমত পোষণ করা কঠিন। যোদ্ধাদের বংশধররা কালক্রমে অ-যোদ্ধা হয়ে যায়। গ্রিকদের বর্ণিত জনপদ বা রাজ্যটি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়াব মতো প্রমাণ এখনও মেলেনি। কাটোয়ার কার্তিকপুজোর প্রবল জনপ্রিয়তা থেকে সেখানকার মানুষজনের পূর্বপুরুষ যোদ্ধা ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত মোটেও যুক্তিসহ নয়। তা হলেও বলব, শ্রীচক্রবর্তীর আলোচনা উপভোগ্য এবং বিদ্বান পাঠকদের মনে বহু প্রশ্ন তুলতে পারবে। কার্তিকের মতো বিচিত্র এবং রহস্যময় দেবতা এ দেশে আর নেই।

নদিয়া জেলায় নাকাশিপাড়ার কাছে ব্রহ্মাণীতলায় 'সাপের মেলা' অর্থাৎ মনসাপুজোর চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন শ্রীচক্রবর্তী। শ্রাবণসংক্রান্তিতে মেলাটি বসে। কিন্তু বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাপুজো উপলক্ষে সর্বত্র দেখেছি নিম্নবর্গীয় মানুষজনেরই আধিপত্য। ব্রাহ্মণীতলার মেলা প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী 'এ অঞ্চলের কবি-গীতিকার সৃষ্টিধর দাস চন্দ্রের পদ্যে লেখা কলমী পুঁথি'-র উল্লেখ করেছেন। অন্তত বছর পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেখা মেলাটির বর্ণনা। এতে মেলায় বারাঙ্গনাদের উপস্থিতির কথা আছে। আগেই বলেছি, জুয়া ও বারাঙ্গনা বহু প্রাচীন মেলার অঙ্গ ছিল। কিন্তু 'সৃষ্টিধর' আমাকে নাড়া দিয়েছেন। আমার বাল্যে 'ছিস্টিধর কবেল' অর্থাৎ সৃষ্টিধর কবিয়ালের নাম শুনেছি। তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তাঁর 'কবি' উপন্যাসের বাস্তব নায়ক সতীশের মুখে 'ছিস্টিধর' কবিয়ালের উল্লেখ আছে। আমি নিশ্চিত, উল্লিখিত লোককবি সৃষ্টিধরই আমার জানা প্রখ্যাত কবিয়াল সৃষ্টিধর।

শ্রীচক্রবর্তী 'রাসযাত্রা থেকে পটপূর্ণিমা: জনপদের ছন্দ' অধ্যায়ে শান্তিপুর এবং নবদ্বীপের রাস উৎসবের বিস্তারিত মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন। বৈষ্ণবদের রাসযাত্রা আর শাক্তদের রাসযাত্রা একটি জটিল সাংস্কৃতিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যার সমাধান হয়তো সহজ নয়। কারণ পৌরাণিক সূত্রের কথা তুললে পাল্লাটা বৈষ্ণবদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। আমার ধারণা, শাক্তদের রাসযাত্রা বৈষ্ণবদের তুলনায় অর্বাচীন এবং সম্ভবত নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগেই এর প্রচলন। এ ছাড়া শান্তিপুরের 'শ্যামচাঁদ'

প্রসঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি দুটি শ্যামচাঁদ পুজোর কথা মনে পড়িয়ে দিল—মুর্শিদাবাদের নগর গ্রাম এবং গোকর্ণ গ্রামে। দুটি স্থানেই পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন বেনে সম্প্রদায়। এখন সেই পুজো আর হয় না। তবে বেনে সম্প্রদায় ছিলেন বৈষ্ণব গুরুর দীক্ষাসূত্রে বৈষ্ণব। বাল্যে রাস উৎসব দেখেছি কান্দির রাজবাড়িতে। বৈষ্ণবদের আর এক উৎসব ঝুলন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে ঝুলন উপলক্ষে মেলা বসত জিয়াগঞ্জ শহরে। 'মদনমোহন' বিগ্রহও বাল্যে আমার গ্রামে দেখেছি। এখন নেই। শ্রীচক্রবর্তী একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বই থেকে। তাতে 'পাগলা' শব্দের পর ব্র্যাকেটে 'আউলিয়া' লেখা আছে। গোস্বামীরা 'পাগলা' হতে পারেন। আউলিয়া হবেন কী করে? 'আউলিযা' আরবি শব্দ। অর্থ : পবিত্র মানুষ, সাধুসন্ত। এই 'আউলিয়া শব্দটিরই অপভ্রংশ রূপ 'আউলে'। ইয়া প্রত্যয় এ হয়ে যায় বাংলা। সেই নিয়মের বশে আরবি আউলিয়ার আউলে দশাপ্রাপ্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলেচাঁদ যে মুসলিম সাধু ছিলেন, তাতে আমি নিঃসংশয়। বাঙালি দরবেশ-ফকিরদের নামের সঙ্গে চাঁদ যুক্ত করার প্রবণতা আছে। যেমন গোরাচাঁদ, মদনচাঁদ, ফকিরচাঁদ, নয়নচাঁদ। এঁরা মুসলিম।

কাগ্রামের জগদ্ধাত্রীপুজো প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী 'কেশরসমেত African Lion' লিখেছেন। তাঁকে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই, সিংহেরই কেশর থাকে। সিংহীর থাকে না। তা সে যে-দেশের হোক। কাজেই এ ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিতেও 'African Lion' শব্দটি নিরর্থক। আফ্রিকার সিংহ আকারে একটু বড় হয়, এই যা। কিন্তু সিংহ যে-দেশেরই হোক, কেশর থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার এই গ্রামটির নামের উৎসসন্ধানে এগিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে 'কঙ্কগ্রাম' আবিষ্কার (!) করা হয়েছে। তা হলে অজয়-কুনুর নদীর সঙ্গমে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের গ্রাম 'কোগ্রাম'-এর উৎস কী শব্দ? কাগ্রাম এবং কোগ্রামের মধ্যে দূরত্ব তত বেশি নয়, অন্তত পাখিওড়া পথে। আসলে বহু পুরনো শব্দের অর্থ আমরা ভুলে গেছি, শব্দটি ভাষা থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে বলেই। আমারই জীবদ্দশায় বহু গ্রাম্য শব্দ ক্রমশ বাতিল হয়ে যেতে দেখেছি। পরবর্তী প্রজন্ম সেইসব শব্দের অর্থ জানে না। উদ্ধৃতিতে একটা মস্ত ভুল, কাগ্রামের 'পশ্চিমে' ভাগীরথী নয়। নদীটির অবস্থান পূর্বে। কাগ্রামের পুলিশ স্টেশন 'ভরতপুর-শলার' বললে ভুল হবে। এ দুটি গ্রামের মধ্যে দূরত্ব আছে। পুলিশ স্টেশন ভরতপুর। উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ে 'একুশপাড়া' 'আঠারোপাড়া' এইসব বিশেষণ হল সমৃদ্ধ গ্রামের অলঙ্কার। কাগ্রামে 'পানপাড়া' দেখলাম। গোকর্ণেও 'পানপাড়া' আছে। এখানে 'পান' শব্দটির অর্থ কী, তা বলে দেওয়ার মতো লোকেরা কবে মরেহেজে গেছে। তবে 'পানপাড়া'-তে চাষি-সদ্গোপদের বসবাস দেখেছি। 'রাঢ়ে ছুতোররা মূর্তি গড়ে' এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। কারণ রাঢ় এক বিশাল ভূখণ্ড। কোথাও-কোথাও আমি কাগ্রামের মতো ব্রাহ্মণ মৃৎশিল্পী দেখেছি। তাঁরা প্রতিমা গড়েন। তবে শ্রীচক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ এবং সাবলীল গদ্যের আকর্ষণে কাগ্রামের জগদ্ধাত্রীপুজোর পটভূমিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বীরভূম জেলার পাথরচাপড়িতে 'দাতাপীরের মেলা'-সংক্রান্ত বিবরণে শ্রীচক্রবর্তী আমার কথা উল্লেখ করেছেন। একটু বিব্রত বোধ করছি। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আমার

যে-সব কথা হয়েছিল এবং তিনি যা লিখেছেন, তাতে গণ্ডগোল আছে। 'বিশ বছর আগে' ওখানে আমার যাওয়ার কথা নয়। তাঁর শোনার ভুল। তা ছাড়া 'মুর্শিদাবাদের মানুষ' বলেই ওখানে আমার যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে আমি দু'বার গেছি। এগারো-বারো বছর বয়সে একটি পুণ্যার্থী দলের সঙ্গে কান্দি থেকে পাঁয়ে হেঁটেই ময়ূরেশ্বর হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর যাই পঞ্চাশের দশকে আলকাপ দল নিয়ে বিনা আমন্ত্রণে। দু'বারই পাথরচাপড়ির মেলায় অবাঙালি ফকিরদের কাওয়ালির আসর, বাঙলা মুসলিমদের 'একদিল পীরের গান'-এর আসর এবং ফকিরি মারফতি গানের আসরও দেখেছি। তখন মাইক্রোফোন বস্তুটি ছিল না। তবে অসংখ্য রোগী, প্রতিবন্ধী, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তদের দেখেছি। সব ধর্মের তীর্থেই এদের দেখা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া জুয়ার আসর দেখেছি পাথরচাপড়িতে। প্রথমবার গিয়ে মেলার শেষপ্রান্তে বারাঙ্গনাদের ঝোপড়িও দেখেছি। সেগুলি খড় বা তালপাতার ছিল, এটুকু মনে আছে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ১৯৪১ কিংবা ১৯৪২ সাল। এর প্রায় দশ বছর পরে গিয়ে মেলার প্রাণবন্ত পরিবেশই দেখেছিলাম। যাই হোক, শ্রীচক্রবর্তীর কাছে পাথরচাপড়ির অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ হয়নি। না হওয়ারই কথা। কারণ সময় বদলে গেছে। তা ছাড়া বোঝা যায়, অন্যান্য পিরের মেলায় মতোই ওখানে আর্থিক-রাজনৈতিক অভিসন্ধি বেশি মাত্রায় প্রকট হয়েছে। আজমিরের খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির মাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাদিম বা সেবায়েতরা ফি বছর আমার কাছে দুটি করে মানি অর্ডার ফর্ম পাঠান। অথচ জীবনে আমি আজমির যাইনি। পিরতন্ত্রে আমার আস্থাও নেই। দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে সত্তরের দশকে সস্ত্রীক কৌতূহলবশত গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। হিন্দু তীর্থে পাণ্ডাদের জুলুমের কথা জানা ছিল। মুসলিম পিরের মাজারে মুসলিম পাণ্ডাদের জুলুম দেখে হতবাক হয়েছিলাম। শ্রীচক্রবর্তী 'সেখ সৌকত আলম' নামে এক 'বিশুদ্ধ বামপন্থী' স্কুল শিক্ষকের কাছে লিখেছেন। এই চরিত্রটির কথাবার্তা আমার কাছে অদ্ভুত খাপছাড়া মান হয়েছে। সৌকত (শওকত) সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তী কেন বিরূপ, তা বোঝা গেল না। একালে আশরাফ-আতরাফ নিয়ে কোনও মুসলিমই মাথা ঘামান বলে মনে হয় না। শিক্ষকটি সম্ভবত 'আহ্‌লে হাদিস' বা ফারাজি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায় পিরবিশ্বাসী নন। চরিত্রটির মুখে যে-সব শব্দ বসানো হয়েছে, তা ঈষৎ বিকৃত এবং কোনও শিক্ষিত মুসলিম ওইভাবে শব্দগুলি উচ্চারণ করবেন না। বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম শিক্ষক 'বেওকুফ জেনানা' বলবেন না, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে। 'আরজল' (আরজাল) শব্দটি কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। 'সেখ সৈয়দ মোঘল পাঠান' এ কালে কারও মুখে শুনতে অদ্ভুত লাগে। তা ছাড়া এই শব্দবন্ধ অতীতে হিন্দুদেরই গড়া। মুসলিমদের মধ্যে বস্তুত এরকম কোনও বিভাজন নেই। এগুলির মধ্যে 'মোঘল' (মোগল) ছাড়া বাকি তিনটি নিছক পদবি। শুধু সৈয়দ (সাইঈদ)-রা নিজেদের পয়গম্বরকন্যা ফাতিমা ও তাঁর স্বামী আলির বংশধর বলে দাবি করেন। আবার সৈয়দ অপভ্রংশে ছৈয়দ, নাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। শিক্ষিত জনেরা অন্য অপভ্রংশ সয়ীদ/সঈদ নাম রাখেন। অর্থ একই : 'নেতা'। সেখ/শেখ (শাইখ্) আরব বংশোদ্ভূত হবেন এর মানে নেই। সাউদি আরব অঞ্চলে অসংখ্য কালো আরবও আছেন। তাঁরা অতীতের আফ্রিকীয় দাসবংশধর। আবার রক্তের সংমিশ্রণ ঘটায় নিগ্রোয়েড গঠন

বদলে গেছে। কিন্তু গায়ের রঙ কালো বা বাদামি। বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। চরিত্রটি শ্রীচক্রবর্তীর অবশ্যই দেখা। কিন্তু তাঁর কথাবার্তা লেখার সময় সম্ভবত বিস্মৃত বা বিভ্রান্তিবশে তিনি অবিশ্বাস্য করে ফেলেছেন। পিররা আসলে সুফি সাধক। কাজেই প্রতিষ্ঠানিক ইসলাম অর্থাৎ ইসলামি চার্চ তাঁদের স্বীকার করে না। সুফিবাদ ইসলামি চার্চবিরোধী তত্ত্ব। কাজেই এ দেশেব বহু মুসলিম পিরতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী মনে করেন। মাওলানা 'আক্রাম (আকরাম) খাঁ-র লেখা 'মোছলেম (মুসলিম) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের যে উদ্ধৃতি শ্রীচক্রবর্তী দিয়েছেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে সত্য আছে। তিনি ছিলেন আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়ভুক্ত (তাঁর লিখিত পয়গম্বরজীবনী 'মোস্তফাচরিত' পড়লে বোঝা যায় তিনি যুক্তিবাদী মুসলিম এবং অলৌকিকে অবিশ্বাসী)। তাই হিন্দু-মুসলিম ধর্মসমন্বয়ের বিরুদ্ধে তিনি সরব ছিলেন, যদিও তাঁর মালিকানাধীন 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় হিন্দু লেখকদেব লেখা ছাপা হত। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে আকরাম খাঁর বক্তব্য ইতিহাসসম্মত নয়। জলদেবতা বরুণ পির বদবে পরিণত হননি। তিনি বহু কল্পিত পিরের কথা বলেছেন। 'বদর' একেবাবে কল্পিত না হলেও আরবি শব্দ বদর (অর্থ : তাড়াতাড়ি করা) থেকে সাধারণ মানুষের ভ্রম ও অজ্ঞতাজনিত একটি সৃষ্টি। আসলে মধ্যযুগে মুসলিম মাঝি-মাল্লারা (মাল্লা আরবি শব্দ। অর্থ : নৌকাচালক) বিপদসঙ্কুল নৌযাত্রায় 'পাঁচ পির বদব বদর!' ধ্বনি দিতেন। অর্থাৎ 'পাঁচ পিবের দোহাই, তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!' এই বদর শব্দটির অর্থ কালক্রমে ভুলে যাওয়ার ফলেই 'বদর' নামে এক পিরের সৃষ্টি হয় জনমনে। বৃহত্তর বঙ্গের নদীবহুল দক্ষিণ অঞ্চলে এবং বঙ্গোপসাগরে অজ্ঞতাজনিত ভ্রমে বদরপিরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়। এ বঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে বদর পির 'বদরগাজি' হয়ে ওঠে। কোথাও 'গাজি গাজি' ধ্বনি তোলেন মাল্লারা। অদ্ভুত ব্যাপার, পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলিমরা চট্টগ্রামে একাধিক বদর পিবের অস্তিত্ব ও দরগা আবিষ্কার করেছেন। কারও নাম বদর শাহ, কারও নাম বদর-ই-আলম (ডঃ আব্দুল করিমের 'চট্টগ্রামে ইসলাম', ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক : 'পীর বদর', দৈনিক পাঞ্চজন্য, চট্টগ্রাম, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৩২, আব্দুল হক চৌধুরী : 'প্রবন্ধ বিচিত্রা : ইতিহাস ও সাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫)। প্রকৃতপক্ষে এটা এক সমাপতন। কারণ 'পাঁচ পির বদর! বদর!' স্লোগানটিতেই বোঝা যায়, এই বদর চট্টগ্রামের বদর পির নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই। উভয় বঙ্গের বহু স্থানে মাদার পিরের মাজার দেখা যায়। কান্দি মহকুমা অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ রবিবারে একসময় 'মাদারের বিয়ে' অনুষ্ঠানও পালিত হত। আসলে 'মাদার পির'-ও এক দিক থেকে কল্পিত পির। ঘটনা হল, ভ্রাম্যমাণ (মাদারিয়া/মাদারি) ফকিররা একসময় দল বেঁধে গ্রামে-গ্রামে প্রায় হানা দিয়ে ভিক্ষা আদায় করতেন। বাল্যে এঁদের দেখেছি। এই 'মাদারিয়া' ফকিরদের দলছুট কোনও ফকির কোথাও সুযোগ পেলে স্থায়ী ডেরা বাঁধতেন কখনও তাঁদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ফেলে রেখে দলটি চলে যেত। এই ফকিরদের মৃত্যুর পর তাঁদের কবর নিম্নবর্গীয় মুসলিমদের কাছে পুণ্যস্থান বলে গণ্য হত। আমাদের গ্রামেও এরূপ একটি কবর 'মাদার পিরের থান' হয়ে উঠেছিল। প্রথামতো সেই থানের জায়গা যার, সে-ই হয়ে উঠত খাদিম বা সেবায়েত।

আমাদের গ্রামের থানটি এখন লুপ্ত এবং খাদিম পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। বাল্যে সেই থানে খুদে পোড়ামাটির ঘোড়া ও সিন্নি মানত দিতে দেখেছি। যাই হক, এই দৃষ্টান্ত থেকে কল্পিত পিরের ব্যাপারটা আশা করি স্পষ্ট হবে। তবে বোঝা যায়, আকরাম খাঁব মনে পড়েনি প্রখ্যাত জলবাসী পির খিজিবের কথা। খাজা খিজির (আরবিতে খিদ্‌র্ > খিদিব, অর্থ : সবুজ মানুষ) মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং আরবব্যাপী সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপাস্য পির। Comparative Mythology আধুনিক যুগে নানা দেশের জলদেবতার মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। শ্রীচক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে জলবাসী পির খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভেলাভাসানো 'বেরা' উৎসবের উল্লেখ করেছেন। মুর্শিদাবাদের শিয়া নবাবরা কলকাতাতেও গঙ্গা (হুগলি) নদীতে উৎসবটি পালন করতেন (ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ডের ২৪৬-২৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।) মওলানা আকরাম খাঁ-কথিত 'গোরাচাঁদ' পিরের নামেই গোরাচাঁদ রোড, যেখানে আমার বর্তমান বসবাস। এই পিরের সঠিক মাজার কোনটি এবং কোথায়, তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর মুসলিম নামটি জানা যায় না। মোবারক করিম জওহর 'ভারতের সুফী' গ্রন্থে (করুণা প্রকাশনী) এঁর প্রকৃত নাম ও কলকাতার বাইরে তাঁর সমাধিস্থানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা বিতর্কসাপেক্ষ। কারণ আমি দেখেছি এই পিরের উরস উপলক্ষে গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়িধারী ফকিরদের ফেস্টুনসহ শোভাযাত্রা গোরাচাঁদ রোডে। শ্রীচক্রবর্তীকে ঘটনাটি একটি চিঠিতে জানিয়েছিলাম, তাঁব মনে পড়তে পারে। প্রযাত সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লার কাছে শুনেছি, গোরাচাঁদ রোডের ধারে একটি পুকুরপাড়ে অবস্থিত মওলানা আজাদ কলেজেব মাঠে, বর্তমান ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের পশ্চিমে একসময় গোরাচাঁদ পিরের 'উরস' বা মৃত্যুদিবসে মেলা বসত।

শ্রীচক্রবর্তী শিক্ষক সৌকতের মুখে 'বেশক বেশক'! বসিয়েছেন, এটা অদ্ভুত। শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম কেন, শিক্ষিত উর্দুভাষীও এই চোস্ত্ শব্দটি ব্যবহার করেন না। 'ঠিক হ্যায়' বা 'সহিবাত' বলেন। 'বেশক্' অভারতীয় মুসলিম বা অতি সম্ভ্রান্ত জনের মুখে আসতে পারে। তবে এটি কথ্য শব্দও নয়। তা ছাড়া 'অলি' (উয়ালি, Wali আরবি শব্দ) শব্দেব অর্থ 'বন্ধু বা সাধক' নয়। শব্দটির অর্থ গর্ভনর/শাসক। শব্দটি নিছক নাম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। অল্পশিক্ষিত বা সাধারণ মুসলিম 'ওলি-আউলিয়া' বলেন বিভ্রান্তি বা অজ্ঞাতবশে। লিটল ম্যাগাজিন 'অচিন পাখি'-তে 'দাতাবাবা' একই অজ্ঞতাজনিত কয়েনেজ। 'দাতাসাহেব'-ও-তা-ই। আসলে তুর্কিশব্দ 'দাদা' আক্ষরিক অর্থে পিতামহ। অর্থবিস্তারে 'সম্মানিত জন'। শব্দটি ব্যক্তিনাম হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের পারস্যে সাফাবি সম্রাট শাহ্ ইসলামের অধীনে মধ্য এশিয়ার বারোটি যাযাবর তুর্কি যোদ্ধা ট্রাইবের নেতারা সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এঁরা 'কিজিল বাশ' (লাল মাথা) নামে ইতিহাসে পরিচিত। এঁদের একজনের নাম ছিল 'দাদা বেগ তালিশ'। আর একজনের নাম 'বাবা আলি।' তুর্কি 'বাবা' শব্দের অর্থ পিতা। কিন্তু শব্দটি নাম হিসাবেও ব্যবহৃত ছিল। অর্থবিস্তারে বাবাও 'সম্মানিত জন'। কোনও-কোনও পিরকে 'দাদা' বলা হত। মুর্শিদাবাদের নগর গ্রামে আমার মাতুলালয়। সেখানেও একজন 'দাদা

পির' ছিলেন। তাঁর উরস উপলক্ষে পৌষমাসব্যাপী বিশাল মেলা বসে। মেলাটি 'দাদা পিরের মেলা' নামে পরিচিত। হিন্দুরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দাদা' বলেন। মুসলিমরা পিতামহকে সঠিক অর্থে 'দাদা' বলেন। তবে অপভ্রংশ প্রয়োগও আছে। হিন্দুরা অজ্ঞাতবশত দাদা পিরকে 'দাতা পির' বলেন। মুসলিমরাও পাথরচাপড়ির 'দাদা পির'-কে একই অজ্ঞাতবশত 'দাদাসাহেব' বা ফেস্টুনে 'হজরত দাতা মেহবুব ওলি' লেখেন। হাস্যকর ভুল। লেখা উচিত 'দাদাসাহেব' এবং 'হজরত মাহ্‌বুব ওয়ালি শাহ্'। আরবি 'হজরত' শব্দের তুর্কি 'দাদা' প্রয়োগ অতিকথনদুষ্ট। তাঁর মাজারের লিপি আমি দেখিনি। আর যে শব্দই থাক্, ওতে 'দাতা' শব্দ থাকা অকল্পনীয়। শ্রীচক্রবর্তী নিশ্চয় এই পিরের মাজার শরিফে বাংলায় 'হজরত দাতা মহবুব শাহ্ ওলি' (১৫২ পৃঃ) দেখেছেন। কথা না বাড়িয়ে বলি ওটা অশুদ্ধ। সুফিসাধকরা আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট পরিচয় দিতে নামের শেষে শাহ্ (ফার্সি শব্দ, অর্থ: সম্রাট) লেখেন। হিন্দু সাধুসন্তের 'মহারাজ' শব্দ প্রয়োগ সম্ভবত তারই অনুসরন। জনৈক লিয়াকত আলির যে বক্তব্য শ্রীচক্রবর্তী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বিভ্রান্তি আছে। 'সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলমেলা' আর পিরের মেলার তুলনা চলে না। আলু ও আলুবোখরা এক জিনিস নয়। তবে আগেই বলেছি, পাথরচাপড়ির দাদা পিরের মেলায় পঞ্চাশের দশকে বিবিধ গানের আসর বসত। যেমন বসত নগর গ্রামের দাদা পিরের মেলায়। সম্ভবত কোনও স্থানীয় স্বার্থ এ দুটি মেলাতেই আর লোকসঙ্গীতের আসর বসতে দেয় না। তার চেয়ে বড় কথা, সব পিরের মেলাই ভক্তদের সিন্নিমানতের মেলা। বহু বছর ধরে দেখেছি, গোরাচাঁদ রোডের পাশে একটি মাজারের কাওয়ালি গানের আসর বসত। এখন আর বসে না। নির্দ্বিধায় বলছি, সর্বত্র পিরের মেলায় আর্থিক স্বার্থই মুখ্য।

শ্রীচক্রবর্তী ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মেলা এবং কেঁদুলিতে জয়দেব মেলার বিবরণ বিস্তারিত লিখেছেন। এ দুটি মেলা বহু আলোচিত। কেঁদুলির মেলা সম্পর্কে আমার বক্তব্য, ওটি একান্তভাবে ছিল বৈষ্ণবদের মেলা। রবীন্দ্রনাথের বাউলপ্রীতির প্রভাবেই মেলাটি 'বাউলমেলা'-তে পরিণত হয়েছিল। বৈষ্ণব এবং বাউল এক নয়। প্রকৃত বাউল অধুনা বিলুপ্ত। শ্রীচক্রবর্তী ভালই জানেন, প্রকৃত বাউল-বলয় ছিল কুষ্টিয়া-নদীয়া-মুর্শিদাবাদব্যাপী। বীরভূমের নবনী দাসের পুত্র পূর্ণ দাসের 'বাউলখ্যাতি' বীরভূমকে বাউলদের জেলায় পরিণত করেছে। তিনি ঠিকই লিখেছেন, 'বর্ধমান-বীরভূমের বাউল বলতে যাদের বোঝায়, তাদের সঙ্গে নদে-মুর্শিদাবাদের বাউলদের বেশ তফাত চোখে পড়েছে।' বিশেষ করে কেঁদুলিতে তথাকথিত বাউলমেলা 'হয়ে উঠেছে কীর্তনের মেলা', এ উৎসে প্রত্যাবর্তন। আমি সত্তরের দশকে সরেজমিন খতিয়ে আঁচ করেছিলাম, আদিতে মেলাটি ছিল কীর্তনিয়া বৈষ্ণবদের। তাঁরা জাতবৈষ্ণবই ছিলেন। শ্রীচক্রবর্তীর এ অনুমান যথার্থ। কেঁদুলির মন্দিরটিও তত পুরোনো নয়। অন্তত জয়দেবের সময়ের নয়। নিম্নবর্গীয় বৈষ্ণবদের বৈরাগী বলা হয়। 'বোরেগি-বোষ্টম' কথাটি সুপ্রচলিত। দৈধা-বৈরাগীতলার মেলাটি এই বোরেগি-বোষ্টমদেরই মেলা। তা হলে বাউল কার? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। এডোয়ার্ড ডিমক 'The Sound of Silent Guns and other Essays গ্রন্থে (অক্সফোর্ড

ইউনিভার্সিটি প্রেস) 'বাউল' শব্দের আরবি বুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। তবে সে-আলোচনাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক। 'খৃষ্টিয়' (খ্রিস্টীয়) মেলার বিবরণটি অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে, তাতে তথ্যপ্রমাদ আছে। যিশু চার্চ পত্তন করতে চাননি এবং করেনওনি। গোড়ার দিকে যিশুভক্তরা ইহুদি ধর্মেরই একটি শাখারূপে গণ্য ছিলেন। তারসুস্‌বাসী গ্রিক পণ্ডিত পোল (সেন্ট পল) প্রকৃতপক্ষে ইহুদি ধর্ম থেকে যিশুপন্থীদের পৃথক করেন এবং তিনিই চার্চের আদি রূপকার। যিশুর বিত্তশালী শিষ্য পিটারও পৃথকভাবে এ কাজে হাত লাগান। 'নীসার ধর্মসভা' বললে ভুল হবে। প্রথম ধর্মসভার উদ্যোক্তা রোমান সম্রাট কনস্তান্তাইন, তা ঠিক। তবে স্থানটির নাম নিসিয়া। এটি কৃষ্ণসাগরতীরে অবস্থিত। নিসিয়া বন্দরনগরীর খ্রিস্টীয় পরিষদই বিতর্কসভা পরিচালনা করেন। যিশুর ঐশী সত্তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। আরিয়ুস প্রেসবাইটার ছিলেন এর বিরোধীপক্ষ। তাঁর বক্তব্য ছিল যিশু ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষ মাত্র। বিতর্কে হেরে যান আরিয়ুস। কিন্তু তাঁর অনুগামীরা 'প্রেসবাইটারীয় চার্চ' গঠন করেন। রাজা রামমোহন রায় সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এই চার্চের উল্লেখ আছে। বিতর্কে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ আথানাসিউস ছিলেন প্রথম পক্ষ। তাঁর তত্ত্বটির নাম ছিল 'Homousios'-গ্রিক শব্দ এবং অর্থ: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা একই সত্তা। আরিয়ুসের তত্ত্বের নাম 'Homoiousios'। এই শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত তত্ত্বের বিপরীত। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সভাটি হয়েছিল। এ সেই নিসিয়া, যার উল্লেখ কবি এডগার অ্যালেন পো-রচিত 'টু হেলেন' কবিতায় আছে। শ্রীচক্রবর্তী খ্রিস্টধর্মের প্রধান ভাঙন বা 'The Great Schism'-এর উল্লেখ করলে চিত্রটি স্পষ্ট হত। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাতিন চার্চ এবং গ্রিক চার্চ পৃথক হয়ে যায়। সেই শুরু। সে যা-ই হক, চাপড়ার খ্রিস্টীয় মেলা উপলক্ষে খ্রিস্টকীর্তনের বিবরণ শ্রীচক্রবর্তী অনবদ্য ভঙ্গিতেই উপস্থাপিত করেছেন। এটা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিনব সংযোজন। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁকে অভিনন্দন। লোকসংস্কৃতিতে এ দেশের খ্রিস্টানদের অবদান বিষয়ে শ্রীচক্রবর্তী দরজা খুলে দিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রামাঞ্চলে বিবিধ পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা সুগম হওয়ার দরুন মেলার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস বা মেলা উঠে যাওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, তা অমূলক। কলকাতা বা অনান্য বড় শহরে ক্রমে মেলার জাঁকজমক বৃদ্ধির কারণ খুঁজলেই উত্তর মেলে। মেলায় কেনার একটা ভিন্ন স্বাদ আছে। অন্য ধরনের তৃপ্তি আছে। মেলা জাদুপুরীর মতো মোহজাল ছড়ায় জনমানসে। কলকাতায় বইমেলা, শাড়ির মেলা, শিল্পমেলা—কত রকমের মেলা শুরু হয়েছে। জনসমাগম, কেনাকাটা তো ভালই হয়। গ্রামের মেলা গ্রামীণদের কাছে আনন্দোৎসব। তা ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় হাতাখুন্তি থেকে কপাট-চৌকাঠ-তক্তপোশ, কৃষিসরঞ্জাম, সব কিছু গৃহস্থের হাতের কাছে পৌঁছে যায়। বছরের কেনাকাটা লোকে সেখানেই সেরে নেয়। কোনও মেলা উঠে যাওয়ার পিছনে অন্য কারণ থাকে। এ কালে 'মেলা কমিটি' গড়ে ওঠার ফলে মেলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকার সুযোগ পেয়েছে এবং রূপান্তর ঘটলেও মেলার মূল চরিত্র বজায় আছে। আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। মেলা এখনও মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। স্বপ্নাচ্ছন্ন করে। সমাজের সর্বস্তরে একটা আশ্চর্য আনন্দের শিহরন ঘটে যায়। এ সব কথা আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আমি

আবাল্য এক মেলাচর মানুষ।

শ্রীচক্রবর্তীর 'পঞ্চগ্রামের কড়চা' একটি অভিনব সংকলন। ইতিমধ্যে এই গ্রন্থটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংহদাস স্মৃতি পুরস্কারে সম্মনিত হয়েছে। এটিকে ফিচারধর্মী রচনা সংকলন বলব, নাকি বাস্তব জীবনভিত্তিক রম্য নিবন্ধ বলব, ঠিক করা কঠিন। এতে কাহিনীর অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনায়াস বয়ান আছে। ইংরাজিতে 'Real Life Drama' নামে একধরনের কাহিনী আছে। রচনাগুলি সেই ধাঁচেরই। অথচ আঙ্গিকে গল্পের কাঠামো। কোনও-কোনওটি নিখুঁত ছোট গল্পের বিন্যাসকে ছুঁয়েছে শিল্পমাত্রা সহযোগে। অথচ রচনাগুলি সবই শ্রীচক্রবর্তীর জীবন ও অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক বলয়ে পরিচিত্রিত এ কালের বিচিত্র মানুষজনের জীবনের বাস্তবতা। নিপুণ কথাশিল্পীর মেজাজেই শ্রীচক্রবর্তী তাঁর স্বভাবজাত পরিক্রমায় সমকালীন গ্রামজীবন ও সমাজকে তুলে ধরেছেন। 'Truth is Stronger than fiction', পুরোনো বহুকথিত ইংরেজি প্রবচন। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নানা ধরনের মানুষের জীবনকে দেখেশুনেজেনে ও যাচাই করে প্রকৃতপক্ষে শ্রীচক্রবর্তী সমাজবিজ্ঞানীরই ভূমিকা পালন করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাঁর এই দেখা তো গ্রামে আগন্তুক এক বহিরাগতের দেখা। এ প্রশ্নও উঠতে পারে, তাঁর দেখায় প্রতীয়মান যা কিছু, তা বাস্তবে বলা ঠিক হবে কি? কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল, গ্রামজীবন হক কি নগরজীবন হক, সর্বত্র মানুষের জীবনে বাস্তবতাগুলি বহুমাত্রিক। মাত্র একজোড়া চোখে দেখে সবগুলি মাত্রা বুঝে ওঠা অসম্ভব। তাই বলে যে-সব মাত্রা লেখকের পক্ষে জানা ও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়েছে, সেগুলির আখ্যান অস্বীকার করা যাবে কোন যুক্তিতে? তা ছাড়া এই লেখকের গ্রামপরিক্রমা দীর্ঘকালের। তিনি কোনও নগরে বেড়ে ওঠা ও চাকরিসূত্রে সাংবাদিকের মতো নিছক পেশার কারণে হুট করে গ্রামে গিয়ে কোনও প্রতিবেদন লিখে ফেলেননি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি গ্রামীণ জীবন ও সমাজকে চেনেন-জানেন। এ কথা ঠিক যে, গ্রামসমাজে ক্ষমতার রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশে পুরনো কাঠামোটি ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। দলাদলি ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ বেড়ে চলেছে। আইনের শাসন বলতে কিছু প্রায় নেই-ই। তা সত্ত্বেও শ্রীচক্রবর্তীর দেখা মানুষগুলি আছে। পুরনো সংস্কৃতির চেহারা বদলেছে বটে, তবু সংস্কৃতি জিনিসটা আছে। গ্রাম-সমাজের কাঠামো ও গ্রামজীবনের একালীন যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা কদাচ কল্পকাহিনী নয়। আমি ৩৪ বছর বয়সে কলকাতায় স্থায়ী ডেরা বাঁধলেও গ্রামের সঙ্গে আমার নিবিড় যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। তাই শ্রীচক্রবর্তীর আলেখ্যের সত্যাসত্য সম্পর্কে রায় দেওয়ার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি। তাঁর 'আম্বিয়া বিবি'-ও আমার চেনাজানা। বিশেষ করে এই মুললিম বধূর যে কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মুসলিমজীবনের একালীন রূপান্তর ও মানসিকতা বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে। 'গ্রামের পাঁচালী' অংশে যেসব ঘটনা ও চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তব হয়েও ফিকশনের মতো শিল্পধর্মী বিন্যাস। এটা আসলে শ্রীচক্রবর্তীর গদ্যশৈলীর মুনশিয়ানা। আলেখ্যগুলি সাংবাদিকতাসুলভ চমকের সৃষ্টি করে না। আবার নিছক ফটোগ্রাফিকও নয়, বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাভিত্তিক এ এক নতুন ধরনের নির্মাণ। সাম্প্রতিক কালে গ্রামজীবনের

যে-সব গল্প লেখা হচ্ছে, সেগুলির পাশে দাঁড় করালে 'পঞ্চগ্রামের কড়চা'-র উজ্জ্বলতা কমে তো যাবে-ই না, বরং গল্পগুলিকেই বিবর্ণ করে ফেলবে বলে আমার প্রতীতি জন্মেছে। কেননা সত্যিই 'Truth is Stronger than fiction'!

এই গ্রন্থটির মুদ্রণ, প্রচ্ছদ, অধ্যায়সজ্জা তথা 'লেআউট' এবং বাঁধাই মিলিয়ে উন্নতমানের প্রকাশনার জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ। বিশেষ করে কৃষ্ণেন্দু চাকী প্রচ্ছদে পুরনো গ্রামবাংলার যে ছবিটি এঁকেছেন, তা ঐতিহ্যানুগ এবং দৃষ্টিনন্দন। ভিতরের ছবিগুলিও তাঁর নিপুণ হাতে আঁকা এবং বিষয়ানুগ। 'পঞ্চগ্রামের কড়চা' লিখে সুধীর চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করলেন।

দেশ

[ ]

ক. ৬. ২ আলোচক : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগরিক বাঙালির জীবনে মেলা বলতে এখন অনেকটাই অধর্মীয় উৎসব-যাপনের রকমারি জমায়েত আর ক্রেতা-বিক্রেতার লাভালাভির আঁচাআঁচি। শীতকালই প্রশস্ত সময় তার। গত দু-দশক যাবৎ কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির তো বটেই, কলকাতার আসপাশে মফস্বলবাসীরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছে নতুন সব মেলার বৈচিত্র্যে। দিনকাল বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ধরনের অনেক মেলাই এখন নাগরিক বাঙালির অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছে। শহর কলকাতা বরাবরই হুট্টমেলার দেশ। কিন্তু সেখানেও এখন উদ্যোগ-আয়োজনের বহরে আমোদগেঁড়ে বাঙালির পক্ষেও তাল সামলানো দায়। ফূর্তির প্রাণ সবই গড়ের মাঠের দিকে। গড়ের মাঠ অবশ্য অনেকদিনই ভোল বদলে ময়দান হয়েছে। আর রাজনৈতিক বাঙালির ময়দান-ই-জঙ্গ্‌ও তো সেখানেই।

শহরে বাঙালির চৌহদ্দির বাইরে যে গ্রামীণ জীবন, বাঙালির সেই সামাজিক জীবনেও তো মেলা আর উৎসবের বৈচিত্র্য কম নয়। নগরজীবন আর গ্রামজীবনের প্রকারভেদে মেলার চরিত্রও যে কত আলাদা তা কি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে! সাবেক বাঙালির জীবনে—সে নগরই হোক, কী গ্রামই হোক-অধিকাংশ মেলাই কোনো-না-কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এখনো যে তা নেই, সেকথা আমরা বলছি না। বরং লোকায়ত ধর্মীয় অনুষঙ্গে লিপ্ত থেকেও তা কীভাবে দিনবদলের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে সেটাই আমাদের লক্ষণীয় বিষয়। এক্ষেত্রে উপস্থিত আমাদের অবলম্বন সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের 'পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব' গ্রন্থখানি। যার ভিতর দিয়ে আমরা হয়তো বাঙালির সামাজিক জীবনের পরিবর্তনকেই প্রত্যক্ষ করব। কিন্তু এই বাঙালি কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু নয়, তার ভেতরে মুসলমান যেমন আছে, আছে খ্রীস্টানও। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও যে বাঙালি জীবন লোকায়ত—সেই লোকায়তই এখানে তার ঐতিহ্য আর ঐতিহ্যের ভাঙনের সূত্রে আলোচ্য হয়ে উঠেছে। সমসাময়িকের বিভিন্ন তল

স্পর্শ করে সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় এখানে তাঁর সরেজমিন তদন্তে ব্যক্ত করেছেন বাঙালির লৌকিক জীবনের এক বিশেষ ছবি। গত দু-দশকে গ্রামবাংলার জনসমাজের পরিবর্তন এখানে স্পষ্টতই বিবেচ্য হয়ে উঠছে। দু-দশকে বলছি এই কারণে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে গ্রামসমাজের চেহারা যেভাবে বদলেছে (ভালো-মন্দ উভয়দিকেই), তার সূত্রেই সুধীরবাবুর এই বইয়ে মেলা ও উৎসবের চেহারায় পরিবর্তনের ছবিও অনেকটাই ধরা যায় বলে।

এতদিন লোকায়ত গৌণ ধর্মের স্বরূপসন্ধানী হিসেবে তিনি যেভাবে দেখেছেন বিভিন্ন বিষয়কে, এখানে সেই দৃষ্টি কিছুটা অন্যরকম। বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কিছুটা, কখনো আবার তার বিপরীতভাবেও এতদিন যেভাবে দেখে এসেছেন, এখানে তো অনেক বেশি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যেন নিজেরই দেখা জগৎকে পুনর্বিবেচনার প্রয়াস রয়ে গেছে। চেনাজানা জগতেরই ভোল বদলানো অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর বেদনাও চাপা থাকেনি। সময়ের ব্যবধানে ওলোটপালট হয়ে যাওয়া অনেককিছুই এখানে তাই প্রতিবেদনে ধরে রেখেছেন। লোকায়ত গৌণ ধর্মসংক্রান্ত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আগে যে তত্ত্ববিশ্বের হদিশ পেয়েছি, এখানে অনেকটাই তা বিন্নতর। ফলে এখানে তাঁর লিখনশৈলীরও রদবদল ঘটতে দেখা যায়। ট্র্যাভেলগ বা ভ্রমণবৃত্তান্তর ধাঁচে এর আগেও তিনি লিখেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু এখানে আলাদা, তাই শৈলীতেও ঘটে যায় পরিবর্তন। এখানে তিনি বেশ খানিকটা 'প্রাকৃত'। প্রাকৃতজনের কথা বলতে গিয়ে আরো যে বিষয়টি এই গ্রন্থে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, অন্তত আগে ঠিক এইভাবে ছিল না, তা হলো ক্ষেত্রবিশেষে নানরকম যৌন-প্রসঙ্গের উত্থাপন। সুধীরবাবুর লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, বিষয়টি তাঁদের কাছে সবিশেষ পরিস্ফুট হবে বলে মনে হয়। লোকায়ত গৌণ ধর্মের তত্ত্ববিশ্বের কথা বলতে গিয়ে সেসব আগেও এসেছে। কিন্তু তা ছিল খানিকটা 'তৎসম'। স্বাভাবিকভাবেই এখানে তা অচল। তাছাড়া এখানে লক্ষ্যেও তো ভিন্নতা রয়েছে। সেরকম হবেই-বা কেন।

যাই হোক, তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ ' পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব' যে বিভিন্ন তলে ছড়িয়ে থাকা আমাদের লৌকিক জীবনেরই প্রতিবেদন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মোট দশখানি প্রবন্ধে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি মেলা ও মহোৎসব ভ্রমণ করে তার প্রতিবেদন সংকলন করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় 'আত্মপক্ষ' শীর্ষকে তিনি জানিয়েছেন-'বইটির নামকরণে পশ্চিমবঙ্গ শব্দের ব্যবহার স্বেচ্ছাকৃত এবং এটা বোঝাতে যে, উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের মেলা ও উৎসব এর উপজীব্য নয়। তাই বলে এমন ভাবাও ঠিক নয় যে পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলের মেলা মহোৎসবপরিক্রমা এতে আছে। তবে প্রধান বেশ কটি উৎসব ও সমাবেশ, ধর্মীয় ও লোকায়ত, আমার মতো করে বুঝতে চেয়েছি।'

শুধু যে তিনি নিজের মতো করে বুঝেছেন তাই নয়, তাঁর চোখ দিয়ে দেখা এইসব প্রবন্ধে আমরাও পাঠক হিসেবে কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করি। প্রথম প্রবন্ধ 'মেলার চিত্র আর চালচিত্র' তিনি এই গ্রন্থের ধরতাই হিসেবে পেশ করেছেন। মেলার অন্তঃস্বভাবকে

এই রচনাটি পুরোনো এবং সাম্প্রতিক কালের পটভূমিতে সংলগ্ন করে স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য প্রবন্ধের দিকে মনোনিবেশ করতে প্ররোচিত করে। গ্রন্থের বাকি অংশ দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে পাঁচটি রচনা, দ্বিতীয়াংশে চারটি।

'দেবতার লোকায়ন : অগ্রদ্বীপ' প্রথমাংশের প্রথম নিবন্ধ। প্রাচীন জনপদ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের মন্দির ও মেলা নিয়ে এখানে আলোচনা রয়েছে। ইতিহাসের সূত্র ধরে বর্তমান পরিক্রমায় তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন রয়েছে এখানে। চৈত্র মাসের কৃষ্ণাতিথির একাদশী থেকে শুরু করে তিনিদিনব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গোপীনাথের আবির্ভাব-কাহিনী ও তার মূর্তির বৈশিষ্ট্যের কথাও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধকর্ম করে স্বয়ং দেবতা, কাছা পরে। সেই অনুষ্ঠান প্রতি বছর চৈত্র একাদশীতে হয়ে থাকে। কেন এরকম কর্ম দেবতার কৃত্য হয়ে উঠছে তা এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। সবিস্তারে তা বর্ণিতও হয়েছে। দেবতার এই লোকায়ন স্বভাবতই আমাদের ধর্মবুদ্ধির এক অন্যতর মাত্রা হিসেবেই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

'কার্তিকের লড়াই : গাঙ্গেয় জনপদ' প্রথমাংশের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। কাটোয়ার কার্তিক পুজোর পাশাপাশি চুঁচড়া-বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে এই পুজোর কথাও এসেছে। মূর্তির বৈশিষ্ট্যও আলোচিত হয়েছে ছবিসহ। 'কার্তিকের লড়াই' শব্দটি কাটোয়ার প্রচলনের সূত্রে তার ঐতিহাসিক সূত্রসন্ধানও করেছেন। প্রসঙ্গত কার্তিকের পৌরাণিক আখ্যানের নানা অনুষঙ্গ ও উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, গণিকাদের কাছে কার্তিক কেন উপাস্য দেবতা হয়ে উঠল, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করছেন। কার্তিকের রূপভেদের কথাও এসেছে।

হিন্দুদের দেবদেবী প্রসঙ্গে একসময় হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের গ্রন্থপাঠের অভিজ্ঞতা বহুদিন পর সুধীরবাবুর এই প্রবন্ধপাঠের সূত্রে স্মরণে আসছে। যদিও সুধীরবাবুর লেখায় কোথাও হংসনারায়ণের উল্লেখ নেই। কিন্তু তিনি যে বিষয়টির সরেজমিন তদন্তের সূত্রে লোকায়ত পাঠ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁর প্রয়াস যে ভিন্নতর তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

'সাপের মেলার উচ্চবর্গ নিম্নবর্গ' তৃতীয় প্রবন্ধ। নদীয়ার বহ্মাণীতলায় শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলা তাঁর গন্তব্য ছিল। সেই সূত্রেই তিনি এখানকার মনসাপুজো ও তাকে কেন্দ্র করে মেলার কথা জানিয়েছেন। সেখানকার লোকজীবনে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের এই পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আয়োজন ও তাদের সামাজিক অবস্থার কথাও এসে পড়েছে। একদিকে সামন্ততন্ত্রের উত্তরাধিকার, অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষজন-এই দুই শ্রেণীর জীবনধারায় মেলা পরিদর্শক হিসেবে তাঁর প্রতিক্রিয়া এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

'রাসযাত্রা থেকে পটপূর্ণিমা : জনপদের ছন্দ' এই অংশের চতুর্থ প্রবন্ধ। শান্তিপুরের রাস নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন। সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। বহু উদ্ধৃতি এবং ঐতিহাসিক সূত্রসন্ধানের ভেতর দিয়ে এগিয়েছেন। নবদ্বীপের কথাও স্বাভবিকভাবেই এসে পড়েছে। শান্তিপুর এবং নবদ্বীপের রাসে তাঁর পরিক্রমার সূত্রে শক্তিউপাসক কৃষ্ণচন্দ্রের কথাও এসেছে। গৌরাঙ্গবিদ্বেষের প্রসঙ্গেও এই সূত্রে আলোচিত হয়েছে। বৈষ্ণব এবং শক্তিসাধকের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে লেখক বিস্তর তথ্য সমাবেশ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের

এক ব্যাপক পটভূমিকেই এখানে তুলে ধরেছেন। আর এই দ্বন্দ্বের ভেতর থেকেই নবদ্বীপের পটপূর্ণিমার মূর্তিতে বৈষ্ণব-শাক্ত সমন্বয়ী চিন্তার সূত্রও খুঁজে পান। প্রবন্ধের শেষে, নবদ্বীপ পৌরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক রাস প্রতিমার তালিকাও পেশ করেছেন।

'জগদ্ধাত্রীর সন্ধানে : কাগ্রামে' প্রথমাংশের শেষ প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শুরুতে লেখকের জবানি থেকে তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি সম্পর্কে অবহিত হই। কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন এবং পরাসি চন্দননগরেও তার প্রসার সম্পর্কে নানা সূত্র-সন্ধানে ব্রতী লেখক শেষ অব্দি মুর্শিদাবাদের কাগ্রামে গিয়ে পৌঁছান। জগদ্ধাত্রী মূর্তির রূপায়ণ প্রসঙ্গ ও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও তাঁর সন্ধানী মন উপস্থিত। মূর্তিশৈলী প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের তুলনায় এখানকার প্রতিমার সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। মূর্তি কিছুটা অনুন্নত হলেও গ্রামীণ পরিবেশে গ্রামবাসীদের উৎসব-আনন্দের শরিক লেখকের প্রতিবেদন থেকে অন্যান্য বেশকিছু তথ্যও জানা যায়। এখানকার জগদ্ধাত্রীর পুজোর সূচনা, তার বিস্তার, সমারোহ এবং সূচনাকারী বংশের নানা তথ্যাদি সাধ্যমতো সংগ্রহ করেছেন। মূর্তির কারিগরদের সম্পর্কে এবং কাগ্রামের সংস্কৃতিচর্চার স্বরূপ নিয়েও অনুসন্ধান চালান।

এর পরের অংশের প্রথম রচনা 'দাতা পীরের মেলা : পাথর চাপড়ি'। বীরভূমের পাথরচাপড়িতে ফকির দাতা মহবুব শাহ্ ওলির মাজারকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত মেলায় উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা এখানে ব্যক্ত করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা যে খুব একটা সুখকর হয়নি তাঁর পক্ষে তা জানাতেও কসুর করেননি। লিখছেন-'পঁচিশ-তিরিশ বছর কেটেছে সারা বাংলার কত রকমের মেলায় মহোৎসবে, কিন্তু এই প্রথম আমার জীবনে একটা মেলা আমাকে একেবারে কাছে টানল না। কেন? কেন এই প্রত্যাখ্যান? খতিয়ে দেখে, ভেবে, প্রথমেই মনে হল এখানে বড্ড ব্যবসা আর বিপণির গন্ধ। সে অনুপাতে দরদী মরমী মানুষ খুব কম। একটাও তো ভাবের গান শুনলাম না? চোখে পড়ল না একটাও ফকিরি আখড়া। কেবল জগঝম্প, উত্তাল নাচ আর হিন্দিগানের সুরে দাতা পীরের জীবনস্বপ্ন ও সমন্বয়বাদ কোথায় যেন টাল খায়। এতো কেনাকাটা, রোশনাই আর এতো ব্যাধিগ্রস্ততা? মনে হল পালাই।' ওই ব্যাধিগ্রস্ততা প্রসঙ্গে তিনি এমনও লিখেছেন--'অজস্র প্রতিবন্ধী ভিখারি, অজস্র কুষ্ঠরোগী। বাঙালি এই ধর্মসমাজে ব্যাধিগ্রস্তদের এমন বিপুল সংখ্যাধিক্য অন্য একটা ভাবনা আনে। এত সংখ্যক মুসলিম পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ? এত কুষ্ঠরোগী আল্লার রহমত প্রার্থনা করছে কেঁদে কেঁদে?....সাধারণভাবে প্রতিদিনের যাপনে আশপাশের মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে বা মুসলিম পাড়ায় ঘোরাঘুরি করলে বোঝা যায় না তাদের মধ্যে ব্যাধির প্রকোপ কতটা। পশ্চিমবঙ্গের সব মেলায় ভিখারিরা থাকে ভিক্ষার চাদর বিছিয়ে, থাকে কিছু কিছু পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ কিন্তু তাই বলে এত?' তাঁর বেদনার কারণ কেবলমাত্র এসব ক্ষেত্রেই নয়, বরং অন্যত্র রয়ে গেছে বলেই মনে হয়। নিজের জবানিতে না বললেও তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাথরচাপড়িতে আসার পথে 'অচিন পাখি' শীর্ষক একখানি পুস্তিকা তাঁর করতলগত হয়। সেখানে একটি নিবন্ধের সূত্রে তাঁর সহমর্মিতা টের পেয়ে আমরা বলতে পারি, এই মেলায় যেরকমভাবে এক ইসলামি অণুবিশ্বকে তিনি

দেখতে পান সেখানে লোকায়ত গৌণ ধর্মের প্রতিবাদী স্বরূপকে প্রত্যক্ষ না করতে পারার বেদনাই তাঁকে হতাশ করেছে। জনৈক লিয়াকত আলির একটি নিবন্ধে বলা হচ্ছে—'.....চোখের সামনে যখন দেখি সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলমেলাগুলোতে লাখ লাখ বাঙালি হিন্দু জাতিধর্মনির্বিশেষ যে রাতের পর রাত আখড়ায় আপন প্রতিবাদী ধর্ম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করছে, গান করছে, মানুষের প্রতি মানুষের যে সেবা ভক্তি ও প্রেমের মহত্তর নিদর্শন মেলে ধরেছে, প্রেম প্রীতি ও মানুষ আরাধনার আরেক পীঠস্থান পাথরচাপুড়িতে বাঙালি মুসলমান তেমন এক প্রতিবাদী কর্মযজ্ঞের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছতে পারল না কেন— ভাবলে মানুষ হিসাবে কেমন দিশাহারা বোধ করি। বুঝি, এই প্রায়শ্চিত্তের দায় এড়িয়ে গেলে বাঙালি মুসলমান চিরকালের মতো অন্ধকারে থেকে যাবে।' সুধীরবাবু নিজেও যে লিয়াকত আলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন তা বুঝবার অণুবীক্ষণ জন্য যন্ত্রের প্রয়োজন নিশ্চয় হয় না।

'মানুষের সত্যতত্ত্ব : ঘোষপাড়া' এর পরের প্রবন্ধ। ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রসঙ্গে এর আগেও তিনি লিখেছেন বিস্তর। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি মেলার ভেতর যেহেতু ঘোষপাড়াও অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানে বইয়ের অন্তর্গত বিন্যাসের কারণেই সে প্রসঙ্গ এসে গেছে। সতী মা-র মেলা তাই আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

এর পরেব নিবন্ধ 'খ্রিস্টীয় মেলার শিকড়ের টান'। চাপড়ার খ্রীস্টীয় মেলার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। খ্রীস্টান ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসা এবং নিজস্ব ধারণা অর্জনের সাক্ষ্য এখানে সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয় বাঙালি খ্রীস্টানের সূত্রে খ্রীস্ট-কীর্তন এবং পালাগানের সাবেকি ঐতিহ্যের কথা এখানে এসে পড়েছে। সন্ধানী মনের মানুষ হিসেবে তো বটেই, তার চেয়েও বেশি হয়তো বাংলা গানের রসিকজন হিসেবে তাঁর ক্ষেত্রানুসন্ধান আমাদের এক অজানা জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শহুরে খ্রীস্টানের বিপরীতে যে গ্রামীণ খ্রীস্টান-সমাজ ছড়িয়ে আছে, এই প্রবন্ধে তারই প্রতিবেদন তিনি রচনা করেন বিশেষ এক অঞ্চলকে ভিত্তি করে। আর এই সূত্রেই নানা অজানা তথ্যও সরবরাহ করেন চাপড়ার খ্রীস্টীয় মেলার প্রসঙ্গ ধরে।

এই পর্যায়ের এবং গ্রন্থেরও শেষ প্রবন্ধ 'কবির নামে মেলা : জয়দেব কেঁদুলি'। সদ্য পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর আগের অভিজ্ঞতার সূত্রে কিছুটা পুনর্বিবেচনাও হয়তো এসে পড়েছে। গানের রসিক সুধীর চক্রবর্তীর সামগ্রিক পরিক্রমার সূত্র ধরে আমরাও টের পাই এই গ্রন্থবিন্যাসের এক বলয়িত রূপরেখাকে।

এই সমগ্র পরিক্রমায় পাঠককে সঙ্গী করে নেবার তাগিদে একদিকে তাঁর ভাষা যেমন সহায়কের ভূমিকা নেয়, তেমনি গ্রন্থের পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মানচিত্র এবং প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত কিছু স্কেচও এক্ষেত্রে সহায়তা করে। গ্রন্থের বিভিন্ন প্রারম্ভে মেলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেন। দুশো ষোল পৃষ্ঠার এই বইয়ে আমরা যে তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে পড়ি কেবল তা নয়, বরং মেলা ও মহোৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মের অন্তঃস্বভাবকেও কিছুটা জেনে নিতে পারি। ধর্মনির্বিশেষে বাঙালিয়ানার বিভিন্ন তলকে স্পর্শ করে বৃহত্তর বাঙালি জনসমাজের সামনে তিনি আমাদের উপস্থিত করেন।

কৃষ্ণেন্দু চাকী-কৃত উপযোগী প্রচ্ছদ, ভালো বাঁধাই ও সুমুদ্রণে এই গ্রন্থ নিশ্চয় আগ্রহী পাঠকের ঔৎসুক্য মেটাবে।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৯৬

ক. ৬. ৩ আলোচক : তারাপদ সাঁতরা

সুধীর চক্রবর্তীর লেখা বইটি হাতে পেয়ে ধন্দ লেগেছিল যে, কয়েকটি জেলার মেলা-পার্বণের মামুলি বর্ণনা হয়তো পরিবেশিত হয়েছে প্রতিবেদনী কায়দায়। কিন্তু বইটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি বিখ্যাত মেলা ও উৎসবের অবদান কী ভাবে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে সাধারণ মানুষের মিলন-ময়দানে রূপান্তরিত হয়ে লোকায়ত হয়ে উঠেছে, এ তার সরস ও জীবন্ত এক বিবরণ। শুধু তা-ই নয়, লেখকের রচনা শৈলীর গুণে মনে হবে পাঠকও যেন লেখকের সঙ্গে পথ-পরিক্রমায় শামিল হ'য়ে সেইসব মেলায় পৌঁছে গেছেন। এর মধ্যেই লেখক পরিবেশন করেছেন ভাষাতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির অনেক গূঢ়তত্ত্ব যা রচনার লিখন শৈলীর উৎকর্ষে মোটেই লেখাকে ভারাক্রান্ত করে না।

শ্রীচক্রবর্তী তাঁর রচনাটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে রযেছে প্রাক্ কথন, যাতে পাঠকেরা তাঁর এই রচনার বিন্যাসটিকে ধরতাই করতে সক্ষম হন; দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিভিন্ন ধর্মীয় দেবদেবীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত মেলা আর উৎসবের আলেখ্য, যার মধ্যে আছে অগ্রদ্বীপের ঘোষ ঠাকুরের মেলা, গাঙ্গেয় জনপদে কার্তিক ঠাকুরের উৎসব, নাকাশিপাড়ায় দেবী ব্রহ্মাণীর সাপ খেলানোর মেলা, শান্তিপুরের বৈষ্ণব রাস ও নবদ্বীপের শাক্তরাস উৎসব, কাগ্রামের দেবী জগদ্ধাত্রীর মেলা প্রভৃতি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নরলোক থেকে দেবলোকে উত্তীর্ণ এমন সব সাধকের স্মরণে আয়োজিত মেলা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাথরচাপড়ির দাতাপীরের মেলা, ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলা, চাপড়ার খ্রিস্টীয় মেলা এবং গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবির নামে জয়দেব কেঁদুলির মেলা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বইয়ের নামকরণ মেলা মহোৎসব সংক্রান্ত হলেও, লেখক কিন্তু জানিয়ে রেখেছেন, তিনি মেলায় মেলায় শুধু ঠাকুরদেবতা দেখে বেড়াননি, তিনি আসলে দেখতে চেয়েছেন মানুষকে। তাই তিনি আলোচনাকালে আমাদের গ্রামীণ সমাজে বঞ্চিত অসহায় ভাগ্যহত অশিক্ষিত মানুষের মস্তবড় আশ্রয় কীভাবে লৌকিক ধর্ম ও অন্ধ সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা পড়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ ছাড়া মেলায় মেলায় তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন মেলায় আগত সেইসব আউল বাউল ফকির শিল্পী কবিগায়ক ও ভক্তদের, যাঁরা বাংলার জলমাটির আবহাওয়ায় নিজস্ব সংরাগে সৃষ্ট লোকসংগীতের ঐতিহ্য আজও টিকিয়ে রেখেছেন। সেইসঙ্গে লেখক উদ্ধার

করেছেন, খ্রিস্ট ভজনকারীরা কীভাবে একদা খ্রিস্ট কীর্তন প্রবর্তনের তাগিদে নবদ্বীপের কীর্তনসমাজের কাছে তালিম নিয়েছেন, সেই সব অজানিত তথ্য। মেলার বিভিন্ন দৃশ্যের বহু আকর্ষণীয় স্কেচ, আলোকচিত্র ও মানচিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীচক্রবর্তী একজন সমাজবিজ্ঞান নির্ভর লোকসংস্কৃতি-গবেষক। তাই দু'একটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানাই যে, নদীয়া জেলার বিভিন্ন গবেষকগণের লেখায় 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় স্থাপত্য' নামে এক ধারার উল্লেখ পাই, যদিও সে স্থাপত্য ধারার অবয়ব যে কী তা কেউ যুক্তি দিয়ে বলেননি। এক্ষেত্রে শ্রীচক্রবর্তীও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ভাস্কর্যের অবদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, বাংলার মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে চালারীতির বদলে অন্যতর রীতি প্রবর্তন তাঁর অন্যতম কীর্তি (পৃঃ ১২১)। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবর্তিত অন্যতর রীতিটি যে কী, সে সম্পর্কে কোনও বর্ণনা তিনি দেননি। অন্যত্র গ্রন্থে চিত্রিত জগদ্ধাত্রীর প্রস্তর মূর্তির প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বরিশালে প্রাপ্ত জগদ্ধাত্রীর মূর্তিটি আনুমানিক অষ্টম শতকের (পৃঃ ১২২)। তাঁর অবগতির জন্য জানাই যে, উল্লিখিত মূর্তিটি খ্রিস্টীয় আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের, যার প্রাপ্তিস্থান যশোহর জেলার নলডাঙা; অন্তত ক'লকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ওই মূর্তির পরিচয় তো এইভাবেই ছাপা অক্ষরে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু শেষে আবার বলতে হয়, মেলা ভ্রমণের আনন্দ আর বেদনা সবকিছু ভাষা বৈদগ্ধ্যে এমনভাবে পরিবেশিত হয়েছে যে, বইটি পড়ার পর মনের চালচিত্রে বেশ দাগ কেটে রাখে; সে দিক থেকে লেখকের মুন্সিয়ানার তারিফ না করে পারা যায় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা
২২ মার্চ ১৯৯৭

ক. ৭ বাউল ফকির কথা

ক. ৭.১ আলোচক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালে বাউল ফকিরদের বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানসম্মত যে ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষাটি চালানো হয়, তার ভার নিয়েছিলেন খ্যাতিমান গবেষক সুধীর চক্রবর্তী। লেখকের দেখার গুণে সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি এ বইতে হয়েছে এমন এক বর্ণময় মানবিক দলিল যা এই দুই সাধক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের হুঁশ ফেরাতে সাহায্য করবে।

লেখকের কথায় বইটি সাজানো হয়েছে এই ভাবে : "প্রথম ভাগে আছে বাংলার বাউল ফকিরদের অতীত ও বর্তমানকে মিলিয়ে আমার বক্তব্য—যার তথ্যভিত্তি সরেজমিন সন্ধানজাত বাস্তব মালমশলা।.....দ্বিতীয় ভাগে আছে এক জন ফকিরের আত্মকথা, দু'জন ফকিরের আত্মবিবৃতি ও আমার ভাষ্য। তার পরে আছে এক জন ফকিরের পদ্যে রচিত তত্ত্বসন্দর্ভ।" আছে ৩০টি ফকিরি এবং ৩০টি বাউল গান। সেই সঙ্গে ১০টি গানের স্বরলিপি এবং ফকির বাউলের একটি তালিকা।

দুই সম্প্রদায়েই বহু সাধক আছেন, যাঁরা গায়ক নন। অন্য দিকে আছেন সাজা বাউল আর সাজা ফকির। বাউল গান আর ফকিরি গান তাঁদের বাজার ধরার উপায় মাত্র। খ্যাতির বিড়ম্বনায় জাতবাউল স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন এমন নজিরও বড় কম নয়।

নবাসনের হরিপদ বাউল ছ'রকম ভ্রষ্ট বাউলের নাম করেছিলেন : "এটাসিং পেটাসিং ঝুলিপেটা উদাসীন/মাগমরা/ধামাপোরা এই হয় ছয়।" এটা সিং কামুক, পেটা সিং পেটুক, ঝুলিটেপা দেখে ঝুলি কতটা ভরল, মাগমরা হল মৃতদার, সঙ্গিনী জোটাতে যে বাউল হয়, ধামাপোরা হল যে চায় ধামা বোঝাই করতে। মাঠেঘাটে আর হট্টমেলায় ঘুরে লেখক তার বিলক্ষণ পরিচয় পেয়েছেন।

বাউলদের কদর বেশি। বিদেশে ডাক পায়। তারা সরকারের নেকনজরে থাকে। ফিকিরের অভাবে ফকিররা কল্কে পায় না। বে-শরা হওয়ায় মুসলিক মৌলবাদীদের হাতে তারা পড়ে মার খায়। প্রচারের অভাবে ফকিরদের বিষয়ে আমরা কম জানি বলে এ বইতে সেই ঘাটতি পূরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

লেখক দেখিয়েছেন বাউল আর বৈষ্ণব এক নয়। বাউলের বিগ্রহ নেই, তীর্থ নেই। 'বাউল মানুষ ভজে', তার 'জীবনই তীর্থ ধর্ম মত।' যা নেই দেহভাণ্ডে, তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে ঠাকুরদেবতা নয়, মন্ত্রতন্ত্র নয়। সহজে পৌঁছনোর কঠিন পথ হল কায়া সাধনা।

শুধু পুঁথি-পড়া বিদ্যা আর পরমুখাপেক্ষিতার বদলে দল বেঁধে গোটা রাজ্যের মাঠে-ঘাটে ঘুরে সরেজমিন ফকির বাউলদের সশরীর সাক্ষাৎ তত্ত্বতল্লাশ করাই ছিল এই পরিকল্পিত অনুসন্ধানের লক্ষ্য। শূন্যে সৌধ নির্মাণের বদলে এ-বইতে তথ্যের শক্ত মাটিতে গাঁথা হয়েছে তত্ত্বের ভিত।

অর্থ কাম যশ আর সেই সঙ্গে দুনিয়াদারি কী ভাবে জাতবাউলদের পাঁকে ডুবিয়ে

দিচ্ছে আর ফাঁকতালে নেচেকুদে আসর জমাচ্ছে যত সব সাজা বাউল—এ বইতে চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। যত না ঘটে, তার শতগুণ বেশি রটে। শুধু বাউল কেন, জনপ্রিয়তার চক্করে পড়লে সবাইকেই তার মাসুল দিতে হয়।

"মুষ্টিভিক্ষে করে আমি/ খেতে পাইনে উদর পুরে/ ঘরে ঘরে ঘুরব কত/ ভূতখাটুনি খাটব কত"—জাতবাউলের আজও সেই একই হাল। বেড়ালের ভাগ্যে যাদের শিকে ছিঁড়েছে, যাদের দেখে অনেকের চোখ টাটায়—তেমন লোক তো কোটিতে গুটিক। পথের ফকির বাউল মেলা-মচ্ছব তো ছিলই। গরিবের ঘোড়া রোগ নতুন নয়। নতুন বলতে সমুদ্রলঙ্ঘন আর কনফারেন্স সেমিনার। সাধারণ বাউল-ফকিরের যা নাগালের বাইরে।

কনফারেন্স সেমিনারে যারা ডাক পায় তারাই বা কারা? লেখক বলেন, "আমি খুব মমতা নিয়ে এই ক্ষুৎকাতর মানুষগুলিকে দেখি। আমার দেশের অনেকটাই উপেক্ষিত এক সম্প্রদায়। কুচকুচে কালো গায়ের রং। ঝুঁটি বাঁধা চুল এলিয়ে দিয়ে, হয় নিবিড় নিদ্রাচ্ছন্ন, না হয় ম্লান মুখে বসে বিড়ি টানছে। বাগদি, ডোম, দুলে, কুর্মি, কাহার, নমশূদ্র জাতের সব নিম্নবর্গীয় মানুষ। আমাদের এন্টারটেনার। সারা বছরে কেমন করে তারা বাঁচে, কোথায় থাকে, কী খায়, কী তাদের সংকট কিছুই জানি না।"

জানবার সেই চেষ্টাতেই হাতে নেওয়া হয়েছিল এই প্রকল্প।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার ভয়ে ভাববাদীরা বাউলতত্ত্বের বেশি ভিতরে ঢুকতে সাহস পাননি। বাউলের গানের রসে মজলেও তাদের দেহসাধনার রকম দেখে তাঁদের আর এগোবার প্রবৃত্তি হয়নি।

কোনও রাখঢাক না করেই গুরুমুখী সেই যুগলসাধনার চিত্র এ বইতে মেলে ধরা হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
৪ আগস্ট ২০০১

ক. ৭. ২ আলোচক : **জ্যোতিভূষণ চাকী**

মন চলো যাই ভ্রমণে
কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে।

উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর শহরে তখন আমার কৈশোর কাটছে। কৃষ্ণ অনুরাগের তখন ধার ধারি না। ওই গানটি গাইলেন যে বাউল-বৈষ্ণব, তাঁর একতারাটির প্রতি আমার অনুরাগ। —গানের শেষে সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে একটু টুং টাং করা আর সেই সঙ্গে দিদিমার সস্নেহ ভর্ৎসনা, অমন করিসনে। বাউল ঠাকুরের একতারাটার তার ছিঁড়ে ফেলবি নাকি?

যৌবন। তখন আমিই যেন খ্যাপা বাউল। পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের ছাত্র।

হেঁটে চলার ভাও জানি না,
উড়ে চলার ধাত।

আর উড়ে তো চলতেই হবে, মনের দিক থেকে, কারণ রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেছি যে তখন। শহরটা পাবনা; পদ্মা নদী অদূরেই। শহরে থাকি মন পড়ে থাকে দূরে ইছামতীর তীরবর্তী মালঞ্চ-গয়েশপুর গ্রামাঞ্চলে; শুকনো বাঁসপাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে হারান-বাউলের ডেরা খোঁজা। হারান গাইছিলেন—

খুশি কাজে দুখী হইলাম
ও রাইকিশোরীর কাছে
যেন তার নুনের নৈকা ডুব্যাছে।

এসব কথা এলোমেলোভাবে মনে পড়ছে সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল ফকির কথা' হাতে নিয়ে। নির্জন পথে তিনি তো *হেঁটেই*ছিলেন সত্তরের দশকে। এবারে আবার সেই পথের ডাক। পশ্চিমবঙ্গের বাউল-ফকিরদের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যাপক ক্ষেত্রসমীক্ষার দায়িত্ব হাতে নিতে হবে তাঁকে। না, কোনো সরকারি খবরদারি নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট প্রোফর্মাদি। আর কী চাই! সুধীর আবার সেই নির্জন পথে—এ যেন হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা। পথের শেষ নেই যেন। এত বড়ো এলাকা, এত বৈচিত্র্য এত ধরন-ধারণ এত সুর এত গান। কিন্তু তাঁর মন বলল 'যাও তোমার ব্রত পালনে'।

প্রচ্ছদেই প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন বাউল-ফকির কথা। —যে বাউল সেই কি ফকির? লালনসাঁই কি বাউল না ফকির? যদি বাউল আর ফকির পৃথক হয় তা হলে পার্থক্যটা কোথায়? বাউলদের সম্বন্ধে প্রথম আগ্রহ-জাগানো রবীন্দ্রনাথ বাউলদের ঠিকমতো চিনেছিলেন কি? আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের উচ্ছ্বভাবের বাউলতত্ত্বটি কি সারবান? আজকের পরিবর্তিত সমাজে বাউল-ফকিরদের অবস্থান কি একইরকম আছে? সাধক বাউল-ফকির আর গায়ক বাউল-ফকির কি এক? আর্থসামাজিক পটভূমি ছাড়া তাঁদের স্বরূপ নির্ণয় কি সম্ভব? বাউল-ফকির নির্যাতনের প্রকৃত কারণ কী?

এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন ও সমস্যা এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত। বিশ্লেষণ কথাটা হয়তো ঠিক হল না। মরমিয়াদের মর্ম-উদ্‌ঘাটনে এ যেন এক আবরণ উন্মোচন। একই সঙ্গে চলেছে স্যাৎ-কে নস্যাৎ করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদনিষ্ঠ মন ও মনন দিয়ে মনের-মানুষ-খোঁজা বাউলতত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করেছেন। ভিন্‌টাবর্নিংসও জার্মানি ভাষায় রবীন্দ্রদর্শন বিশ্লেষণে এ কথাই বলেছেন। মনের মানুষ আসলে যে বাউলের বস্তুবাদ পিতৃতত্ত্ব-মাতৃতত্ত্ব তা রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। তবে তাঁর এই ভ্রান্তি আশ্চর্য কান্তি নিয়ে তাঁর সংগীতসৃষ্টিকে রমণীয় করে তুলেছে। বাউলের চারিচন্দ্রভেদের কথা জানতে পেরেই বাউলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ভাটা পড়ে যায় এ তথ্য সত্যমিথ্যায় সমভাগে বিভক্ত হয়তো। সুধীর তো আলো *ফেলতে ফেলুতে চলেছেন* এই ধরনের হাজারো বিষয়ের উপরে।

ক্ষিতিমোহন সেনের উচ্চভাবের বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হয়তো পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু তার কোনো লিখিত সাবুত নেই। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও অনেক বাউলগানে হস্তাবলেপ আছে বলে বিশ্বাস করেছেন। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর উদাহৃত কয়েকটি গানের উল্লেখ করেছেন, নিঠুরগরজী ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষিতিমোহন তাঁর বাংলার বাউলগানে এধরনের বেশ কয়েকটি গানের উৎস-বিবৃতি স্পষ্টত দিয়েছেন।

উপেন্দ্রনাথের মতে 'মানসমুকুল' এই সমাসবদ্ধ অলংকারসৃষ্টি আধুনিক কালে বিরল। উপেন্দ্রনাথের একথা মানতে পারছি না—তা হলে 'মনমধুকর', 'মনমাঝি' এসব সমাসবদ্ধ পদবন্ধন দীর্ঘদিন আগে চলত কী করে? আর 'প্রকাশ ভঙ্গির চাতুর্য' বলে যে সন্দেহ, সে সন্দেহ কি তা হলে 'সে আর লালন এক খানেতেই রয় ত' 'তবু লক্ষ যোজন ফাঁক বে' এই আশ্চর্য বাক-প্রকাশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়!

এ সম্বন্ধে সুধীরবাবু বলেছেন, 'এমন স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ এবং ভয়ানক অভিযোগ সম্পর্কে আমরা নিজস্ব কোনো মতামত বা নতুন বিতর্ক তুলব না।' একথা বলে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাযেব একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে উপেন্দ্রনাথকেই অসিতকুমার সমর্থন করেছেন। এবিষয়ে সুধীরবাবুর নিজস্ব মত পেলে খুশি হতাম। অবশ্য শিক্ষিত লোকেরা যে অনেকে সখের বাউল সেজে গান রচনা করেছেন একথা সুধীববাবু বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এসব রচনাকে স্বাভাবিক বলেই মনে কবেছিলেন : 'এমন সহজ এমন গভীব, এমন সোজাসুজি সত্য এত অল্প কথায় অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমতো হিংসা হয়'।

যে যৌন স্বেচ্ছাচারেব অভিযোগ একদিন বাউল-খেদা আন্দোলনের কারণ হযেছিল সে সম্বন্ধে লেখক সমাজতত্ত্ববিদ বিমল চক্রবর্তীর মতটি উদ্ধৃত করেছেন—প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থাই যে সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিচার করে এবং বিধিনিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, তা হল নারী-পুরুষের সম্পর্ক, কারণ এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সম্পত্তির সংরক্ষণও উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো নারী-পুরুষের সম্পর্কেব ক্ষেত্রেও বাউলরা সমাজ-অনুগামী নয়। খুব সহজেই তাই এদের বিরুদ্ধে বহুগামিতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু মনে বাখা প্রয়োজন যে বস্তুগতভাবে বাউলসাধনা যৌন স্বেচ্ছাচারকে আদৌ সমর্থন করে না। এই যুগল সাধনায় প্রকৃতি নির্বাচন-গ্রহণ-পরিত্যাগ গুরুর আদেশ ও অনুমতিসাপেক্ষ।

তা ছাড়া যে-বে-শরা বাউল-ফকিরদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এবং এরা সমাজের সর্বনাশ করবে একথা সবলে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়। অথচ অনেকক্ষেত্রেই প্রকৃত ইসলামের কোনো অবমাননা যে এরা করেনি তা লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এদের গুরুমুখিতার কথা এ গ্রন্থে নানা সূত্রে এসেছে। সাধনা ও দীক্ষার নতুন নতুন খবর পেয়ে লেখক তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনুষ্ঠানের বিবরণগুলি দীক্ষাগ্রহণকারী নিজের জবানে বলায় তা আরও প্রামাণিক হয়ে উঠেছে।

ফকিরের জবানির পর লেখক নিজের মন্তব্য বিবৃত করায় কথকের বচন-বাচনের ফাঁকটুকু ভরাট হয়েছে। রসরতির সাধন যে বাউল-ফকির উভয়েরই আছে এবং দমের প্রক্রিয়া-প্রকরণের যে উভয়েরই সাধনীয় তা এই সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি। তবে ফকিরেরা সমাজে চোরের মতো থাকে, সহজে বোঝার উপায় নেই এ ফকির। আর তারা থাকেও সবার পিছে সবার নিচে। শান্তিকেতনেও যে বাউল-ফকিরের ক্যাম্প আলাদা সেকথা লেখক জানিয়ে আমাদের বিস্মিত করেছেন। অন্যত্রও এই বিভাজন।

লেখক জানিয়েছেন অধুনা তরুণ ফকিরেরা যে গুরু ধরার চেষ্টা করে তার কারণ বীর্যধারণের প্রকরণ আয়ত্ত করবার বাসনা; দরিদ্র ফকিরেরা যদি বহুপ্রজ হয় তা হলে তো সর্বনাশ!

পরিশিষ্টে লেখক নানা বর্গের বাউলগান ও ফকির গানের উদাহরণ আহরণ করেছেন, তাতে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ সহজ হবে। তা ছাড়া জেলাওয়ারি বাউলদের তালিকার সঙ্গে বাংলার ফকিরদেরও একটা পঞ্জি যোগ করেছেন লেখক। পরিশিষ্টে আছে ১০টি গানের স্বরলিপি, যার কিছু বাউল কিছু ফকিরি—এতে উভয় শাখার বেশ কয়েকটি শৈলীর আস্বাদন সম্ভব হবে।

মানচিত্র-সহ পশ্চিমবঙ্গের বাউল ও ফকির ও গায়কদের আর্থসামাজিক পরিচয়-সারণি (বর্ণানুক্রমিক) সংযোজিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজের খুব সুবিধা হবে বলে মনে করি। সারণিতে আছে নাম ও বয়স, সন্তান, ঠিকানা, জীবিকা ও মাসিক আয়, বাস্তুবিবরণ, গায়নের অভিজ্ঞতা, ধর্মমত, গণসংগঠনের নাম, শিষ্যসংখ্যা ইত্যাদি। সর্বোপরি রঙিন সংকেতচিত্র-সহ বহু সাধকের প্রতিকৃতি, যা আমাদের জানবার ইচ্ছাটাকে উসকে দেবে।

এটি নিছক ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য সংবলিত গ্রন্থ নয়, এটি এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থি যাতে লেখক বাউল-ফকিরদের সঙ্গে বাঁধা পড়েছেন দৃঢ়বন্ধনে।

এমন একটি গ্রন্থ সারা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পদ। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। একটানা উপন্যাসের মতো পড়ে ফেলা যায়। তবু আশা করব পরবর্তী সংস্করণে কিছু মুদ্রণ সংশোধিত হবে। জাগরুক (আত্মপক্ষ পৃ. ৪), সম্মানীয় (পৃ. ১২), ক্ষুন্নিবৃত্তি (পৃ. ২৩), কাঙ্খনীয় (পৃ. ৫৮), চাক্ষুস (পৃ. ২০৮), পৌণপুনিকতা (পৃ ২১২) হবে যথাক্রমে জাগরূক, সম্মাননীয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি, কাঙ্ক্ষণীয়, চাক্ষুষ, পৌনঃপুনিকতা।

আর ইয়ম্ভ শাম্ভবী বিদ্যার পর (পৃ. ২৩) বিসর্গটি বিসর্জন দিতে হবে। আর নেকী (৩৩) যেহেতু বিশেষ্য, এর অনুবাদ হবে পবিত্রতা, পবিত্র নয়। আর বুত্-পরোস্তি আর কায়-পরোস্তিতে ও কারগুলো বাদ দেওয়াই ভালো।

সুধীর চক্রবর্তীর কোনো কোনো সমীক্ষা মূর্তিভাঙার পর্যায়ে পড়তে পারে। কিন্তু যা সত্য তাকে মানতেই হবে। তারপর নুতন সত্য যদি কেউ আবিষ্কার করেন করবেন।

একটি বিষয় পুনরুত্থাপন করি। বাউলের সঙ্গে বৈষ্ণবদের একটা তত্ত্বগত বা আবেগগত মিল তো আছেই, লালনসাঁইদের পদেও চৈতন্য-'নিলে'র কথা আছে, আছে কৃষ্ণকেলির কথা, রাইকিশোরীর ছলনার কথা। আধুনিককালের বাউল লক্ষ্মণদাসের গৃহে আতিথ্যের সূত্রে রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ পূজাও তো শ্রী চক্রবর্তী প্রত্যক্ষ করেছেন। সহজিয়া আর জাতিবৈষ্ণবের একই গোত্র—অচ্যুতানন্দ গোত্র। কিন্তু বাউলের তো কোনো জাত নেই, গোত্র নেই। তবে এরা কী? বাউল না বৈষ্ণব? নাকি আধা বাউল আর আধা বৈষ্ণব? লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ্-র পদ উদ্ধৃতও হয়েছে—

বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই
বাউল ধর্মের মানে বৈষ্ণবের যোগ নাই।
বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব

পঞ্চতত্ত্বের করে জপতপ
তুলসী মালা অনুষ্ঠান সদাই।
বাউল মানুষ ভজে
যেখানে নিত্য বিরাজে
বস্তুর অমৃতে মজে
নারীসঙ্গী তায়।

বৈষ্ণবেও তো নারীগামী, এমনকী বাউলসঙ্গিনীও তো বোষ্টমি নামেই চিহ্নিত। এই পার্থক্য বা মিলটা এই গ্রন্থে আলোচিত হলে ভালো হত। আমার কানে তো এখনও বাজছে শৈশবের শোনা সেই গান—

এল রে চৈতন্যের গাড়ি
সোনার নদীয়ায়
রাই কোম্পানি টিকিটমাস্টের
টিকিট পাওয়া দায়।

আমার মনে হয় বাউল সাঁই দরবেশ বৈষ্ণব কর্তাভজা সাহেবধনী—এরা যেন দোল খেলছেন, হাতে পিচকারি। কার রং যে কার গায়ে লেগেছে ধরা কঠিন বটে।

বঙ্গদর্শন-৪
জানুয়ারি-জুন ২০০২

ক. ৭. ৩ আলোচক : **রমাকান্ত চক্রবর্তী**

সমগ্র বিশ শতক ধরে বাউলদের সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছে, তাতে এই মনে হয় যে, বাউল ধর্ম আর 'গৌণ' ধর্ম নয়। ভারতীয় ধর্মসমূহের 'বৃহৎ ঐতিহ্য' দিল্লীর মোতিলাল বাণারসি দাসের মতো বড় প্রকাশকরা বেশ কিছু বিদেশী গবেষকদের প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ প্রকাশ করে গবেষণার স্তরে বা আলোচনার স্তরে টিকিয়ে রেখেছেন। বঙ্গে 'বৃহৎ ঐতিহ্য' বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থাদির প্রকাশনা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (দ্রষ্টব্য, কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত পুস্তক প্রকাশনার ডাইরেক্টরি।) কিন্তু বাউল-ফকির ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণার ধারা উভয় বঙ্গে অব্যাহত।

সুধীরবাবুর বইটি পড়লে এর কারণ বোঝা যায়। তিনি ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'গৌণ'-ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়নে রত। বলা যায়, এটাই তাঁর জীবনসাধনা। বঙ্গের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাউল-ফকির তত্ত্ব বিষয়ক বহু নিবন্ধে প্রবন্ধে তত্ত্ব জানা গেলেও বাউল-ফকিরকে জানা যায় না। আমরা সরহের দোহাকোষ জানি, লুই পাদ, গুণ্ডুরীপাদ, কাহ্ণ, ভূসুক প্রভৃতি সাধকদের দ্বারা রচিত চর্যাগীতি পড়ি। কিন্তু তাঁদের তো জানি না, সুধীরবাবু সেই জানার কাজই করে চলেছেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই কাজ

করেছেন শক্তিনাথ ঝা এবং মানস রায়। প্রাচীনকালে যাঁরা দোহা ও চর্যাগীতি রচনা করেছিলেন, এ সব আধুনিক গবেষণার আলোকে 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'।

সুধীরবাবুর এই বই, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনা পড়ে মনে হয়েছে, শুধু বাউল-ফকিরদের আকর্ষণ নয়, তিনি গ্রামবাংলার রোমান্টিক আকর্ষণও বোধ করেন। আলোচ্য বইতে গ্রামবাংলার বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য আছে কেননা আজ তিনি যা দেখেছেন, দ্রুত নগরায়ণে বৈদ্যুতিক প্রবাহে কাল তা অন্যরকম হয়ে যাবে। বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, এই ভাবটিও আছে। কলকাতার কোনো বিখ্যাত মঞ্চস্থ বাউল, আর রাঙামাটির পথের বাউল যে একটু ভিন্ন সুধীরবাবুর বিবরণে তা স্পষ্ট।

গ্রন্থটির প্রথম নয়টি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বাউল-ফকিরের বিশিষ্ট বাস্তু-সংস্থান, ঘর-সংসার, এবং জীবনের ধারা। সাধনার ইতিহাস সামান্যভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে তাঁদের ধর্মমত এবং ধর্মাভ্যাস। এটা ধর্মবিষয়ক অধ্যয়নের মার্কসীয় পদ্ধতির একটি নিদর্শন বলে মনে হয়। লেখক অবশ্য 'আত্মপক্ষ'-তে বলতে চেয়েছেন যে, কোনওরকম Methodology-র 'বাধ্যতা' তাঁর ছিল না। সম্ভবত তিনি এই বলতে চেয়েছেন যে, কোনও সুনির্দিষ্ট 'তত্ত্ব' প্রমাণ করার জন্য তিনি গৌণ ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেননি। জ্ঞানার্জনের জন্যই তিনি তা করেছেন। কিন্তু মার্কসীয় মত অনুসারে বস্তুর সঙ্গে তত্ত্বের ও তত্ত্বাভ্যাসের সম্পর্ক এই বইতে উদঘাটিত হয়েছে। অনেক বাউল ফকিরের গানেই অসহায়, দরিদ্র, দুঃখী মানুষের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। বাউল গায়ক যখন উচ্চস্বরের শেষ প্রান্তে এসে গানের টান শ্বাস বন্ধ হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত ধরে রাখেন, তখন তা করুণ আর্তনাদ হয়ে যায়। লালন ফকিরের প্রায় প্রতিটি গানেই আর্তি, দুঃখ, অভাববোধ, 'কিছুই হল না'—এই ভাব প্রকাশিত। এটা তো বোধ হয় মার্কস-কথিত 'Sigh of the oppressed'।

যেহেতু সুধীরবাবু সবকিছুই নিজ দেখেশুনে লিখেছেন, তাই গ্রন্থটি পাদটীকা কন্টকিত নয়। এমনকী উদ্ধৃতির উৎস পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। সহায়ক গ্রন্থাদির উল্লেখ যৎসামান্য। এগুলো ত্রুটিরূপে বিচার্য হতে পারে। কিন্তু লেখকের বিবরণ সুগভীর অনুভবসমৃদ্ধ। বাউল-ফকিরের ঘরবাড়ির খোঁজ করা, সেখানে যাওয়া, প্রয়োজনে অখাদ্য ভক্ষণ, অপেয় জলপান, প্রয়োজনে সেখানে রাত্রি বাস, মশকদংশন ভোগ, তাঁদের কথা শোনা, রেকর্ড করা—এ সব সুধীরবাবুর মতো ক'জন করতে পারেন, বা সহ্য করতে পারেন, জানি না। বইটির শেষভাগে আছে বাউল সাধক, গায়ক ও নারীশিল্পীদের পঞ্জি, বাউল গানের নানা বর্গ, বাউল-ফকিরি গানের সুর প্রসঙ্গে আলাপচারি, এবং বাউল-ফকিরি গানের স্বরলিপি। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'ফকিরের জবানি' (পৃ. ২৪৫-২৫৯) এবং 'ফকিরের আত্মকথা' (পৃ. ২৬১-২৮৯)। ক্ষেত্রকর্ম থেকে উপলব্ধ এ সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা ফকিরকে কীভাবে দেখি, এ প্রশ্ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফকির নিজেকে যেভাবে দেখেন, তা জানা দরকার। সুধীরবাবু এসব বিবরণের দ্বারা বাউল-ফকির বিষয়ক প্রচলিত গবেষণা সমৃদ্ধ করেছেন।

'গৌণ'-ধর্ম বিষয়ক সুধীরবাবুর রচনাবলিসহ আরও কয়েকটি গবেষণাভিত্তিক বই ও

প্রবন্ধ পড়ে এমন মনে হয় যে, 'গৌণ' ধর্মের একটি মৌল লক্ষণ 'রোগ নিরূপণ বিদ্যা'-সম্মত, অথবা pathological যৌনতা। হয়তো আমার এই কথা পড়ে অনেকে রাগ করবেন। কিন্তু কথাটা সত্য। কর্তাভজা-ধর্মমত বিষয়ক একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী এই মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, যৌনতা বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতির এক অদ্ভুত স্বভাব। (দ্রষ্টব্য, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫)। এই 'অদ্ভুত স্বভাব' পূর্বগানুকৃতি বা atavism রূপে বাংলার বহু গৌণ ধর্মে দৃশ্যমান। মুখ্য ধর্মও যৌনতালাঞ্ছিত। ধর্মীয় যৌনতা মানসিক এবং ব্যবহারিক। মানসিক যৌনতার অসামান্য নিদর্শন বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' এবং 'সম্ভোগ' বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলি। ব্যবহারিক যৌনতার নিদর্শন কৌলতান্ত্রিক ভৈরবীচক্র, সহজিয়া বৈষ্ণবদের নায়িকাসাধনা, কিশোরীভজন, এবং বাউলদের 'রসের ভিয়ান', 'আঠার দণ্ড নিশা', ইত্যাদি। শক্তিনাথ ঝা 'বস্তুবাদী বাউল' (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯) নামক গ্রন্থে বীর্যরজমূত্র পানের, মল ভক্ষণের, দেহে মললেপনের, যৌনাঙ্গ লেহনের, পায়ুমৈথুনের, এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অবাধ সহবাসের উল্লেখ করেছেন। বীর্যপাতরোধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা সহবাসে ব্যাপৃত থাকা একটি ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। দুঃখের বিষয়, কোনও গবেষক বাউল-ফকিরের এই শৈশ্ম্য-কৃষ্টির সঙ্গে বাউল-ফকিরের কোন কোন গানে প্রতিফলিত উচ্চভাবের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে দেখাতে পারেননি। উচ্চভাবের অন্তরালে যে অদ্ভুত স্বভাব ক্রিয়াশীল, তাকে যেমন 'বস্তুবাদ' বলে মাথায় তুলে নেওয়া যায় না, তেমনি গরিব মানুষের গৌণ ধর্ম বলেও প্রতিপালন করা অসম্ভব।

বাউল গানের ও বাউল সুরের বিশিষ্টতা, বা বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু 'রসের ভিয়ান', 'আঠার দণ্ড নিশা', এবং অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ বা সংবর্ধিত করেনি। বাউল ফকিরদের মধ্যে লালন ফকিরের গুরু বা শিক্ষক সিরাজ সাঁই, লালন ফকির, পাঞ্জ সাহ, দুদ্দু সাহ হাউড়ে গোসাঁই প্রভৃতি সাধকগণ যৌনতাকে উচ্চতর সাধনার স্তরে পৌঁছাবার উপায়রূপে ব্যবহার করেছিলেন। লালনের বহু গানে কাম কলুষিত চিত্তবৃত্তি এবং রিরংসা নিন্দিত হয়েছে। এ সব সাধকের জীবনব্যাপী সাধনায় যৌনতাই প্রথম ও শেষ কথা ছিল না। কিন্তু যৌনতা যখন একটা ধর্মীয় আচারে রূপান্তরিত হয়, তখন গুরুনামধারী পুরোহিতগণ ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বের মধ্যে রেখে নিজেদের কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বে সাধনসঙ্গিনীদের স্থান অতি বিশিষ্ট হলেও তাদের কোনও স্বাধিকার থাকে না। বাউল-ফকিরদের অদ্ভুত স্বভাবগ্রস্ত মতবাদ পুরুষ গুরুদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং ব্যক্ত হয়েছে। বাউল সাধিকাদের জননী হবার অধিকার নেই। তাঁরা যন্ত্র মাত্র।

সুধীরবাবুর বই পড়ে আরও একটি কথা মনে হয়। আদিরসাত্মক বৈষ্ণবতা ক্রমশ জনসমর্থন হারিয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যে বঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ জনপ্রিয় ছিল, তার প্রমাণ আছে। এখন আর তার দেখা পাওয়া ভার। অঘোরী বাবা এবং 'খণ্ডানন্দী' চক্রভৈরব এখনও আর আছেন কী না, জানি না। 'শিষ্যা বিলাসী' কিশোরী ভজনের গুরু এখন আর নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যযুগে যাঁরা বলেছিলেন,

'বিবাহিত পরিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চনে' (দ্রষ্টব্য, 'নিরুত্তর তন্ত্র'), এবং যে সকল 'সাধক চক্রবর্তী' আকণ্ঠ 'হালা' (কড়া মদ) পান করে 'বেশ্যালতা'-দের 'গৃহে গৃহে' ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আর নেই। এমনকী বাউল-ফকির সাধক-সাধিকাদের সংখ্যাও যে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য, সুধীরবাবু তা দেখিয়েছেন (পৃ. ২৯৯-৩২৮)। শক্তিনাথ ঝা-উল্লিখিত 'পাটলি', 'চিন্তামণি', 'বনচারি' প্রভৃতি গুপ্ত সাধনাভিত্তিক সম্প্রদায় শুধু গবেষণায় দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে।

'দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল' জেনেই কোন কোন বাউল বিদেশে গিয়েছেন, এবং যাচ্ছেন, গান শুনিয়ে টাকা রোজগারের জন্য। তাঁদের বিচিত্র পোষাক ও নাচ দেখে, বিচিত্র গান ও বাজনা শুনে, সিন্ধুপারের বিদেশিনীরা আসছেন জয়দেবের মেলায়, বর্ধমানের বাউলের আখড়ায়, নবদ্বীপে বাউলের গোষ্ঠীতে। দু'একজন সাধনসঙ্গিনীও হয়ে যাচ্ছেন, কারণ 'অলজ্জিত প্রাচ্য'-র অদ্ভুত স্বভাবই কারু কারু পক্ষে একটা দুরতিক্রম্য আকর্ষণ। টাকা রোজগারের ধান্দায় বাউল সেজে মঞ্চে উঠে অশ্লীল গানও গাওয়া হয়। খেঁউড় সম্বন্ধে বাঙালি শ্রোতার কৌতূহলের সুদীর্ঘ ইতিহাসে 'দেহতত্ত্ব'- বিষয়ক ভগলিঙ্গাত্মক গানেরও স্থানও আছে। এ সবের উপরে আছে বাউল-বিষয়ক বিবিধ আলোচনাচক্র। তাতে যোগ দিলে বিনা পয়সায় ভালমন্দ পাওয়া যায়, অনেক কিছু দেখা যায়।

সুধীরবাবুর বইতে অনিবার্য এই অবক্ষয়ের চিত্র সুন্দরভাষায় অঙ্কিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, এখনও বাউল-ফকিরদের মধ্যে বেশ কিছু ভাল লোক আছেন। আর কতকাল তাঁরা থাকবেন—এটাই বইটির মৌল প্রশ্ন।

বারোমাস
শারদীয় ২০০১

ক. ৭. ৪ আলোচক : **অনিশ্চয় চক্রবর্তী**

বিশ্বের অন্য সব প্রান্তের মতোই গত এত দশক ধরে আমাদের দেশে খুব ধীর অথচ নিশ্চিত এক প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, বিশ্বায়নের। সেই নিশ্চয়তার ভেতর যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তা অন্য আর কিছুই নয়, ভোটের কথা মাথায় রেখে কতটা জনতোষণ কতক্ষণ, কীভাবে অব্যাহত রাখবে, তাই নিয়ে শাসকদলগুলির সিদ্ধান্তহীনতা বা পুরনো পথেই থেকে যাওয়ার নিশ্চিন্তি, নতুন পথের দুনিয়াজোড়া তীব্র চাপ আর প্রলোভনের ভেতরেও। কিন্তু সরকারের এক্তিয়ার এড়িয়ে দিবারাত্রব্যাপী শ'খানেক টিভি চ্যানেলের রঙিন দৃশ্যে সজ্জিত ও প্রেরিত জীবন, জীবনকে প্রতি পলে অনায়াস করে তোলার আহ্বান বা প্ররোচনা জানিয়ে একের পর এক বিজ্ঞাপন, এখন বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে আর কোনও দেশজ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দিচ্ছে না। এখন বিশ্বায়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেবল ব্যক্তি, শুধুই ব্যক্তি, কখনও কখনও পরিবার পরিজনহীন ব্যক্তি। দেশ, সমাজ, সংসারহীন সেই ব্যক্তির জীবনে তখন না আছে কোনও জেলা বা রাজ্যের পরিচয়, না

আছে কোনও সংস্কৃতির নিজস্ব চিহ্ন। এমনই সর্বাত্মক ওই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় কেমন হয় আমাদের আঞ্চলিক সংস্কৃতির চেহারা, তাই নিয়ে এক মর্মস্পর্শী আলোচনা করেছিলেন জনাথন ফ্রেইডম্যান, তাঁর 'কালচাবাল আইডেনটিটি অ্যান্ড গ্লোবাল প্রসেস' বইটিতে, সেও তো গত দশকের প্রথমার্ধের উদ্বেগ। এক দশকে চেহারাটা আরও বদলে গেছে, এমন আশঙ্কা যেন প্রতিদিন পেয়ে যাচ্ছে চারপাশের জীবন থেকে মর্মান্তিক সমর্থন। বাণিজ্য এসে কীভাবে মুড়ে দিচ্ছে জীবন ও সংস্কৃতির আগাপাশতলা, এই নিয়েই যখন অবসাদে কাটে সংবেদনশীল মন, একটি-দুটি করে ব্যক্তিগত প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত জমা করে নিজেদের মনে জোর বাড়াতে হয়, তখন ব্যক্তিগত প্রতিরোধের আরেক দৃষ্টান্ত হিসাবেই যেন, আবিষ্কার করি একটি বই, সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল ফকির কথা'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বাউল ফকিরদের নিয়ে একটি সমাজবৈজ্ঞানিক বড় কাজের দায়িত্ব ১৯৯৬ সালেই দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীকে। 'বারোমাস' সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি যাঁরা পড়েছেন ততদিনে, অথবা 'প্রতিক্ষণ' বা 'এক্ষণ' সাময়িকপত্রে, তাঁরা মেনে নিয়েছেন ততদিনে, এই বিশেষ কাজটিতে সুধীর চক্রবর্তীর অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু ওই সব লেখাই তো ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ আর অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সেসব লেখার ভেতর আমরা তাঁর যাত্রাপথের গভীর নির্জনতায় এক আশ্চর্য, অচেনা জগতের হদিশ পাচ্ছিলাম, কেউ কেউ অভিভূতও হয়ে পড়ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সেই লেখাগুলোর ভেতর কোথায় যেন সমগ্রতার অভাব ঘটে যাচ্ছিল, খণ্ড খণ্ড সব অভিজ্ঞতা, লেখকের উপভোগ্য, অভিজ্ঞ মেধাবী পরিবেশন সত্ত্বেও, জুড়ে নিতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছিল। অথচ সেই খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলোর অভিঘাতও সামাল দিতে পারছিলাম না। এইসব দোলাচলেই যখন কাটছে আমাদের দিনগুলি, রাতগুলি, সুধীর চক্রবর্তীর অন্যান্য কাজগুলির হদিশ পাচ্ছি, মানুষ সাদরে সেসব গ্রহণ করছে দেখতে পাচ্ছি, তখনই এক দীর্ঘ, পরিশ্রমসাধ্য প্রস্তুতির আড়াল ভেঙে প্রকাশিত হয় 'বাউল ফকির কথা'।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যাবতীয় বিস্তার ও গভীরতা নিয়েও সেখানে পৌঁছানো যায় না, পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগরুক থাকেই, সুধীর চক্রবর্তী নিজেই তা শনাক্ত করেছেন চমৎকার, 'পাঠকদের অনেকে যেমন চমৎকার ও চমকিত হয়েছেন, তেমনই কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বইটি রোমান্টিক, অর্থাৎ স্বকল্পিত। সেটা অবশ্য নিন্দাছলে প্রশংসাই, কারণ এমন আলো আঁধারী দোলাচলের মরমি জীবনকে নিছক কল্পনায় ফুটিয়ে তোলা, সে তো সপ্রতিভ সৃজনশীলতার আর এক উচ্চারণ।' (আত্মপক্ষ। বাউল ফকির কথা। সুধীর চক্রবর্তী)। তাই, 'বাউল ফকির কথা' লিখতে বসে, অথবা পরিকল্পনার সময় থেকেই, লেখক সতর্ক ছিলেন বইটির উপস্থাপনা বিষয়ে, সেই সতর্কতা হয়তো কোনও কোনও লেখায় ধরে রাখতে পারেননি পুরোটা জুড়ে, তবু তাঁর মতো একজন মেধাবী অন্বেষকের সতর্ক থাকাটাই যেন যথেষ্ট ছিল এই বইটির পার্থক্যরেখা তৈরির ক্ষেত্রে। বইটির বিন্যাস নিয়েও নিজের স্পষ্ট মত ও অনুসৃত পদ্ধতি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন গোড়ায়, ওই

'আত্মপক্ষ' রচনাটিতেই। আর দশম অধ্যায় তিনি জুড়ে দিয়েছেন জেলাওয়ারি সাধক বাউল, গায়ক বাউল এবং বাউল নারীশিল্পীদের পঞ্জি। জুড়ে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ বীরভূম, বাঁকুড়া, নদিয়ার সাধক ফকির ও গায়ক ফকিরদের পঞ্জি। আছে, প্রচুর রঙিন ও সাদাকালো ছবি, বাউলদের নিজেদের পরিচয়বাহী কার্ডের প্রতিলিপি, আছে নানাবর্গের বেশ কিছু বাউল গানের এক সংকলন, যার মুখবন্ধের শেষে এক তথ্য, 'এর বাইরে আরও যে শত শত বাউল গান সংগৃহীত হয়েছে তা ধরা আছে টেপ-এ এবং লিখিত আকারে। ভবিষ্যতে কখনো সেগুলি সংকলিত হতে পারে।' আর আছে কয়েকটি গানের স্বরলিপি, বাউল-ফকির অধ্যুষিত বীরভূম, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্র। আর একটি সারণি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল, ফকির গায়কদের আর্থ-সামাজিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

কোনও সন্দেহ নেই বাউল অথবা ফকিরদের নিয়ে এর আগে বাংলা বা ইংরেজিতে যত কাজ হয়েছে, তার সবগুলিকে অভিজ্ঞতায় এবং বিস্তারে ছাড়িয়ে গেছে এই বই। সুধীর চক্রবর্তী নিজে পায়ে পায়ে বিভিন্ন গ্রাম, জনপদ, আখড়া, আশ্রম, ঘুরে-ঘুরে এতদিন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, এই বইটিতে সেই অভিজ্ঞতা, এতদিনের চর্চার অদ্ভুত সব তথ্য, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ সঙ্গে যোগ হয়েছে উপলব্ধি। আর আগে থেকে পরিকল্পনা করে তৈরি এক পদ্ধতির অনুসরণের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সংগ্রাহক, প্রতিবেদকের কাজও সুবিধামত জুড়ে দিয়েছেন তিনি, বা, বলা যায়, মিশিয়ে নিয়েছেন মূল কাজের ভেতর। বাউল আর ফকিরদের ফারাক, সাধক বাউল আর গায়ক বাউলদের প্রভেদরেখা ও বিভ্রান্তি। সেবাদাসীদের জীবন, সেই জীবনের উত্থানপতন, অন্য জীবনের হাতছানি, বাউলদের স্থানান্তরের মর্মান্তিক কিছু ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল, সবই তিনি তুলে ধরেছেন এক আশ্চর্য গভীর, সমৃদ্ধ, কখনও ঋজু কখনও ভারিক্কি গদ্যে। তাঁর দেখার ভেতর কখনও অনুপুঙ্খে উঠে এসেছে ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্তের ডিটেল, কখনও বা সমষ্টিগত বা আঞ্চলিক চলাচলের ছবি ও বিশ্লেষণ। 'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো, তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো'—শীর্ষক রচনাটি দিয়ে শুরু এই চারশ পাতার বইটি। কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে গৃহীত হল বাউল গান, কেমন সমর্থন তিনি দিলেন বাংলার বাউলদের, কোথায় শুরু হল তার গ্রহণ-বর্জনের সেই মনন, বাউলগানকে মনে হল একক মানুষের আন্তরিক উচ্চারণ, কেন চিনতে পারলেন না বাউলদের প্রচ্ছন্ন গোষ্ঠীজীবন, একক অথচ সংহত সমাজ—এই দিয়েই শুরু করে সুধীর চক্রবর্তী কীভাবে যেন পৌঁছে যান বাউলদের কাছে শান্তিনিকেতনের যে অবাক মর্যাদা ও আকর্ষণী, তার উদ্‌ঘাটিত অনুভবে। আবার 'যে নারী বিচিত্র বেশে' অধ্যায়ে তিনি যেন একটি আত্মমগ্ন রচনা উপহার দেন, আমাদের জানা হয়ে যায় আড়ংমাটার যুগলকিশোরের মেলা সন্নিহিত গ্রামের সুধাময় দাস বাউলের আশ্চর্য জীবনকথা, জানতে পারি মিনতির কথা, যে দিব্যি মেনে নিয়েছে অনিশ্চিত বাউল জীবনের ধূসর ভবিষ্যৎ, মিনতির নিজস্ব বোধে, ধূসর আদৌ নয়, সমুজ্জ্বল। বাধাবন্ধন নেই, আসাযাওয়া দু-দিকেই দরজা খোলা। স্বার্থবোধ নেই, কেরিয়ার নেই, সন্দেহবাই নেই। এগুলো সবই আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একচেটিয়া (পৃ. ১৬৩)।

'বাউল আর বৈষ্ণব এক নহে গো ভাই' অধ্যায়ে সুধীর চক্রবর্তী যেন এক সামাজিক ঐতিহাসিক সমাজতান্ত্রিক অন্বেষণকেই বেছে নেন, বিষয় হিসাবে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাইকমল' উপন্যাসের সূচনাপর্বের উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করে এই অসামান্য অধ্যায়টিতে রয়েছে ১৯৮৬ সালে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-র লেখা 'Hindu Castes and Sects' থেকে নেওয়া একটি মন্তব্য। রয়েছে আমহদ শরীফের নিজস্ব মূল্যায়ন। সুধীর চক্রবর্তীর তাঁর অন্বেষণের ভেতর থেকেই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা বজায় রাখেন। বাউল গানকে কোথাও কোনও শহুরে, বিদেশি প্রলোভন নষ্ট করে দিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে বাউলের নিজস্ব অন্তর্জগৎকে, তারও উদাহরণ আর সমর্থন পেশ করতে করতে লেখক এগিয়ে চলেন বড় কোনও কিছুর খোঁজে। প্রত্যয় থাকে তাঁর, নিজের কাজের প্রতি, সমাজের সৃষ্টি ও সংবেদনশীল মানুষের দায়বোধের প্রতি। বাউলদের সংজ্ঞা নিয়েও তিনি একাধিক তর্ক-বিতর্ক পরিবেশন করেন। বাউলদের চরিত্র, কর্মধারা ইত্যাদি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কে কীভাবে বাউলদের চিনতে চেয়েছেন, বাউল কি একটি মৌলিক শব্দ, নাকি নিষ্পন্ন শব্দ, বাতুল থেকেই কি বাউল, যে বাতুল শব্দের অর্থ পাগল, অথবা আত্মানুসন্ধানে ব্যাকুল থেকে কি বাউল, এসব তর্কবিতর্কের পাশাপাশি সুধীর চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন বাউলদের আচার-আচরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য বা ধারণা, যা অদ্ভুত। অক্ষয়কুমার দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন বনাম উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিতর্ক, মতপার্থক্য, সেসব থেকে উৎসারিত প্রশ্ন এই যে, বাউল গান বলে বিপুলাকার সংকলনবদ্ধ যে অজস্র গান আমরা হাতে পেয়েছি তার সব প্রামাণিক ও খাঁটি বাউলের রচনা কি আদৌ? (পৃ. ৭৮) নকল গানের ও শিল্পীর ভিড়ে প্রকৃত বাউল গানের কোণঠাসা হয়ে যাওয়ারর উদ্বেগ, সবই নিয়ে আসেন তাঁর আলোচনায়, সুধীর চক্রবর্তী দেখান, সত্যিই কীভাবে খ্যাতির, বিলাসবহুল জীবনের প্রলোভন, বিদেশ যাওয়ার, গাড়ি কেনার হাতছানি, বিদেশিনীর সঙ্গপ্রত্যাশা থেকে তৈরি হওয়া এক নতুন চেহারার বাউলরা এই প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসাই তৈরি করছে যে, বাউল কি ভাবে মনগড়া একটা মিথ অথবা আশ্চর্য জীবনযাপনের ধরন? রাঢ়ের বাউলদের অর্থ, কীর্তি, সফলতা, সচ্ছলতার বাইরে বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদের সাধক বাউলদের উপস্থিতিই, এসব সত্ত্বেও আশার দীপ জ্বালিয়ে রাখে চেতনার ভেতর। সাধন-সর্বস্ব একটি সম্প্রদায়ের পারফরমারে রূপান্তরিত হতে দেখার যন্ত্রণাও বাউল ফকিরদের কথা'র বিশ্লষণের ভেতর গভীরভাগে উপস্থিত। রয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অসামান্য সত্যবদ্ধ উপলব্ধির উদ্ধৃতি। এই আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে যে বিশ্বায়নের কথা লিখেছি, তার আশ্চর্য, অমোঘ চাপ ও উপস্থিতি কোথাও কোথাও গভীরভাবে বদলে দিয়েছে বাউলকে, তার গানকে।

বইয়ের দীর্ঘতম এই অধ্যায়টিতে বিদেশে, বিদেশিনীর প্রলোভনে কীভাবে চ্যুত হচ্ছে বাউল গান ও বাউলদের জীবনধারা, সে বিষয়ে দীর্ঘ দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে। আমবা বলহরির কথা জানতে পারি, সমীরের কথাও, লিকায়ত আলি বা অরুণ নাগের বিচার বিশ্লেষণ, মন্তব্যও উল্লেখ করেন সুধীর চক্রবর্তী। লেখেন বলহরি দাসের অসামান্য জীবনবৃত্তান্তও। আসলে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সুধীর চক্রবর্তী যেভাবে বাংলার বাউলের

সন্ধানে অক্লান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামে, গঞ্জে, জনপদে, মিশেছেন, জেনেছেন, দেখেছেন অজস্র বাউলকে, যাদের জীবনের, শিল্পের রঙ ও ঢঙ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলাদা, তারই স্বাভাবিক সৃজন এই বইটি, যার ভেতর রয়েছে অগুনতি চরিত্র, তাদের বাউল-কীর্তি ও চেতনা, তাদের জীবনের আশ্চর্য সব আখ্যান। কার্ত্তিক বেণীমাধব-বলহরি-সমীর রায়দের কথা তো আছেই, অধ্যায়ের শেষপর্বে আছে রবীন্দ্রনাথের কথা, যথাসম্ভব বিস্তারে, আছে বাউল-বিরোধী আন্দোলনের কথাও, যা গড়ে তোলা হয়েছিল লালন শাহ ফকির ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

'আপন সাধন কথা না কহিও যথাতথা' অধ্যায়ের শুরুতে সুধীর চক্রবর্তী এক ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বাংলার বাউলদের সামাজিক অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান ব্যাখ্যা কবেন। প্রয়োজনমতো অন্য সমাজতাত্ত্বিকদের লেখারও উদ্ধৃতি দেন। আর নিজে লেখেন, 'এক সময়ে সমাজস্রোতের বিরুদ্ধতা করেও বাউলরা নিজেদের অস্তিত্ব আর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল সেই বিশিষ্ট সমাজকাঠামোর জন্যই। আজ সেই সমাজকাঠামো নিজেই বিধ্বস্ত তাই তার ঔদার্যের অভাবে বাউলরা অনিকেত। মূল সমাজ চরিত্র আজ পরিবর্তনের ঝড়ে দিশালীন, তাই বাউলরা তাদের nonconformist ভূমিকা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়ে নানা ধান্দা ও চাতুর্য এমনকী বৈদ্যুতিন যন্ত্রব্যবহারের কৃৎকৌশলে ক্রিয়পর। একতারা আর এখন তাদের প্রতীক নয়, সহযোগী যন্ত্রও নয়—শো পিস। (পৃ. ১১৩) আর তারপরই চলে যান নিজের এত আশ্চর্য অভিজ্ঞতার জগতে, আমাদের সামনে তুলে ধরেন বাউল বৈষ্ণব প্রক্রিয়ার রোমহর্ষক বিবরণ। অনুপম দত্ত, কার্তিক দাসের লিখনে বা বাচনে যে অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে এসে পৌছয়, তা অভূতপূর্বই শুধু নয়, অভাবনীয়। রয়েছে সমাজ-নৃতত্ত্ববিদ মানস রায়ের লেখা 'The Bauls of Birbhum' (১৯৯৪) বইটি থেকে নেওয়া দেবীদাস বাউলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি ও অনুবাদ। অত্যন্ত সাহসী ও সংবেদনশীল এই অধ্যায়ে আমরা পাই বাউলদেব বেশ কিছু ক্রিয়াকরণ, যা গোপন এবং অন্যকে বলা নিষেধ। তাহলে লেখক নিজে তা জানলেন কী করে? বা 'বস্তুবাদী বাউল' গ্রন্থে শক্তিনাথ ঝা যেসব বিবরণ দিয়েছেন সেসবই বা তিনি পেলেন কোথায়? কেউ নিশ্চয়ই জানিয়েছেন বা বলেছেন। সুধীর চক্রবর্তী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, বিশ-পঁচিশ বছর আগে বাউল সাধকরা একটা আড়াল রাখতেন। এখন আর তেমন নেই, বাঁধ ভেঙে গেছে। অনেকে তো অনর্গল বলেই যান। কেন এমন হাওয়া-বদল, একটা উত্তর, বাউলদের সংবৃত্ত বদ্ধ সমাজ এখন ভেঙে পড়েছে, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে। অন্যটা হল, বাউল জীবন এখন আর আগের মতো নিন্দিত বা ধিকৃত নেই, চলছে অবাধ চলাচল। বাউল গায়করা প্রতিষ্ঠা ও অর্থের তাড়নায় ঢুকে পড়ছে নাগরিক সমাজে। আর নাগরিক সমাজও ব্যাপকহারে অংশ নিচ্ছে গ্রামের মেলা ও পার্বণে, বাউল গান যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চর্চার আওতায় এসে গেছে বাউলগান, তার সর্বস্ব নিয়ে। ননকমিউনিকেটিভ বাউলরা এখন আসতে চাইছেন মাস-কমিউনিকেশনের বৃহত্তর বলয়ে।

বাউল মত স্ফুরিত হয়েছিল অখণ্ড বাংলায়। প্রতিবেশী বাংলাদেশের কথাও তাই

বাউল প্রসঙ্গে আসা দরকার। ইসলামের জঙ্গি ভূমিকার সামনে বাউলরা বরাবরই বাংলাদেশের মাটিতে ক্ষয়িষ্ণু ও আক্রান্ত। বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ ভিক্ষেও করেন।

বাউল শনাক্তকরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লেখক। কোন বাউলকে আমরা শিক্ষিত সভ্য মানুষরা চাই? কোন্ বাউলকে আমরা প্রজেক্ট করছি? সে কি গরিব, ট্রেনে গাওয়া অসহায় বাউল? রঙিন পোষাকে নেচে কুঁদে আসর জমানো বাউল? আমরা কি সত্যিই শরিক হতে চাই সেই রুদ্ধগীত বাউলের, মৌলবাদী মুসলিমরা যাদের হাতের একতারা ভেঙে দিচ্ছে? আমরা কি সেই বিপন্ন বাউলের সামাজিক বন্ধু ও প্রতিবাদী? আমরা কি শুধুই জয়দেব কেঁদুলির মতো বার্ষিক মেলায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে গাঁজা খেতে চাই?

'বাউল ফকির কথা'ব শেষ অধ্যায় ' ফেরেব ছেড়ে কর ফকিরি'। আমাদের চেনাজানা জীবনের ভেতর থেকে কোনও প্রশ্ন বা তর্ক উসকে দেওয়ার অধ্যায় নয় আদৌ। বরং ফকিরদের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার মতোই এক সম্পূর্ণ অধ্যায়। বাউল-ফকির একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে আসলে যে ফকিরদের বিষয়েই আমাদের জানিয়েছে কম, বা বাউল আর ফকিরদেব একই গোত্রে বসাতে শিখিয়েছে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্যটিব মুখোমুখি হই আমবা। তবে জানতে পারি, ফকিরদের আজ পর্যন্ত কোনও সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠাব খবর নেই বাউলদের বিপরীতে। ফকিবদেব বার্ষিক জমায়েতে ছাত্রছাত্রী বা গবেষকদের দেখা যায় না তেমন। ফকিরদের গানের ক্যাসেটের সন্ধান বা প্রচার নেই। ফকিররা যেন সমাজের একপাশে, এককোণে পড়ে আছে। হিন্দু সমাজ বাউলদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি কখনও, মুসলমান সমাজ ফকিরদের ঘৃণা করেছে। ফকিররা শরিয়ত-এর আদেশ মানতে অস্বীকার করার ফলেই মুসলমান সমাজ ঠাঁই দেয়নি ফকিরদের। ফকিররা জীবনমুখী বৈরাগী নয়, গেরুয়া পরে না। দীনপোষাকে জীবন কাটায়। মসজিদে যায় না, রোজা রাখে না, বিয়ের ব্যবস্থা করছে নিজেদের মধ্যে, কবর দিচ্ছে নিজের জমিতে। এতে গোঁড়া মুসলমানদের ক্রোধ বাড়বেই। ফকিরদের একতারা ভেঙে, দাড়ি গোঁফ কেটে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে, সমাজে একঘরে করে, শরীরেও অত্যাচার চালায়। মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই সেক্ষেত্রে অস্তিত্বের শেষবিন্দু রক্ষা করতে হয় ফকিরদের। ফকিরদের জীবনের সঙ্গে প্রতিরোধ যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ফকিরদের সঙ্গে বাউলদের তফাৎরেখাটাও স্পষ্ট হয় ধর্ম, শিক্ষা, জীবন, শিল্প ও সমাজের নিরিখে। আসলে 'বাউল ফকির কথা' বাউলদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বা আলোকপাত করলেও ফকিরদের সম্বন্ধে যা জানায়, তা এর আগে এত গভীরে, এত বিশদে, এত স্পষ্টতায় জানার সুযোগ হয়নি। একই ভূগোলে, জেলা, প্রদেশ ভেদে যেসব সূক্ষ্মতর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক তফাৎ হয়ে গেছে, রয়ে গেছে, বাউল-ফকিরদের অস্তিত্বের বিকাশের, সৃজনের, আত্মবিস্মৃতির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এই আলোচনার সুবাদে, তা আমরা টের পাই। আমাদের সামনে তৈরি হয় যেন এক অন্য মানচিত্র। বাউল ও ফকিরদের, বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের আন্দোলনের। বাংলার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংস্কারমুক্তির আন্দোলনের। বাংলার নিজস্ব এক শিল্পভাষার, বিনোদনের

নিজস্ব এক ভঙ্গিমার মানচিত্র। এখন তো অস্তিত্বের সবদিক থেকেই ধেয়ে আসতে দেখি, অজস্র হাত, অক্টোপাসের মতো, আমার নিজস্বতাকে যে ভেঙেচুরে করে নেবে একেবারে নিজের মতো। এই গ্রহের কোথাও কোনও নিজস্বতা থাকবে না, কোনও ব্যক্তির, কোনও সমাজের, কোনও প্রদেশের, কোনও অঞ্চলের। আর এই নিজস্বতার অহংকার মাঝে মাঝেই ভেঙে যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, পদে, পুরস্কারে, বিদেশ বা বিলাসের প্রলোভনে এসবের সামনে ব্যক্তি বা কতিপয়ের প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণে। তাতে প্রতিরোধের জোর যেমন কমে, তেমনই বেড়েও যায় নিঃসন্দেহে। বাংলার বাউল ও ফকিরদের যে বিস্তারিত বিবরণ সুধীর চক্রবর্তী পেশ করেছেন পাঠকদের কাছে, তার বিস্তার ও গভীরতার সবটুকুর নাগাল পাওয়ার সামর্থ্য আমাদের মত নগর চেতনায় বেড়ে ওঠা পাঠকের কাছ না থাকলেও, বৃহত্তর পাঠকের কাছে এই বইয়ের আবেদন তো অনেক গভীরে, অনেক বিস্তারে। বাংলার বাউল যে বাংলারই, বাংলার ফকির যে মৌলবাদের বিরুদ্ধেই ধারণ করে চলেছে তার আপন অস্তিত্ব। বাউল-ফকিরদের এই বয়ানের ভেতর অঞ্চল, প্রকৃতি, মানুষ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাসের এক প্রতিরোধের স্বরূপ অন্তত আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। একজন বাউলও সমস্ত হাতছানি থেকে দূরে যতদিন নিজের সাধনধর্মে অবিচল, অচঞ্চল থেকে বাউলের পরিচয় বহমান রাখবেন, একজন ফকিরও যতদিন গ্রামচ্যুত, দেশচ্যুত হয়েও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবেন, এই প্রতিরোধের তাৎপর্য, শক্তি ও প্রাসঙ্গিকতা ততদিন, ততদিনই। এই প্রতিরোধের এমন তন্নিষ্ঠ, পরিশ্রমী, মেধা ও অনুভবদীপ্ত, বিশ্লেষণে উজ্জ্বল বয়ান এমন সময়ে হাজির করার জন্য কোনও সাধুবাদ, প্রশংসা বা পুরস্কারই সুধীর চক্রবর্তীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। জীবনের এক দীর্ঘতর সময় জুড়ে তিনি নিজস্ব আগ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছেন আখড়ায়, আখড়ায়, আশ্রমে, আশ্রমে। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা তাঁর জীবনে এসে পৌঁছল অনেক সময় পার করে। তবু সেই সহায়তাকে তিনি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে লিখলেন 'বাউল ফকির কথা'-র মতো আশ্চর্য, সমৃদ্ধ বই, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের বা নন্দিত ঐতিহ্যের পক্ষে তা যতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই এই ভূগোলের, এই সময়ের, এই মানুষের প্রতিরোধের ভাষা খুঁজে ফেরার কাজে। বাংলার বাউলের আত্মপরিচয় যে বারবার প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে পড়ছে, সে তো কিম্ভূত আন্তর্জাতিক হাতছানিতেই। বিশ্বায়ন যখন আমাদের প্রত্যেক আত্মপরিচয়কেই নষ্ট ভ্রষ্ট ঘোলাটে করে শেষ পর্যন্ত তা কেড়ে নিতেই চাইছে, নানা ছলচাতুরিকে আশ্রয় করে, তেমন সেই আত্মপরিচয় অক্ষত, অটুট রাখার প্রতিটি ব্যক্তিগত লড়াই-ই যে আমাদের প্রেরণা, প্রতিরোধের, তা সে ব্যক্তি যতই তুচ্ছ ইতিহাস বিধৃত করে, তাকে ম্লান করে দেওয়ার যাবতীয় প্রয়াসকে শনাক্ত করার কঠিন কাজটাই যে করেছেন সুধীর চক্রবর্তী। বিশ্বায়ন যখন কেড়ে নিচ্ছে আমাদের মনুষ্যত্বও, গ্রাস করছে বারে বারে, নানান অছিলায়, কপট মানবতার আড়ালে, তখন পৃথিবীর এই প্রান্তে, তা সে যত তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রই হোক না কেন, যদি শুধু মানুষেরই স্বরূপ খুঁজে বেড়াতে কেউ অবলম্বন করেন গানের ভাষা ও সুর, তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজটাও যে ভীষণ, ভীষণ জরুরি ওই প্রতিরোধের নিরিখেই। সুধীর চক্রবর্তীর এই

প্রতিরোধকে সম্মিলিত করলেই এই পরিশ্রমসাধ্য কাজটি সার্থব
এমন একটি কাজকে যাবতীয় সময় ও সামর্থ্য যোগানোর জন
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের। বইটির দাম এব
মনে পড়ার মতো ছাপার ভুল আছে বেশ কয়েক জায়গায়
সাধুবাদের যোগ্য। বাংলার বাউল ও ফকিরদের নিয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান ও
এমন সমগ্রতা যে আমাদের সত্যিই অচেনা ছিল।

যুবমানস
এপ্রিল ২০০৪

ক. ৭. ৫ আলোচক : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রবীন্দ্রনাথের দেখা 'গভীর নির্জন পথে' সুধীর চক্রবর্তীর ভ্রমণ দীর্ঘকালের। তাগিদটা ছিল তাঁর নিজেরই। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুগায়কও। বাংলার নিম্নবর্গের কিছু গৌণ ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে গানেই যাঁদের আত্মপ্রকাশ, তাঁদের অনেক চুপ কথা তিনি বিদ্বজনের গোচরে বিশদভাবে এনেছেন। এ কাজে তাঁর তুল্য দক্ষ গবেষক দেখি না। তবে এও সত্য, তিনি নিজেও মিস্টিসিজমের প্রবল অনুরাগী এবং জাত-রোমান্টিক। তাই তাঁর লেখায় গবেষণার আদল ছাপিয়ে কথাশিল্পের লালিত্যও ঝলমলিয়ে ওঠে।

আলোচ্য বইটি অবশ্য সরকারি লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যেগে লেখা। এই কেন্দ্রের ধন্যবাদ প্রাপ্য। তারা সমকালের বাউল-ফকিরদের জীবনচর্যা এবং সামাজিক অবস্থানের একাধারে বাস্তব তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক আখ্যান সংগ্রহের দায়িত্ব সুযোগ্য লোকের হাতেই দিয়েছিল। ফকিরি গানের তথাকথিত বাজার নেই তা ঠিক। তবে এই কেন্দ্রের সচিব মহোদয় নিশ্চয় এ-ও জানেন, ফকিরদের বাদ দিয়ে বাউলদের কথা লেখা চলে না। উভয় পক্ষই পরস্পর আত্মিক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। একই মুদ্রার দুই পিঠ। বাউল যেমন ফকিরি গান গেয়ে থাকেন, ফকিরও তেমনই বাউল গান শোনান। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একদা যিনি বাউল তিনিই ফকির ছিলেন। বাউলে-ফকিরে পাল্লাদারির আসরও বসত। এখনও বসে। আলোচ্য বইটি পড়ার পর আবার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত বই 'বাংলার বাউল এবং বাউলগান' পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, তিনিও 'হিন্দু বাউল-মুসলিম বাউল' কথাটি লিখেছেন। লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ হাসন রজা (হাসান রেজা চৌধুরি) প্রমুখেরও গানগুলি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত ৬৮০টি গানের সবগুলিই বাউল-ফকিরদের না হতেও পারে। তবে অনেকগুলি গান আমার শোনা। জাতবৈষ্ণব নবনীদাসের তথাকথিত 'বাউলগান' গাওয়া স্বাভাবিকই ছিল। তাঁর পুত্র পূর্ণদাসের পাশ্চাত্যে খ্যাতির পর বাউল ও ফকিরদের মধ্যে দুঃখজনক সাম্প্রদায়িক বিভাজনই ঘটে গেছে। তাই অধুনা বাউলের পঙ্‌ক্তিতেই ফকিরকে দেখে অনেকের ভ্রূ কুঞ্চিত হতেও পারে। শুধু বলতে চাই, তাঁরা বাংলার বাউল-ফকিরদের ঐতিহ্যকে যে ইংরেজিতে 'কম্পোজিট' বলা যায়, সে বিষয়ে অজ্ঞ।

নিয়াউল-ফকিরের ঐতিহ্যে একটা সমন্বয় ছিল বলেই জনৈক মৌলবি রেয়ামুদ্দিন 'বাউলধ্বংসের ফতোয়া' নামে কিতাব লিখেছিলেন। বাউলরা নিছক হিন্দু হলে দাঙ্গা বেধে যেত। ব্রিটিশ সরকারও বইটি বাজেয়াপ্ত করত। এই প্রসঙ্গটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। উত্তর রাঢ়ে শেরজান শেখ বাউল-এর একটি গান আমার এখনও মুখস্থ। এই জনপ্রিয় গানটি মুদ্রিত বর্ণমালায় এখনও আমার চোখে পড়েনি। 'পড়ে গউরলীলার বাজারে/অবাক যাই হেরে।। একটা মজার কথা/সূচের ছিদ্র/পার করে গজবরে।। একটা সাপে-নেউলে/একটা ইঁদুর-বেড়ালে/একই জায়গায় বসত করে/একই মেশালে। তা দেখে এক মড়া হাসে/গউরাঙ্গ রব করে।।' চমৎকার শেখ বাউলের জমাটি গানের একটি আশ্চর্য লাইন মনে আছে। 'মরা মানুষ পড়ল ধরা চিমতি (শ্রীমতী) ভাগীবথীতে।।'প্রকৃতপক্ষে বা ফকিরি উভয়ের অন্বিষ্ট 'মনের মানুষ'। তাই বাউল যখন বলেন, 'এই মানুষে মানুষ আছে বসে', তখন ফকির বলেন, 'মুর্শি ধরে বসে থাক মন/মক্কা দেখতে পাবি।।' উভয়েই গুরুবাদী।

লালন শাহ হিন্দু না মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু আমাকে অবাক করে, তাঁর একটি গানে 'বর্জোকি' (বরজখ) শব্দটি দেখে। এই আরবি শব্দটি শুধুমাত্র কোরানেই (কুর'আন) আছে। এর আভিধানিক অর্থ: যা দুটি জিনিসকে পৃথক করে, বেড়া, ব্যবধান। ইসলামি চর্চা কিংবা শরিয়াতবিদ কোরানের তকসির (টীকা) এবং হাদিসসূত্রে ব্যাখ্যা করেন, মানুষের মৃত্যুর পর থেকে 'রোজ কেয়ামাত' অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর তাদের পুনরুত্থান (রেজারেকশন) পর্যন্ত সময়কেই 'বরজখ' বলা হয়। এদিকে অষ্টম শতকের ভ্রাম্যমাণ মুসলিম সন্ত 'আশরারি'-রা বলেছেন, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বেড়া হল প্রকৃতি (নেচার)। তাই প্রকৃতিই 'বজরখ'। তা হলে বলতেই হয়, লালন কোরন পড়েছিলেন এবং ইসলামি শাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। লালন নামটিও বিতর্কিত। তবে বিতর্কে যেতে চাই না। আলোচ্য বইটি সম্পর্কেই এবার কথা বলতে চাই।

শ্রী চক্রবর্তী 'বাদশাহি এবং দরবেশি' পথ সম্পর্কে সুপণ্ডিত শ্রী গৌতম ভদ্রের কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওটা নিছক মনগড়া তত্ত্ব। ফকিররা সুফিদের দেখাদেখি নামের শেষে 'শাহ' জুড়ে দেন। শাহ ফারসি শব্দ। অর্থ সম্রাট। আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট, এই অর্থে (সাধুদের মহারাজ খেতাবের মতো) সুফিরা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফকির আরবি শব্দ। অর্থ ভিক্ষুক, গরিব ইত্যাদি। দরবেশ ফার্সি দারবিশ শব্দের বিকৃতি। ফারসি দার এবং সংস্কৃত দ্বার কগনেট শব্দ। দারবিশ অর্থ দ্বারে-দ্বারে ঘুরে যে খাদ্য সংগ্রহ করে। সোজা কথায় দরবেশ মানেও ভিক্ষুক। এ প্রসঙ্গে 'নেড়ার ফকির' কথাটি এসে যায়। ইসলামের ইতিহাসের আদ্যিকালেই ফকিরদের একটি আখ্যান আছে। হজরত মুহাম্মদ যখন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান, তখন তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু ভক্ত নিজেদের ভিক্ষুক অর্থেই ফকির বলতেন। ইসলাম প্রবক্তার এতে সমর্থন না থাকলেও এই সূত্রে প্রকৃতপক্ষে এঁরাই ইসলামে প্রথম 'মিস্টিক' বা মারিফাত। কালক্রমে এঁরা দুই দলে বিভক্ত হন। একদল নিজেদের বলতেন 'সালিক'। এঁরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করলেও ছিলেন 'বা-শরাহ' অর্থাৎ শরিয়াতপন্থী। অন্য দলের

নাম 'আজাদ' অর্থাৎ মুক্তি। এঁদের 'মজজুব'-ও বলা হত। ফারসিতে এঁরাই 'বে-শরাহ্'। এঁরা চুল-গোঁফ-দাড়ি-চোখের ভুরুও কামিয়ে ফেলতেন। তাই তাঁরা ছিলেন মজজুব অর্থাৎ নেড়া ফকির। এঁরা দেশবিদেশে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েন। এই সূত্র থেকে নেড়ার ফকিরের হদিশ মেলে। শ্রী চক্রবর্তী 'ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ' লিখেছেন। ইসলামে সঙ্গীত কখনই নিষিদ্ধ নয়। এক শ্রেণীর ওহাবি (উয়াহাবি) এবং এদেশি 'ফারজি'-পন্থীদের স্বেচ্ছাচার।.ইসলাম আরব ভূখন্ডে বিকশিত হয়ে ওঠার পর বরং সঙ্গীতেরও বিপুল বিকাশ ঘটেছিল। উটচালকদের গান 'হিদা', দীর্ঘ কাহিনীসংবলিত গান 'কমিদা', প্রেমসঙ্গীত 'গজল', ভক্তিসঙ্গীত 'কাউয়ালি'এবং 'শব্দ' ক্রমশ বৃহত্তর পারস্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল তারপর তা ভারতেও প্রবেশ করেছিল।

বাউল-ফকিরেরা নিজেদের তত্ত্ব বিষয়ে শ্রোতাকে মোহিত করতে অনেক কিছু অসম্বদ্ধ প্রলাপ আওড়ান, শ্রী চক্রবর্তী তা ভালই জানেন। এটা তাঁদের পেশাকেরই মতো রঙচঙে ব্যাপার। দেবীদাস বাউল-কথিত আখ্যান (১২৮-১৩০ পৃ.) কিংবা কার্তিকদাস কথিত আখ্যান (১৩৮-১৪১ পৃ.) সম্পর্কে সংশয় জাগে। এগুলি অতিকথা বলেই মনে হয়। যৌনবিজ্ঞান বিরোধী। এদিকে বাউলরা পুরুষের শুক্রকে বলেন 'বস্তু'। ফকিরেরা বলেন 'বিন্দু'। তাই বলে বাউলদের 'বস্তুবাদী' বলা চলে না। কারণ টার্মটি দীর্ঘকাল বাংলায় মেটিরিয়ালিজম অর্থে চালু হয়ে গেছে। তা ছাড়া নারীর ডিম্বকোষ থেকে নির্গত ডিম্বাণু সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা নেই। কোনও নারীর যৌনাঙ্গে শুক্র লেগে আছে কিনা, তা একমাত্র ডাক্তারই নির্ণয় করতে পারেন। দেবীদাস বাউল নিছক গল্প বলেছেন। অন্য দিকে বাউলদের যৌনাচার সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি বইয়ের উদ্ধৃতি (৭৪ পৃ.) অবৈজ্ঞানিক। 'দম' ফারসি শব্দ। অর্থ শ্বাসক্রিয়া। এ বিষয়ে হিন্দু যোগশাস্ত্রে আলোচনা আছে। কিন্তু শ্রী শক্তিনাথ ঝা-কে কোনও ফকির দম বিষয়ে যা-সব বলেছেন, তা উদ্ভট। বাউল-ফকিরদের স্বভাব মানুষকে তাক লাগানো। মূল কথা, তারা মিস্টিক গায়ক। আর বিশেষ কথা, আদিতে একতারা, ডুবকি এবং ঘুঙুরই ছিল তাঁদের বাদ্যযন্ত্র। দোতারা, গুপীযন্ত্র অবচীন।

এবার 'বাউল' শব্দটা নিয়ে কিছু বলতে চাই। বাউল শব্দের অর্থ কী, অভিধানকাররা এ বিষয়ে প্রায় এক রা। বাতুল > বাউল। বেরসিকরা বলতেই পারেন, তা হলে মাতুল 'মাউল' না হয়ে মামা হলেন কেন? অভিধানকাররাও বলতে পারেন, বিশেষ এক সম্প্রদায়কে 'বাতুল' বলতে বলতে শব্দটাও বিকৃত অর্থাৎ তদ্ভব 'বাউল' হয়ে গেছে। তা হলে তো তাঁদের প্রমাণের দায় নিতে হয়। দেখাতে হয়, বাউলদের একসময় বাতুল বলা হত। সে প্রমাণ মিলবে না। শ্রী চক্রবর্তী নিজেও বাউল শব্দের অর্থ খুঁজে ব্যাকুল হয়েছেন। তিনি 'আরবি-পারশি ভাষায় পণ্ডিত' হরেন্দ্রচন্দ্র পালের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'আউলওয়লী শব্দ থেকে আউল-বাউল শব্দের জন্ম।' আরবিতে 'ওয়ালিয়ি' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের বন্ধু বা সাধক। এর গৌরবার্থ বহুবচন 'আউলিয়া'। আউল-বাউল কথাটি অবশ্য আমার সুপরিচিত। এ থেকে বাংলা বাগধারায় 'এলেবেলে' শব্দটি এসেছে বলে আমার ধারণা। তাহলে আউলের অনুকার শব্দ হয়েই কি 'বাউল'-এর উদ্ভব? অবশ্য 'আউলওয়লী' এরকম কোনও শব্দ আরবি অভিধানে পাইনি। পূর্বোক্ত ওয়ালিয়ি বাংলায় বিকৃত হয়ে

ওয়ালি/ওলি হয়েছে এবং শব্দটি ব্যক্তিনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যাই হোক, বাংলায় অনুকার শব্দ মূল শব্দের আগেও বসে। যেমন আজেবাজে, অদলবদল। এদিক থেকে দেখলে আউলকেই বাউলের আগে বসা অনুকার শব্দ মনে হতে পারে। মোদ্দা কথা, সংশয়ের নিরসন হয় না। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যসংক্রান্ত পুঁথিতে 'বাউল' আছে, তা সত্য। 'বাউল-বোষ্টম' অবচীন কথা। বীরভুম ও মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ অঞ্চলে জাতবৈষ্ণবদের বসবাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'রসকলি' গল্পের বীজ কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের বেলেড়া গ্রামে। পরে সেই গল্প উপন্যাস করার সময় নেহাত কথার ছলে 'একতারা হাতে বাউলের আসার' কথা লিখেছিলেন। ('রাইকমল' থেকে শ্রী চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি।) সরোজ রায়চৌধুরির বিখ্যাত ট্রিলজি 'ময়ূরাক্ষী-সোমলতা-গৃহকপোতী'-তে জাতবৈষ্ণবরা আছেন। উত্তর রাঢ়ে তাঁদের বোরেগি-বোষ্টম বলা হয়। বরং বোরেগি কথাটাই বেশি চালু ছিল। তাঁর সঙ্গিনীকে অবশ্য 'বোষ্টুমি' বলা হত। আমার ধারণা, লোকভাষাব ভোকাবুলারি থেকে অর্থ হারিয়ে যাওয়া বহু শব্দের মধ্যে একটা শব্দ ওই 'বাউল'।

শ্রী শক্তিনাথ ঝা-র উদ্ধৃতিতে (১৪৬ পৃ.) আছে: 'শিষ্য বা মুরিদের আরবি প্রতিশব্দ বায়য়াৎ।' মুরিদ আরবি শব্দ। অর্থ: শিষ্য। বায়য়াৎ অর্থ 'শ্রদ্ধাভক্তি'। শ্রী চক্রবর্তী যাকে 'পঞ্চবেনা' (২০০ পৃ.) বলেছেন, তা হবে 'পাঞ্জেগানা' (ফারসি পাঞ্জ-ই গানা)।

এসব থাক। যে অসাধারণ উদ্যমেব ফলে শ্রী চক্রবর্তী 'বাউল ফকির কথা'র জন্ম দিয়েছেন তার ছিদ্রান্বেষী হওয়া অপরাধ। তবে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ল। আশা করি যথাসময়ে তা সংশোধিত হবে। বাউল ও ফকিরের আত্মিক সম্পর্ক চোখে আঙুল দিয়ে (ফকিরের আত্মকথা) তিনি দেখিয়েছেন।

শ্রী সুধীর চক্রবর্তী হাল আমলের বাউল-ফকিরদের প্রায় পূর্ণাঙ্গ একখানি ইতিহাসই লিখেছেন বলা চলে। সেই সঙ্গে তাঁদের রঙিন ফোটোগ্রাফ, বাউলদের আঁকা নানা তত্ত্বভিত্তিক ছবিও বইয়ে জুড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁদের নামধাম, গান ও গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও বইটিকে প্রামাণিকতা দিয়েছে। তিনি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিলেন, বাউল-ফকিরদের কথা তাঁর মতো করে খুব কম মানুষই বোঝেন, তা হোন না তিনি মহাবিদ্যাদিগ্‌গজ গবেষক। বীরভূমে কালক্রমে বাউলদের আবির্ভাব এবং সংখ্যাবৃদ্ধির কারণও শ্রী চক্রবর্তী দেখিয়েছেন। বীরভূমেই বাউলদের একচ্ছত্র ঐতিহ্য, এই মিথের উৎসে আছে পূর্ণদাসের পাশ্চাত্য খ্যাতি। বিবেকানন্দের পোশাকে সাজিয়ে নিয়ে যান। মজার কথা, বিবেকানন্দ ও পূর্ণদাসের ওই পোশাক একান্তই সুফি-পোশাক। এর পরের কথা সবার জানা এবং শ্রী চক্রবর্তী তা বিশদ জানিয়েছেন। ডলার এবং মেমসায়েবের লোভে সুকণ্ঠ ভেকধারী বাউলরা ক্রমে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বাউল-ফকিররা গাঁজা খান। বাউলদের গাঁজা যৌনাচার হিপি ঐতিহ্যের স্মারক। অতএব ওই পথের পথিক মেমসায়েব বাউলের সঙ্গ ধরবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একালে বাউলমেলা এবং সমঝদার বৃদ্ধির কারণ বোঝা কঠিন নয়।

আজকাল

৩০ মে ২০০৪

(খ) সংগীত

খ. ১. গানের লীলার সেই কিনারে

খ. ১. ১. আলোচক : **শঙ্খ ঘোষ**

গানকে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাঁর আত্মপ্রকাশের সব চেয়ে বড় বাহন, কিন্তু এক সময়ে মনে হতো যে সেই গান নিয়েই আমাদের কথা হয়েছে সব চেয়ে কম। আজ অবশ্য আর তা মনে হয় না। খুবই অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমরা হাতে পেয়েছি সনজীদা খাতুন সরোজ বন্দোপাধ্যায় বা অনন্ত চক্রবর্তীর মতো চিন্তাশীলদের বই, সুচিত্রা মিত্র আর সুভাষ চৌধুরীর অথবা সুব্রত রুদ্রের সম্পাদিত সংকলন, সুগতা সেন বা জয়ন্তী ভট্টাচার্যের মতো কোনো কোনো অল্পবয়সীরও লেখা, আর এই যেমন সুধীর চক্রবর্তীর 'গানের লীলার সেই কিনারে'র মতো একটি প্রবন্ধগুচ্ছ। দিলীপকুমার রায় বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরা একদিন বিচার করেছেন ভারতীয় রাগ-সংগীতের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রসংগীতের স্বাতন্ত্র্য, ইন্দিরা বা সরলা দেবীচৌধুরানীদের লেখায় জেনেছি নানা সময়ের কিছু স্মৃতিবিবরণ, কালিদাস নাগ বা জয়দেব রায়েরা লিখেছিলেন তাঁর গানের প্রাথমিক কিছু পরিচয় আর শ্রেণীকরণ, শান্তিদেব ঘোষের একাধিক বই থেকে তৈরি হয়ে ওঠে নির্ভরযোগ্য প্রায় এক সামগ্রিক ইতিহাস। কিছুদিন হলো এর সঙ্গে সমৃদ্ধভাবে যুক্ত হয়েছে প্রভাতকুমারেরও কালানুক্রমিক দুখণ্ড সূচী। ঠিক। কিন্তু তবু, দিলীপকুমার আর ধূর্জটিপ্রসাদ ছাড়া আর সর্বত্রই ঝোঁকটা কেবল বিবরণের, ইতিহাসের, তালিকার, শ্রেণীকরণের। এসবের পরেও আমাদের যে একটা অপূর্ণতার বোধ থেকে যায় তা এক শিল্প-আস্বাদের অভাবে, আলোচনার বলয়ে বড়ো রকমের কোনো পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে। ভরসার বিষয় এই যে আপাতত আমাদের ভাবুকদের দৃষ্টি পড়ছে সেই দিকটাতেই, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে একটা নতুন ধরনের ভাবনার আজ দরজা খুলছে মনে হয়। সুধীর চক্রবর্তীর বইটি সেই দিক থেকেই আমাদের আগ্রহের কারণ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথার ভূমিকা বড়ো, না সুরের ভূমিকা, এ নিয়ে দীর্ঘকালের তর্ক আছে, কবি নিজেও অনেক সময়ে ভেবেছেন এই আপেক্ষিক প্রাধান্য নিয়ে। তাঁর গান নিয়ে যেমন এই তর্ক, তেমনি তর্ক তাঁর গানের আলোচনা নিয়েও। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে ভাবতে গিয়ে কিসের বিচার করা উচিত? সুরের? না কথার? উচিত্য যাই হোক, এই সেদিন পর্যন্ত আলোচনার লক্ষ্য ছিল শুধু এ-গানের সুর—সেই সুরের কাঠামো, উৎস, আর ইতিহাস। কথার বিষয়ে চেতনা দেখা দিয়েছে অতিসম্প্রতি। সুধীর চক্রবর্তীর এই নতুন বইখানিতে আমাদের একটা সমগ্রতার তৃপ্তি লাগে, কেননা রবীন্দ্রনাথের গানের লীলার কিনার পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য সুধীর কথা আর সুরের সবরকম পথ দিয়েই এগোতে চান। পাঠক যে বইটি থেকে একেবারে সেই কিনারেই পৌঁছে যাবেন, এতটা নিশ্চয় লেখক নিজেও আশা করেন না। কিন্তু যেভাবে তিনি কবিতা থেকে গানে যাওয়া-আসা করেন;

যেভাবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ অথবা কীর্তন-বাউলের সঙ্গে তুলনা করে দেখেন রবীন্দ্রনাথের; কিংবা যেভাবে তিনি বার্নস আইরিশ মেলডীজ আর বাংলা লোকসংগীতকে এক সূত্রে বেঁধে নেন রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্লেষণ করবার জন্য; তাতে আমাদের অনেকটাই পরিক্রমণ হয়ে যায়। সুরের ভাঙাগড়া নিয়ে লেখেন তিনি 'রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব' 'কোন্ ভাঙনের পথে এলে' আর 'গানের দুই রাজা : রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট বার্নস, প্রয়োগগত সমস্যার বিচার পাই 'বাংলা নাটকের গান' আর 'পায়ে চলার শিল্পে বাক্যের শিল্প' লেখা দুটিতে; শিল্পরূপের তুলনামূলক বিচার আছে 'কবিতা ও গানের আকাশ : রবীন্দ্রনাথ' আর 'গানে ছবির প্রেরণা ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে, পরিপ্রেক্ষিতের চেতনা মেলে 'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ : বৃক্ষ ও বনস্পতি' আর 'রবীন্দ্রসংগীত · বাংলা গানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব' লেখায়; আর শেষ পর্যন্ত, 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া'য় খুঁজে পাই সেই মন, যার প্রকাশবেদনায় সম্ভব হয়েছিল এত-সব গান।

একেবারে শেষে বলা এই প্রবন্ধ দুটিকেই এক হিসেবে এ-বইয়ের সব চেয়ে জরুরি লেখা বলে মনে হয়। গানের জগতে 'বনস্পতি' আর 'সর্বস্ব'র ধারণায় যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে আমরা অনেকদিন ধরে জানছি। কিন্তু সুধীর চক্রবর্তী তাঁর বইটিতে সাহস করে এ-ইঙ্গিতও দিতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথেব গানে একটা সর্বনাশও লুকোনো আছে। এইখানে, এই প্রবন্ধে, আমরা এসে পৌঁছই এক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে, ধারাবাহিকতার বিচারে। 'রবীন্দ্রসংগীত নামক এক সম্পন্ন ও সোজ্জ্বল (sic) উত্তরাধিকার বাঙালি এখন ধ্বংসোন্মুখ কুলীন গৃহকর্তার মতো শুধু ভাঙছে আর খাচ্ছে' (পৃ. ৬৫), এই ভয়ংকর সত্যের কথা আমরা জ্ঞানে জানি না এমন নয়, কিন্তু লেখায় এর উচ্চারণ করি কম। প্রশ্ন তোলেন এই লেখক, গান নিয়ে 'এমন হবার কথাই কি ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? এতখানি নির্মনন পরিব্যাপ্তি, এতটা বেহিসেবী ব্যবহার?' (পৃ.৫৫) পুরনো গায়কেরা 'যৌবনের কণ্ঠলাবণ্য থেকে দ্রুত ভ্রষ্ট হচ্ছেন'(পৃ.৫৬), এদিকে 'বেড়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা' (পৃ.৬০)। অনেকটাই সুধীর বলেছেন এইভাবে, যেটুকু বলেন নি তা এই যে ব্যবসায়িক অতিব্যবহারের ফলে এ আর মঞ্চসাফল্যের 'সুনিশ্চিত চাবিকাঠি' হয়েও নেই, প্রেক্ষাঘরের শূন্যতাও বেড়ে চলেছে দিনে দিনে।

সর্বনাশকে কেবল প্রয়োগের দিক থেকেই অবশ্য ভাবেন না লেখক, ভাবেন সৃষ্টিসমস্যার দিক থেকেও। রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর এতটাই নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে যে আধুনিক বাংলা গানের বিকাশ সম্ভাবনাই হয়ে গেল রুদ্ধ। কবিতায় উপন্যাস নাটকে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার যে কাজে লাগে, গানের বেলায় তার কোনোই প্রকাশ দেখা যায় না কেন, এই প্রশ্ন তোলেন লেখক : 'জনপ্রিয় ডিসকো গান বা গজলের চটজলদি নতুন বাঙালি শ্রোতার বাইরে যে বিশাল সংগীতপ্রিয় বাঙালি জনসমাজ তারা কী গান শুনে তৃপ্ত থাকছে?' (পৃ.৭০) এখানে, শেষ পর্যন্ত লেখক দায়ী করেন রবীন্দ্রনাথকেই, কেননা 'নতুন সৃষ্টির দ্বার যেমন রবীন্দ্রসংগীত রুদ্ধ করে দিয়েছে, তেমনই তার সৃষ্টিগত উচ্চমানের রুচি আমাদের মনের তারকে এমন উচ্চ সুরে বেঁধে দিয়েছে যে যেমন তেমন গানের সৃষ্টিতে আমাদের মন ভরানো কঠিন,(পৃ.৭২)।

একটা প্রশ্ন অবশ্য বাকি থেকে যায় তবু। কবিতা নাটক উপন্যাসেও কি আমাদের মনকে উঁচু কোনো মানে বেঁধে দিয়ে যান নি রবীন্দ্রনাথ? বাড়িয়ে দেন নি কি পাঠক হিসেবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা? সেখানে যদি পরবর্তী প্রজন্ম কোনো নতুন কাজ করে থাকতে পারে, গানেই বা কেন নতুন কোনো স্রষ্টার দেখা মিলবে না তবে? সমস্যাটা কি তা হলে আরো কিছু? কবি আর সুরশিল্পীর একেবারে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে আধুনিক সময়ে। আধুনিক কবিতা বাস্তবতার ঝাঁপ দিতে গিয়ে সুর থেকে একেবারে আলগা করে নিতে চেয়েছে নিজেকে, আর তার ফলে কবিতা আর গান হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন জগৎ। কবি আর সুরস্রষ্টা নন, সুরস্রষ্টার সঙ্গেও নেই কবিতার কোনো যোগ। নতুন যুগের কবিতা আর নতুন যুগের সুরের এই দূরত্ব তৈরি হয়ে যাওয়াই হয়তো আধুনিক গানে রুচিবিহ্বলতার একটা কারণ হতে পারে।

'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া' প্রবন্ধটিতে এসে আমরা খুশি হই গানের ভিতরকার মনটিকে পেয়ে। প্রবন্ধটির প্রাথমিক উপস্থাপনায় অবশ্য একটু দ্বিধা আছে। 'রবীন্দ্রনাথের গানের কালক্রম ধরে তার থীমেটিক বা বিষয়গত দিকটি আমরা অনেক সময় দেখতে ভুল করি' (পৃ. ১১৫) : লিখেছেন সুধীর। 'দেখতে ভুল করি' মানে কি ভুলে যাই, না ভুলভাবে দেখি? মানে যাই হোক, এই ভুলের জন্য কেন আমাদের মনে হবে যে 'এই ভ্রান্তি বা ভ্রষ্টতা রবীন্দ্রনাথেরই বানানো?' (পৃ. ১১৫) গানগুলিকে 'গীতবিতান'-এ যদি তিনি 'পাঁচটি পর্যায়ের বিভাজনে' সাজিয়ে দিয়ে থাকেন, তাতে কালক্রমে অনুসরণের এ বিপদ দেখা দেবে কী ভাবে? বরং সেই 'থীমেটিক' সুযোগই তো তৈরি করে দিচ্ছেন কবি নিজে। শেষ পর্যন্ত লেখকের অভিযোগ এই হয়ে দাঁড়ায় যে ভাবগত দিক থেকে এ গানগুলির বিন্যাস 'আরও অনেক শিরোনাম এবং আরও অনেক সূক্ষ্ম অনুধাবন' (পৃ. ১১৬) দাবি করে।

'পাঁচটি পর্যায়ে'র মধ্যে এ রকম আরো কিছু 'সূক্ষ্ম অনুধাবন' অবশ্য 'গীতবিতান'-এর মধ্যে আছে। সুধীর নিশ্চয় মনে করতে পারবেন যে 'পূজা' অংশটি বিন্যস্ত ছিল আরো কুড়িটি উপভাগে, প্রতিটিরই ছিল ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু কথা তা নয়, কথা হলো : রবীন্দ্রনাথকে বিচার করবার গোটা রেখাচ্ছবিটা রবীন্দ্রনাথই তৈরি করে দিয়ে যাবেন, স্তরে স্তরে সবটাই তিনি সাজিয়ে দেবেন ভাবানুসারে, এ-রকম দাবি করা কি সম্ভব না সংগত? ভেবে দেখতে গেলে, 'দেওয়া নেওয়া'র মতো একটা বিভাগও যদি রবীন্দ্রনাথই করে দিয়ে যেতেন, 'গীতবিতান'-এ বিভাজনের 'ভ্রষ্টতায়' এটা যদি 'চোখ-এড়িয়ে যাওয়া' প্রসঙ্গ না হতো, তা হলে তো সুধীরের এই সমর্থ লেখাটিরও আর দরকার হতো না। এইটেই তো বরং সমালোচকের কাজ। নানা বয়সের নানা রচনার মধ্য দিয়ে একই অভিপ্রায়ের একটা সূত্র আবিষ্কার করা, পাঠকের মন-এড়িয়ে-যাওয়া কোনো ভাবনা দিয়ে শিল্পীকে আরো একবার নতুনভাবে উপস্থাপিত করা, সমালোচকের কাছে সেইটেই তো আমাদের প্রত্যাশা। 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া' প্রবন্ধে সুধীর আমাদের সেই আশাকে যে পূর্ণ করেন, সেইটেই বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় নেবার চেয়ে দেবার তাৎপর্য যে অনেক গূঢ়, দেবার

মধ্যে দিয়েই যে ঋদ্ধতর হয়ে ওঠে একজন মানুষ, বিসর্জন বা উৎসর্গ যে তাঁর কাছে ধ্রুবাত্মক কোনো বোধ, তাঁর সমস্ত রচনাতেই বিকীর্ণ আছে এর ইশারা। সুধীর বেশ-কয়েকটি গানের বিশ্লেষণ করে অনেকটা বিস্তারেই দেখান যে গানগুলির মধ্যে নানাভাবে ফিরে আসে আত্মোৎসর্জনের এই ছবি। কবিতাতেও আছে সেটা, তবে কবিতার সঙ্গে গানের প্রভেদ হলো এই : 'কবিতায় দেওয়া নেওয়ার তত্ত্ব খুবই স্পষ্ট, অত্যন্ত বিশদ-গানে দেওয়া নেওয়ার কথাটা যেন অনেক নিগূঢ় সংকেত বলা হয়' (পৃ. ১২৬)। থীমেটিক এই আলোচনায় সুধীর কালক্রমেরও ব্যবহার করেন। একটা সময় পর্যন্ত, তাঁর মনে হয়েছে, 'ভক্তভগবানের মধ্যেই প্রসঙ্গটি বলয়িত' থেকেছে, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের পর ভক্তভগবান-সম্পৃক্ত বিনিময়-প্রশ্ন তিনি আর গানে আনেন নি' (পৃ. ১২২), বিনিময়ের কথা এনেছেন তখন প্রকৃতি আর নামবজীবনকে ঘিরে, যেমন দূরদেশী রাখাল ছেলেটির দিয়ে-যাওয়া বাঁশি, অথবা নিদয়া সুন্দরীর নিয়ে-যাওয়া অশ্রুরসভরা ফল। অবশ্য, কালক্রমের একদিকে ভক্ত-ভগবান অন্য দিকে মানুষপ্রকৃতি, এ-রকম সাজানোতে যে স্বস্তি মেলে না সব সময়ে, সুধীর নিজেই তা বলেন। গীতাঞ্জলি-পর্বের 'আমাব সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' গানটি নিয়ে তাঁকে বলতেই হয় 'এ গানকে কি কিছুতেই আধ্যাত্মিক বলতে মন সাড়া দিতে পারে?' (পৃ. ১২৮) কিংবা ছত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ' গানটির বিষয়ে প্রশ্ন করেন 'এমন কী দায় আছে যে এখানে কাঙাল আর ভিখারি বলতে শুধু ভগবানকেই বুঝতে হবে' (পৃ. ১২৯)। তখন তো মনে হয়, সে-প্রশ্ন হয়তো-বা ভক্তভক্তবান-চিহ্নিত আরো অনেক গান প্রসঙ্গে উঠতে পারত, সেখানেও হয়তো পাওয়া যেত সেই বেদনা, যা 'মানুষের আপন ও নিভৃত অর্জন' (পৃ. ১৩৩)।

ভিন্ন অর্থে, এ বইয়ের আরো একটি জরুরি প্রসঙ্গ 'পায়ে চলার শিল্পে বাক্যের শিল্প'। রচনাটি নিয়ে লেখককে একটু পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করব, কেননা আশঙ্কা হয় এ-প্রবন্ধ একটু-বা দ্রুতরচিত। একাধিক পৃষ্ঠায় এখানে গদ্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র তারিখে ছাপা হয়েছে ১৯৩৪, বারে বারেই 'পরিশোধ' কবিতাটির উল্লেখ আছে 'কাব্যনাট্য' অভিধায়, আর নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদার'র (১৯৩৬) দু-বছর আগে দ্বীপময় ভারতে ভ্রমণের কথাটাও (পৃ. ১৭৭) এল নিশ্চয় অন্যমনস্কতারই ফলে। এ-রকম আরো বেশ-কিছু আছে, কিন্তু সমস্যা সেখানে নয়। সমস্যা এই যে, রবীন্দ্রনাথের কোন্ রচনাগুলিকে নৃত্যনাট্য বলা হবে তা নিয়ে অন্য অনেকের মতো এই লেখকেরও একটা অনিশ্চয়তা থেকে গেছে মনে হয়। 'নটীর পূজা'কেই যখন তিনি প্রথম নৃত্যনাট্য হিসেবে বর্ণনা করেন (পৃ. ১৭৩), তখনই দেখা দেয় বিপদের সূচনা। বিপদ এটা নয় যে একে তিনি নৃত্যনাট্য ভাবছেন, বিপদটা এই যে পরবর্তী বাক্যেই তাঁকে বলতে হচ্ছে, 'নটির পূজাকে অবশ্য কোনোভাবেই পুরোপুরি নৃত্যনাট্য বলা যায় না' (পৃ. ১৭৩)। যায় না যদি, তবে বলছেন কেন তিনি? 'পুরোপুরি' কথাটিরই-বা মানে কী? তবে কি আংশিক নৃত্যনাট্য বলেও কিছু হতে পারে? কোনো নাটকে একটি বা দুটি প্রবল নাচের প্রয়োগ ঘটলেই কি আমাদের 'নৃত্যনাট্য' অভিধার দরকার হবে আজ? এ-সব প্রশ্নের সংগত কোনো উত্তর ভাবতে গেলেই নৃত্যনাট্য শিল্পরূপটির

স্বরূপবিচারে পৌঁছতে হতো লেখককে, দ্বিধান্বিত কয়েকটি পরস্পরবিরোধী মন্তব্য থেকে তা হলে হয়তো নিস্তার পেতেন তিনি। 'শাপমোচনকে' 'নৃত্যনাট্য হিসেবে বেশ দুর্বল রচনা' (পৃ. ১৭৬) বলবার পরেই বন্ধনীতে তা হলে লিখতে হতো না 'এমন প্রশ্ন ওঠে, এটি কি আদৌ নৃত্যনাট্য' বা 'তাসের দেশ' বিষয়ে 'গান এ নৃত্যনাট্যকে জমিয়ে রাখে' বলেই ধীমান দর্শকের এই ভাবনা নিয়ে পীড়া বোধ হতো না যে 'এ নৃত্যনাট্যে নাচ কোথায়, কোন্‌খানে?' (পৃ. ১৭৬) এটা ঠিক যে রঙ্গালয়ে কখনোই 'তাসের দেশ সার্থক নৃত্যনাট্য হয় না' (পৃ. ১৭৬); কিন্তু এই লেখক আরেকটু এগিয়ে এসে আমাদের এও জানাতে পারতেন যে সেই ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যই নয়, নৃত্যনাট্য হিসেবে তার সফলতার তাই কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

পাঁচখানি নৃত্যনাট্যের তালিকা দিয়ে সুধীর তার দুটি প্রসঙ্গে (শাপমোচন আর তাসের দেশ। নটীর পূজাকে অবশ্য সংগতভাবেই তালিকা থেকে তিনি বর্জন করেন) বেশ দ্বিধায় পড়েন। এর কারণ কেবল এই যে সে দুটি— এবং এ-রকম আরো কয়েকটি—আমাদের শিথিল ব্যবহারে 'নৃত্যনাট্য' নামে চলে যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। এই প্রচলের বিরুদ্ধেই যে কথা বলতে চান সুধীর তা বোঝা যায় তাঁর এই প্রশ্নের উত্থাপন থেকে : 'তবে কি.....রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য আসলে গানেরই আরেকরকম প্রয়োগগত পরীক্ষা?' (পৃ. ১৭৮) অবশ্য এর কয়েক লাইন আগে 'নিঃসন্দেহেই' তিনি জানান যে এই নৃত্যনাট্য 'গীতাভিনয়ের আরেকটি উপায়'। মনে হয়, এই 'উপায়' কথাটির আরেকটু বিশ্লেষণে এলেই লেখক একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন, সাম্প্রতিককালের পক্ষে যে সিদ্ধান্তের ঘোষণা খুবই দবকার। তা হলে, প্রবন্ধশেষে লেখককে আবারও এই কথা বলতে হতো না যে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে আছে 'গানের ওপর নাচের আরোপ' (পৃ. ১৮৯)। আগে বলা ওই 'উপায়' শব্দটির সঙ্গে এই 'আরোপ' শব্দের নিশ্চয় একটা অসংগতিই ঘটে যায়? এই অসংগতির মীমাংসা করে নেন নি বলেই প্রবন্ধমধ্যে সুধীর লিখেছেন : 'অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবনের প্রারম্ভে গীতিনাট্য এবং সমাপন নৃত্যনাট্যে। একটু স্বচ্ছ দৃষ্টি মেললে কথাটার প্রতিবাদ উদ্যত হয়' (পৃ. ১৭৫)। কেন প্রতিবাদ? কেননা 'নৃত্যনাট্য তাঁর সংগীতপ্রতিভারই আরেক প্রকাশ' (পৃ. ১৭৫)।

কোন্‌টা নৃত্যনাট্য, আর কোন্‌টা তা নয়, তারও চেয়ে একটা মৌলিক প্রশ্ন এখানে উঠল। এটাকেই বলছিলাম শিল্পরূপ-হিসেবে নৃত্যনাট্যের স্বরূপবিচারের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে অথবা নৃত্যনাট্যে যে তাঁর সংগীত-প্রতিভার প্রকাশ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে একেবারে 'সংগীতপ্রতিভারই' প্রকাশ ভাবলে বোধ হয় সুবিচার হবে না। মুশকিল হয় এই যে এ-সব প্রসঙ্গে অগত্যা আমরা 'গান' বা 'নাচ' শব্দগুলির ব্যবহারে বাধ্য হই। এ-সব নাটকেও আত্মসম্পূর্ণ গানের ব্যবহার হতে পারে কখনো কখনো, যেমন হতে পারে 'রাজা ও রাণী' বা 'রাজা'র মতো নাটকে। গদ্যসংলাপ বা পদ্যসংলাপ চলতে চলতে কখনো দেখা দিতে পারে পূর্ণাঙ্গ কোনো গান। 'চিত্রাঙ্গদা'য় 'রোদনভরা এ বসন্ত' যেমন, অথবা যেমন 'শ্যামা'য় 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান' বা এইরকম আরো কয়েকটি। আত্মসম্পূর্ণ এমন কিছু নাচগান ছাড়া,

গীতিনাট্যে যা আছে তা হলো সুরময় সংলাপ আর নৃত্যনাট্যে যা প্রত্যাশিত তা হলো এর ছন্দোময় অভিনয়। স্বরের ছন্দ সুরে পৌঁছায়, শরীরের ছন্দ নাচে। নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে নাচগান কথাটার এইটুকুই মূল্য, আর সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল 'সুরের বোঝাইভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। এ—বাক্যের 'সুরের বোঝাইভরা' কথা গুলি লক্ষ করবার মতো। তেমনি লক্ষ করবার মতো ১৯২৭ সালে জাভাযাত্রীর এই পত্রাংশ : 'এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে'। 'কিন্তু' শব্দ দিয়ে বিচ্ছিন্ন এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির নাচের ধারণা আমাদের অনেকেরই চেতনায় আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে মনে হয়। অস্পষ্ট হয়ে আছে এই বোধ যে নৃত্য-নাট্যের নাচ হলো অভিনয়েরই একটা রীতিমাত্র।

এই একটি প্রবন্ধ নিয়ে এতটা কথা বলতে হলো এইজন্য যে সুধীর চক্রবর্তীর মতো সাংগীতিক বোধসম্পন্ন লেখকদেরই আজ এই দায়িত্ব, সাধাবণ্যে প্রচলিত ধারণাকে স্বচ্ছ কবে তুলবার দায় তো তাঁদেরই নিতে হবে আজ। এইসব বই তো তারই একটা সুযোগ।

বাবোমাস
শাবদীয় ১৯৮৫

খ. ১. ২ আলোচক . ধ্রুব গুপ্ত

রবীন্দ্রসংগীত বিষয় লেখাপত্র ইতিমধ্যে বিস্তর হয়েছে, শান্তিদেব ঘোষ বা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর মতো পথিকৃৎদের কাজের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে নি। সত্যজিৎ রায়ের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ ('এক্ষণ', ১৯৬৯) বা ঐ রকম দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে তাদের মোটের ওপর দু-তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : ১. প্রকরণ ও ব্যাকরণ ও শিক্ষাবিধি আশ্রয়ী রচনা, ২. বর্ণনাত্মক সাধারণ লেখাপত্র, ৩. গুরুপূজাকেন্দ্রিক ভাবাবেগ-প্রধান রচনা। সুভাষ চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসংগীতায়ন' (১ম খণ্ড, বিভিন্ন লেখকের রচিত কতিপয় প্রবন্ধ-সংকলন) এবং অরুণ ভট্টাচার্যের একটি বই ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা এ বিষয়ে তেমন কিছু হয় নি। সে কারণেই, এবং নিছক স্বগুণেও, সুধীর চক্রবর্তীর আলোচ্য প্রবন্ধ-সংকলনটি আমাদের বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। একাধারে সাহিত্যবোধসম্পন্ন, সংগীতজ্ঞ এবং গায়ক হবার ফলেই সম্ভবত এ ধরনের উৎকৃষ্ট বচনা লেখকের পক্ষে সহজ হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধেই লেখক সমসাময়িক আরো তিনজন বাঙালি সংগীতস্রষ্টার (দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত) সঙ্গে প্রতিতুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'সামগ্রিকতা' ও 'সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠা করেছেন। "বাংলা গানকে.....বন্ধ্যদশা থেকে উদ্ধার" (পৃ. ২)-এর এই অতুলনীয় সিদ্ধিকে তিনি তিনটি কৃতিতে বিশ্লিষ্ট করেন : (ক) প্রাক-রাবীন্দ্রিক বাংলা গানের অমার্জিত স্থূলতা দূরীকরণ, (খ) নাট্যসংগীতকে দূরে না রেখে তার মধ্যেই "সৃষ্টির

মহিমা ফোটানো", (গ) কথা ও সুরের শোভন মাত্রা রক্ষার সাহায্যে "পশ্চিমা (হিন্দি) গানের অনুকরণাত্মক দাপট রোখা"। ভিন্ন একটি প্রবন্ধে তিনি লোকসংগীত-কীর্তনের আত্মীকরণ এবং পাশ্চাত্য সংগীতের এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গান থেকেও রসদসংগ্রহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন বলেই সমগ্র বইটির পাঠক হিশাবে আমরা এখানে তার আলোচনায় সেই চতুর্থ কৃতিত্বের উল্লেখের অভাব বোধ করি না। এই সিদ্ধির অনুকূল কারণ হিশাবে দীর্ঘজীবন বা জীবিকা দুশ্চিন্তা মুক্তিকে চিহ্নিত করাকে ততটা গুরুত্ব বিনা দ্বিধায় আমরা দিতে পারি না, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদের অপেক্ষাকৃত খাটো মাপের কৃতিত্বের পেছনে তাঁদের জীবিকার জন্য জর্জরিত হবার ব্যাখ্যা একটু যুক্তিছুট পক্ষসমর্থনের (লেখকের নয়, ঐ স্রষ্টাদের) মতো শোনাতে পারে। তার চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথের 'সৃষ্টিশীল সংযত জীবন" (পৃ. ৩)-কে দায়ী করা শ্রেয়। নাগরিক প্রেরণায় বঞ্চিত বলেই রজনীকান্তর সৃষ্টি অতটা সীমাবদ্ধ, না সেটা তার নিজস্ব প্রতিভারই খামতি, সেটা এক কথায় বলা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের এই সার্বভৌমতার একটি বিশেষ ভিত্তির কথা লেখক সংগতকারণেই উল্লেখ করেছেন : "রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে ফিরিয়ে আনলেন আবহমান বাংলা গানের স্বভাব অর্থাৎ কাব্য ও গানের সমন্বয়" (পৃ. ১৬। কথাটা নতুন না হলেও রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় 'ক্লিশে' বর্জনের তাগিদে এড়ানো যায় না)। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শোকাহত সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি আমার চেয়ে বেশি বাঙালি ছিলেন।" সুধীরবাবুর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে এই "খাঁটি বাংলাগানের স্বভাব আত্মস্থ" থাকাতেই সত্যজিৎ রায়েব মতোই, তার চেয়েও ব্যাপক হয়ে অবশ্য, রবীন্দ্রনাথও একই যোগে খাঁটি বাঙালি এবং আন্তর্জাতিক ছিলেন। তাই ফরাসি মেয়ের চোখ বাংলাগানের এই সার্বভৌম সিদ্ধির অধিকারীর রচনা 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' শুনে সজল হয়ে ওঠে। এবং সুধীরবাবু যখন বলেন প্রতিতুলনায় "অন্তর্মুখিনতার কারণে" (পৃ.৭) এবং শুধু সুরকেই "ভাবপ্রকাশের পক্ষে নিরপেক্ষ (অর্থাৎ এখানে কথা-নিরপেক্ষ) আঙ্গিক" মনে করার দরুন অতুলপ্রসাদের গানের রূপায়ণ রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণের চেয়ে কঠিন (ঠিক তুলনা না করলেও এটাই তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয়), তখন তর্ক করতে ইচ্ছে করে না।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে অন্বিত করে পড়া উচিত পুস্তকের তৃতীয় প্রবন্ধটি ('রবীন্দ্রসংগীত : বাংলাগানের সর্বনাশ ও সর্বস্ব')। কী আদর্শে প্রবন্ধগুলির ক্রম নির্বাচন করা হয়েছে তা কিন্তু ভূমিকাতে স্পষ্ট করা হয়নি, এবং প্রবন্ধগুলিব রচনাকালও নির্দিষ্ট নয়—যেটা অভিপ্রেত এ ধরনের সংকলনে। যাই হোক, এই 'অত্যন্ত সময়োপযোগী প্রবন্ধে লেখক যাকে "আমাদের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অর্জন" বা রবীন্দ্রনাথের "সমস্ত সৃষ্টিশীল জীবনের নির্যাস" বলছেন (পৃ.১২) সেই রবীন্দ্রসংগীতকেই "মননহীন অপচয়ের সামগ্রী" (পৃ.৫৪) করে তোলার মধ্যে আধুনিক বাঙালির অসংস্কৃত মনোভাবের যে ঐতিহাসিক পরিচয় থেকে যাচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য, পুরাতন বাংলা গান পুনরুদ্ধারের নামে যে পচা বাবু-কালচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে (এটাই আসল 'অপসংস্কৃতি', যৌন সম্পর্কের সুচিন্তিত অবতারণা নয়) তাকে নির্মম ধিক্‌কার দিয়ে একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছেন।

কেননা দেখা যাবে, এই পুনরুদ্ধারের বারোয়ারি আসরে 'আধুনিক'দের মধ্যে নজরুল আছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-সমসাময়িক বা অল্প অনুজ দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্ত নেই, নেই ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য পরাক্রান্ত 'কম্পোজার'রা—একমাত্র চণ্ডীদাস মালের কণ্ঠেই তন্নিষ্ঠ টপ্‌পাকে পাই। অনুষ্ঠান বা 'occasion' উপযোগী গান গাইতে গিয়ে বাঙালি কী কাণ্ড করেন তার সংখ্যাতাত্ত্বিক সুলভ বর্ণনা আছে ৫৫পৃষ্ঠাতে। এবং এক্ষেত্রে এটিও যোগ করে দিলে লেখক ভালো করতেন যে এককালে গ্রামোফোন রেকর্ডের একচেটিয়াত্ব যাঁদের হাতে ছিল সেই ব্যবসায়ীরা 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে' এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের গানটিকে দেশাত্মবোধক গানের সংকলনে ছাপেন, সম্ভবত 'কেতন' কথাটির কৌলীন্যহেতু! এই 'সর্বনাশে'র সঙ্গে চাপা প্যান্ট বা চিকনের পাঞ্জাবি পরার কোনো আবশ্যিক যোগ আছে বলে লেখকের মতো আমার মনে হয় না, এর জন্য সর্বাংশে দায়ী আমাদের চিন্তাদৈন্যে, মস্তিষ্কের অলসতা, অভ্যাসের দাসত্ব, অনুভবের শূন্যতা; এবং সামগ্রিকভাবেই দূরদর্শনের হিন্দি সিরিয়াল-ভোজী শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এই ফিলিস্তিনিজমের বলি—তাই 'আঁতেল' গালাগালের এত খুচরো প্রচলন। এর সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কারণ অন্বেষণ অবশ্য পুস্তক লেখক বা তার আলোচক কারোই অন্বিষ্ট নয়। তবে "ধ্বংসোন্মুখ কুলীন গৃহকর্তা"-র রবীন্দ্রসংগীত ভাঙিয়ে খাবার এই নির্লজ্জ ব্যবসা সত্যই লেখকের মতো আমার চিত্তকে নিতান্ত পীড়িত করে। মনে হয় না নিজের গানকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এইভাবে 'সর্বত্রগামী' দেখতে চেয়েছিলেন, বা সুখেদুঃখে বাঙালি ঠিক এইভাবে তাঁর গান গাইবে ভেবেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই দেবব্রত বিশ্বাসের কথা তুলে লেখক আরেকটি উপযুক্ত কাজ করেছেন। শেষদিককার বিরক্তিকর আতিশয্য বাদ দিলে বর্তমান আলোচক 'জর্জদা'র গানের প্রতি সশ্রদ্ধ (তাঁর কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর গান শুনেও উত্তাল হয়নি কে?) এবং সে শ্রদ্ধা সংযতভাবে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছিল 'প্রমা' পত্রিকার পাতায়। কিন্তু তাঁর 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত' নামক নিতান্ত ছেলেমানুষি অভিমানী রচনা অবলম্বনে তাকে শহিদ বানাবার চেষ্টাও অশ্রদ্ধেয়। বিষয়টা আদৌ 'স্বরলিপি বিচ্যুতি'র নয়, গায়ন রীতির উৎকট নাটকীয়তা এবং দুঃখের বিষয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অমার্জিত ভঙ্গি প্রয়োগের এবং রেকর্ডে অশ্রাব্য যন্ত্র অনুষঙ্গের দৌরাত্ম্যের । মোহমুক্ত মনে, গুরুবাদকে প্রশ্রয় না দিলে 'আকাশ হতে খসল তারা' গানটির সুচিত্রা মিত্র কৃত ৮৩ সালের রেকর্ড এবং দেবব্রত বিশ্বাস কৃত ৭০ দশকের রেলদৌড়তুল্য রূপায়ণ পর পর শুনলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ (অন্ধভক্ত নয়) শ্রোতার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

রবীন্দ্রসংগীতের ভিন্ন ধরনের সর্বনাশী প্রকৃতি প্রসঙ্গে লেখক তিরিশের যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর "পথ রুদ্ধ করে আছে রবীন্দ্র ঠাকুর" এই আক্ষেপোক্তি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে পথরোধ করেন নি তা আজ তর্কাতীত ভাবে সত্য। তবে সংগীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐ 'সার্বভৌম' স্রষ্টা নিজে এমন কী দোষ করলেন যার ফলে তাঁর পর সৃষ্টির ধারা প্রায় নিরুদ্ধ হল? সেটা কি এই কারণে যে সংগীত সৃষ্টিতে পালাবদল অত চটজলদি হয় না? নাকি তিনি সত্যিই সম্ভাব্য পরীক্ষানিরীক্ষা সবই করে

ফেলেছেন, আর কারো জন্য কিছু বাকি রাখেন নি? নাকি, আসল কারণ প্রাক্ 'পথের পাঁচালী' পর্বের বাংলা চলচ্চিত্রের মতো সত্যকারের প্রতিভার অভাব? একেবারে সৃষ্টিকর্মে সক্ষম কেউ আসেন নি তা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা সলিল চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলা যাবে না, কিন্তু তার গুণ এবং ক্ষেত্র বড়ই সীমাবদ্ধ। হয়ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে একজন শোয়েনবার্গ বা স্ট্রাভিন্স্কির অভিঘাত এবং ভিন্ন ক্ষেত্রে একজন বব ডিলান বা জোন বায়েসের জন্য।

পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধে স্কটল্যাণ্ডের রবার্ট বার্নস এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনা করেছেন লোকসংগীত আত্মীকরণের ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্তে দেখান এখানেও রবীন্দ্রনাথ অধিকতর কৃতী। কারণ, বার্নসের মতো তিনি শুধু লোকগীতির ভাষা সংস্কারেই আবদ্ধ থাকেন নি, সে ক্ষেত্রেও স্বকীয়তার, নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। এ প্রবন্ধের কিছু কিছু উক্তি সম্প্রসারণ সাপেক্ষ—যথা "তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) হাতেই আমাদের লোকগীতির পুনরুজ্জীবন ঘটে" (পৃ. ২৬)। এর অর্থ কি এই যে তিনি বিস্মৃতপ্রায় বা মৃতপ্রায় লোকসংগীতের প্রতি বাঙালি দর্শকের মনোযোগ ফিরিয়ে আনেন, কবীর বা দাদূর ভজনের মতো? নাকি তাঁর নিজের সৃষ্টিতে লোকসংগীত পুনরুজ্জীবিত হল? প্রথমটি সম্পর্কে মতামত দেবার মতো ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে নেই, দ্বিতীয়টি একটু বিশদভাবে বলা দরকার। প্রচলিত লোকগীতি (যেমন লালনের 'কোথায় পাবো তারে') 'ভেঙে' তৈরি গানগুলি স্বদেশপ্রেমের গান হলেও, লোকগীতির চরিত্রে রচিত অনেক গান আছে যাতে স্বদেশ প্রেমের সম্পর্ক নেই। যেমন 'যা ছিল কালো ধলো' বা 'মন যখন জাগলি না রে' কিংবা 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেবো গো' ইত্যাদি। সুধীরবাবুর ঝোঁকটা এ ক্ষেত্রে একপেশে হয়েছে বার্নস থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য স্পষ্ট করবার জন্য। তাঁর আর নিজের গানে লোকসংগীত পুনরুজ্জীবিত হয় নি এই অর্থে যে লোকসংগীতাশ্রয়ী গানগুলিও নির্ভুলভাবে সফিস্টিকেটেড রবীন্দ্রসংগীত, লালনের গানের তালিকার পাশে অন্তর্ভুক্ত হবার মতো গান সেগুলি নয়। এবং তাঁর সবচেয়ে স্বকীয়তামণ্ডিত অনেক গানে রাগসংগীত, কীর্তন ও লোকসংগীতের এমন এক অভাবনীয় রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটে ('দিনের পর দিন যে গেল', 'আর নাই রে বেলা', 'সহজ হবি সহজ হবি') যে সেখানে লোকসংগীতকে আলাদা করে চেনা যার শুধু থিতিয়ে বসে বিশ্লেষণ করবার সময়, শুনে রসগ্রহণের সময় নয়। এ ব্যাপারে সুধীরবাবুর স্বীকৃতি বা মন্তব্যের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় সপ্তম প্রবন্ধ 'কোন ভাঙনের পথে এলে' অবধি। লোকসংগীত বা যে কোন গানেরই হোক, নিরন্তর পরিবর্তন ও পরিমার্জন তাঁর কাব্য বা নাটকের 'সংশোধনে'র মতো সরাসরি ভাবে 'জন্ম রোমান্টিকে'র অসন্তোষের সঙ্গে অন্বিত করার আগে ভাবতে হবে এর সঙ্গে মননশীল শিল্পীর পারফেক্‌শনিজম্ বা চির-নিরীক্ষা (সুধীরবাবু শব্দটি ব্যবহার করেছেন) রত রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত উদ্ভাবনী শক্তির সম্পর্ক বেশি প্রাসঙ্গিক কিনা। কারণ আমরা দেখি শেষ বয়সেও নৃত্যনাট্য রচনা, 'ল্যাবরেটরি' মতো গল্প লেখায় রত আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এক্সপেরিমেণ্টাল কর্মী রবীন্দ্রনাথ গদ্যে সুর লাগাবার বাসনাও চরিতার্থ করেন শুধু 'চণ্ডালিকা'তেই নয়,

'শাপমোচনে'র 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আবির্ভাব'—অরুণেশ্বরের এই সংলাপেও। আর গানের কথার পক্ষে যুক্তাক্ষরের বাহুল্য অচল এই স্থির সিদ্ধান্তে আসবার আগেও আমাদের 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর' বা 'প্রচণ্ড গর্জনে' গানগুলির কথা ভাবতে হবে, যেমন ভাবতে হবে "খেলো" (পৃ. ৮১) ভাষায় সুরযোজন্যার সম্ভাব্যতার সূত্রে চণ্ডালিকার 'কখন বা চুলো তুই ধরাবি'। তখন হয়ত 'কবিতা আর গানের আকাশ : রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামার অনবদ্য প্রবন্ধে—যাতে চারতুকের বাঁধন ও বিশেষ গানের বিশেষ ধুয়ো নিয়ে "সদাজাগ্রত বুদ্ধি" বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে—সেখানে প্রকাশিত "কুজ্ঝটিকা শব্দটিকে সুর খেলানো শক্ত" (পৃ. ৯২) এই মন্তব্য গ্রাহ্য হবে না।

নাটকের গান, নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য এবং সর্বশেষ প্রবন্ধ কীর্তনের প্রভাব পুস্তকটির বিশিষ্ট সম্পদ এবং এ সব ক্ষেত্রেও একাধিক মূল্যবান মন্তব্যের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু প্রসঙ্গ যা অন্য প্রশ্ন বা নতুন বিতর্ক তুলতে পারে। লেখক বলছেন, রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান প্রধানত বাইরেই গাওয়া হয় আর নাট্যপ্রযোজনায় সেগুলি হয় বর্জিত" (পৃ. ১৫৮। কর্তিতও হয়েছে কখনও কখনও)। এর একটা জবাব বোধহয় প্রযোজকদের পক্ষ থেকে দেওয়া যায় সুধীরবাবুরই ঐ প্রবন্ধেরই অন্য একটি বাক্যদ্বারা : ".....যত্রতত্র গান দিলে রসসৃষ্টি হয় না, বরং তাতে অনেক সময় নাটকের রস ক্ষুণ্ণ হয়" (পৃ. ১৫১)। "রবীন্দ্রনাথের নাট্যবিবেক ছিল অপেরা-নির্মাতার" (পৃ. ১৫৫) একথা কি তাঁর সব নাটককে একত্রে ভেবে বলা হয়েছে? যদি তাই হয় এবং তা মেনে নেওয়া হয়, তা হলে সেই বিবেকের সবচেয়ে অস্বস্তিকর ফসল সম্ভবত 'বাঁশরী'। যে অর্থে 'এফেক্ট মিউজিক' চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত, সে অর্থে 'তাসের দেশ' (তাকে নৃত্যনাট্য বলা হবে কিনা সেটাও তর্কাতীত বিষয় নয়)-এ 'এলেম নতুন দেশে' কি 'এফেক্ট সং' (পৃ ১৫৯)? আমার তো মনে হয় ওটা সংলাপ সদৃশই, এবং তাই এত সুপ্রযুক্ত, 'নটীর পূজা'র (এই নাটকটি বড় অবহেলিত বোদ্ধা মহলে) গানগুলির মতো। প্রকৃতপক্ষে নাটকে গান প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এতই নাট্যচেতনা বিরহিত হয়ে পড়তেন মাঝে মাঝে ('রূপকতত্ত্ব'র দোহাই দিয়ে মনে হয় না ঐ অনৌচিত্যকে সামলানো যায়) 'অচলায়তনে'র শোনাপাংশুদের মুখে মাদল বাজিয়ে 'উতল ধারা বাদল ঝরে'-র মতো একক অনুভূতির গান বসিয়ে দেন। সুধীরবাবু এটা লক্ষ করেছেন বলেই শেষে বলতে বাধ্য হন : "রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান বহুক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নাটকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ নয়" (পৃ ১৬৯)। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'-কে 'থীম্ সং' ধরে আলোচনাটি বিশেষ রকমের গ্রাহ্য, 'এফেক্ট সং'-এর ক্ষেত্রে যা নয়। নৃত্যনাট্যের আলোচনায় সম্ভবত এ কথা বলে নেওয়া ভালো যে রবীন্দ্রনাথ কম্পোজার ছিলেন, কিন্তু কোরিওগ্রাফার ছিলেন না, এবং নৃত্যের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধাবশত তিনি এ বিষয়ে বহুজনের সাহায্য নিতেন। প্রযোজনার সাধারণ দু একটি জিনিশ ছাড়া তাই এ বিষয়ে কোনো স্বরলিপির সদৃশ নির্দেশ নেই, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রযোজকদের স্বাধীনতার সুযোগ বেশি। দুর্ভাগ্যবশত এখানেও আমরা 'সর্বনাশ ও সর্বস্ব'-কে একত্রে পাই, যার স্বীকৃতি আছে

সুধীর চক্রবর্তীর এই মন্তব্যে : "বাংলা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলি এখন দাঁড়িয়েছে এক প্রথাবদ্ধতা (প্রথাটা কার দেওয়া?) ও একঘেয়েমিতে" (পৃ.১৭৫) এবং লেখক যথার্থই ধরেন, মাঝারি মাপের মানুষের 'নির্মননতা'-ই এর একটি কারণ, আরেকটি কারণ মঞ্জুশ্রী চাকীসরকার প্রমুখ ব্যতিক্রম বাদ দিলে ঐ কটি অসামান্য রবীন্দ্ররচনা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষমতা ও সাহসের অভাব এবং সে ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিকূলতার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের স্থান নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রেও প্রথমে একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদ প্রয়োজন (একরকম করে লেখক তা করেওছেন) : ১. ঐতিহ্যানুসারী বড় কীর্তন, আখর যুক্ত ('ওহে জীবনবল্লভ') এবং স্বকীয়তামণ্ডিত অসাধারণ কীর্তন আত্মসাৎ করা গান ('আমার না বলা বাণী'র, 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'পুরানো জানিয়া চেওনা')। দ্বিতীয় চরিত্রের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের অমূল্য সৃষ্টি, কিন্তু অতিপেলবতা থেকে রক্ষা করে তাকে গভীর ভাবসমৃদ্ধভাবে রূপায়িত করতে হলে একজন সুচিত্রা মিত্র বা নীলিমা সেনের স্তরের শিল্পীর প্রয়োজন হয়, কেন না বিশেষ সাহিত্যবোধ ছাড়াও গান ঠিকমতো গাওয়া যায় না একথা ঐ শিল্পীদের কণ্ঠে 'আর রেখোনা আঁধারে', 'কাঁদালে তুমি মোরে', 'বিনা সাজে সাজি' শুনলে প্রতীয়মান হবে। 'শুধু যাওয়া আসা'তে 'নব দুরাশায়' অংশে আত্মীকরণের স্বকীয়তা বাঙালি শ্রোতা ভুলতে পারবে না, যদি ঠিকমেতা গাওয়া হয়। আবার রাধারাণীর মতো প্রতিভাসম্পন্ন ঐতিহ্যানুসারী গায়িকাদের কণ্ঠে প্রবল ভাবাতিশয্য দেখা গেছে যা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। আকৃতি প্রকৃতিতে সংযম (ধ্রুপদের শাসনের ফল বোধহয়) হেতুই তিনি সত্যজিৎ রায় কথিত রাগসংগীত হজম করা বড় কীর্তন (যাকে সংগত কারণেই সত্যজিৎ লোকসংগীত বলতে গররাজি হয়েছেন জটিলতা, সমৃদ্ধি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্য হেতু) রচনা করেন নি ('ওহে জীবন বল্লভ' খানিকটা কাছাকাছি)। তবে 'দিনের পরে দিন যে গেল'-তে সঞ্চারীতে কোমল পর্দার প্রয়োগ আমাদের চকিত করে। "খাঁটি রাবীন্দ্রিক গানে (অর্থাৎ 'আমার না বলা বাণী' জাতীয় গানে) কীর্তনের ভূমিকা.....তাৎপর্যে" সত্যিই গভীর (পৃ. ১৯৭) এবং সুধীরবাবু যতটা মনে করছেন ততটা "পরোক্ষ" তা নাও হতে পারে। 'কোন ভাঙনের পথে এলে' প্রবন্ধে লেখক তথাকথিত 'ভাঙা গানে'ও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার চিহ্নের বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেন, যা আবার আমাদের কীর্তনাঙ্গ ও লোকসংগীতাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীতের স্বকীয়তার কথাই মনে করিয়ে দেবে। 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া' প্রবন্ধটির মান অন্যান্য রচনার তুলনায় কিঞ্চিৎ খাটো, এবং এটি নিছক কাব্য-আলোচনা মাত্র। আর, কোনো উদ্ধৃতিতেই সুধীর চক্রবর্তী সূত্রনির্দেশ দেননি।

পৃ. ৬৯-তে একটি মন্তব্য আছে : "রাজেশ্বরী ও নীলিমার মধ্যে মেলে একটা আলাদা শুদ্ধতা।" এই 'শুদ্ধতা' কিসের? স্বরস্থানের, ভাবের, না রবীন্দ্রসৃষ্ট সুরের বদল না ঘটানোর? এটা লেখক পরিষ্কার করেন নি এবং বর্তমানে স্বরলিপি সমস্যার প্রসঙ্গ ও কোথাও উত্থাপন করেন নি। একটি প্রশ্ন রেখে আমি এই পুস্তকের আলোচনা শেষ করব। আমরা জানি, রবীন্দ্রসংগীত মূলত 'কম্পোজার্স মিউজিক' (পশ্চিমী আদর্শে),

'পারফর্মার্স মিউজিক' নয়—যে অর্থে ভারতীয় রাগসংগীত এতকাল তাই ছিল। সে কারণেই স্বরলিপির প্রয়োজন। কিন্তু আকারমাত্রিক স্বরলিপির কি ক্ষমতা আছে একটি গানের সমস্ত সূক্ষ্মতা এবং ভাবসম্পদের চিহ্ন বহন করার? লয়ের নির্দেশ দুএক ক্ষেত্রে ছাড়া (লয় ফেরতা হলে, নৃত্যনাট্যে যেমন) কোথায়? যাঁরা স্বরলিপি করেছেন তাঁদের মনেও যে এ সংশয় দেখা দেয়, তার প্রমাণ ৫৯ সংখ্যার 'স্বরবিতানে'র কিছু গানের (শেষ বর্ষামঙ্গলের) তলায় 'বিশেষজ্ঞ' বা 'অভিজ্ঞ' শিক্ষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত পরামর্শ নেবার উপদেশে। গায়কের স্বাধীনতার বহুবিতর্কিত প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে উঠবেই, যা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবি রাখে। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে কারুকার্যবহুল জটিলতাবদ্ধ 'তুমি যেওনা এখনি' রেকর্ডের ওপরেও বিশ্বভারতীর চিরচেনা ছাপ, ঐ গানের অধুনা-প্রকাশিত শাদামাটা স্বরলিপিও (যেওনা র 'না'-তে হঠাৎ শুদ্ধ গান্ধার কেন?) ঐ ছাপ বহন করছে। তেমনি ছাপ রয়েছে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠের 'জানি গো দিন যাবে' গানের পালায়' ৭৮ ঘূর্ণনের রেকর্ডে এবং বর্তমান স্বরলিপিতে 'র্সা'র বদলে 'নি' সংবলিত ধুয়োর শেষ পর্দাযুক্ত অধুনাতন স্বরলিপিতে। কোন ইতিহাস সমর্থিত যুক্তিতে একটাকে আমরা অন্যটির চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করব? দুটোই ত পীঠস্থানের শিলমোহর করা! তা ছাড়া সুধীরবাবু অনেক গায়ক ও গায়িকার নাম করেছেন রবীন্দ্রসংগীতের যোগ্য শিল্পী হিসাবে। তাঁদের গায়কিতে প্রবল পারস্পরিক পার্থক্য। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সর্বজনগ্রাহ্য একটিমাত্র গায়কি আছে বা থাকা উচিত কী? সুধীর চক্রবর্তী কি ভবিষ্যতে কোনো প্রবন্ধে এ সব নিয়ে মননসমৃদ্ধ সংস্কারমুক্ত আলোচনা করবেন?

প্রতিক্ষণ
২ ডিসেম্বর ১৯৮৫

খ. ৭ বাংলা গানের আলোকপর্ব

খ. ৭. ১ আলোচক : পবিত্র সরকার

বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে যাঁদের কথা আমরা কান মেলে শুনতে বাধ্য এরকম দু'জনের লেখা দুটি বই পড়বার অভিজ্ঞতার কথা একে একে বলি। সুধীর চক্রবর্তী মূলত গানের দিক থেকে লক্ষ করেন গত ষাট-সত্তর বছরের বাংলা সংগীত-সংস্কৃতির কথা, তাঁর সাতটি রচনা মূলত স্মরণ ও বিশ্লেষণের সমাহার। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও নির্দিষ্টভাবে লক্ষ করেন রবীন্দ্রসংগীতকে, মূলত তার ভাষাপাঠে নিহিত আধুনিকতাকে। সেই সঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীতচিন্তাও তাঁর কাছে হয়ে ওঠে এক সংলগ্ন প্রসঙ্গ। তাঁর প্রধান রচনা এগারোটি, তার মধ্যে শেষ দুটি রবীন্দ্রসংগীতের সুপরিমিত সীমার বাইরে গেলেও খুব দূরে যায় না। দু'জন লেখকই তাঁদের রচনার এই দুই গ্রন্থনাকে বিশেষিত করেছেন পাঠকের জন্য। সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন, "রচনাগুলির মধ্যে ধরা আছে বাংলা গান নিয়ে আমার সদ্যতন ভাবনা ও বিশ্লেষণ।" আর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেই দিয়েছেন যে তাঁর লেখা মূলত "রবীন্দ্রনাথের গীতবাণী সম্পর্কে।" আমাদের জানা আছে যে, এই দুই লেখকের গান বা রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক রচনা শুধু এ দুটি গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের মনে হয় এ বই দুটিতে লেখকদের এই বিষয়ে (বা কাছাকাছি বিষয়ে) অন্যান্য গ্রন্থাবলির একটি তালিকা দেওয়া থাকলে পাঠকদের পক্ষে তাঁদের সমস্ত রচনা মিলিয়ে পড়বার সুযোগ তৈরি হত। অবশ্যই সন্ধানী ও জিজ্ঞাসুরা সেসব পড়বেন, কিন্তু প্রবেশার্থীদের জন্য সেই সহায়তা দরকার ছিল। সহায়ক পাঠ হিসেবে এ দুই লেখকের যেসব বইয়ের কথা আমাদের মনে পড়ছে সেগুলি হল—সুধীর চক্রবর্তী রচিত নানা সংগীত সংকলন ও সংগীত ও লোকসংগীত বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আলো-আঁধারের সেতু রবীন্দ্র-চিত্রকল্প'। অবশ্যই সেসব বইয়ের অনেক কথা এ-দুটি বইয়েও পাওয়া যাবে, কিন্তু এসব প্রসঙ্গে লেখকদের চিন্তার বিস্তারিত পটভূমিটি জানলে পাঠকের লাভই হবে।

মূলত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন হলেও ইন্দিরার প্রকাশনা শুধু রবীন্দ্রসংগীতকে কেন্দ্র করে নয়। এ প্রতিষ্ঠান এর আগে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান ও অন্যান্য গান, নিধুবাবুর নির্বাচিত গান, দাশরথি রায়ের নির্বাচিত গান, এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তারই ব্যাপক পরম্পরা ধরে সুধীর চক্রবর্তীর বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এর সব কটি রচনাই আমরা আগে পত্রপত্রিকায় পড়েছি।

প্রথম প্রবন্ধ মূলত স্মৃতিচারণা, বলতে পারি গান শোনা ও গানকে জীবন ও প্রকাশের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে 'সিনিয়ার সিটিজেন' বর্গে পৌঁছে যাবার এক ব্যাপক পরিক্রমা। এই পরিক্রমা যে তিনি করতে পেরেছেন তার জন্য প্রথম থেকেই নিজের জন্য কিছু শর্ত তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি প্রমথ চৌধুরীর এই কথা মেনে নিয়েছিলেন যে, "যিনি কণ্ঠে বা যন্ত্রে কখনো সাত সুরের চর্চা করেননি তার গান

সম্পর্কে লেখালেখি করা উচিত নয়।" এই চর্চা সুধীরবাবুর গভীর ও ব্যাপক বলে তিনি গান নিয়ে লেখার কথা ভেবেছেন, শুধু তাই নয়। আর-একটা শর্ত ছিল অজস্র গান শোনা, নানা রকম গান শোনা। এ শর্তটিও তিনি মান্য করেছেন। রেকর্ডে শোনা নয়, সামনে বসে শোনা। তা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনেক উন্নততর এক সাংগীতিক অভিজ্ঞতা এবং শ্রোতার সংগীতবোধকে তীব্রতর করে সে কথা তিনি সঙ্গতভাবেই বলেন, এবং দিলীপকুমার রায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা নির্মলেন্দু চৌধুরীর গান শোনার অসামান্য অভিজ্ঞতার কথা বলেন, বলেন ভীষ্মদেব, শচীন দেব বর্মন, আব্বাসউদ্দিন, সুব্বুলক্ষ্মী, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা উমা বসুর কথা। আরও অনেক শিল্পীর কথা যেমন এসেছে তেমনই এসেছে নানা জনের স্মৃতি থেকে গ্রামোফোন কোম্পানির বিপণন কৌশলের প্রাথমিক ইতিহাস,—কীভাবে ইসলামের গান গাইবার জন্য ধীরেন দাস, চিত্ত রায়, আশ্চর্যময়ী দাসী প্রমুখ 'গণি মিঞা', 'দেলোয়ার হোসেন', 'সকিনা বেগম' ইত্যাদি নামে সেসব গান রেকর্ড করেছিলেন। ১৯০৭ থেকে রেকর্ড আর ১৯২৭ থেকে রেডিয়ো আসার পর বাংলা গানের বিবর্তন ও প্রচার, মঞ্চে গাওয়া গানের জনপ্রিয়তার এক ভিন্ন সূত্র, এবং ১৮৬১ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে জন্মানো রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ, পরবর্তী নজরুল—এঁদের কারও ব্যক্তিজীবন ও সংগীতজীবনের সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যদের গানের মান্য স্বরলিপির অভাব ও অনিশ্চয়তা, প্রত্যেকের সংগীত রচনার শিল্পগত ও সামাজিক পটভূমির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রথম নিবন্ধটিকে এ বইয়ের যোগ্য ভূমিকা হিসেব মর্যাদা দেবে। এ প্রবন্ধের শেষে নজরুলের আলোচনা বিশেষ মূল্যবান, যেমন মূল্যবান পরের প্রবন্ধে ('শতবর্ষের বাংলা গানের দিগ্‌দর্শনী') দিলীপকুমার রায়ের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ। পরে 'দিলীপকুমার রায়ের গান' প্রবন্ধে পাব ওই অনন্যসাধারণ সংগীতশিল্পীর আরও বিস্তারিত, কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ও মমতাময় এক আলেখ্য, তাঁর বিষয়ে আমাদের স্মৃতি-বিস্মৃতির চিত্রনাট্য। ভারি গভীর প্রত্যয়ে সুধীরবাবু একথা লিখেছেন যে, "১৯৬১ থেকে রবীন্দ্রসংগীত এবং ১৯৬৫ থেকে নজরুলগীতি বাঙালি শ্রোতার মনে ধরে যায়।" তিনি তাই প্রত্যাশিতভাবেই বিচার করেন এই দু-ধরনের গান বাঙালি শ্রোতাদের মনে 'ধরে যাওয়ার' আগে কোন কোন রচয়িতা বা সংগীতকারের গান তাঁদের মনে ধরেছিল? এবং কেন এতদিন আশেপাশে থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নজরুলের গান বাঙালি শ্রোতাদের 'মনে ধরেনি'। তাঁর একটি উত্তর এই, "কুশলী সুরকারদের মেলডি ভরা সুরের মাদকতা এবং নিপুণ গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠলাবণ্য আর উচ্চস্তরের গায়ন" আগে দু-দশক ধরে বাঙালি শ্রোতাদের 'আবিষ্ট ও মোহগ্রস্ত' করেছিল, ফলে "বাণীর দুর্বলতা বা ভাবের হাস্যকরতা' তাঁরা হয় খেয়াল করেননি, না হয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেননি। এ নিশ্চয়ই একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়। তবে হিন্দি উপন্যাস 'রাগ দরবারী'-তে শ্রীলাল শুক্ল যেমন হিন্দি ফিল্‌মি গানের প্রসঙ্গসূত্রের একটি কৌতুককর তালিকা দিয়েছেন তেমনই শ্রীচক্রবর্তীও অন্যদের বাংলা গানের "বেদনার বালুচর, স্মৃতিদীপ, শুকনো মালা, ব্যর্থ বাসর, প্রেমিকের অযোগ্যতা, ভ্রমরের গুনগুন, ঝনক ঝনক কাঁকন ঝংকার, আকাশের ডাক, বর্ষার রাত,

চামেলি-মালতী, মৌমাছিদের পাখার মিতালি" ইত্যাদির "ন্যাকামিপূর্ণ রোম্যাণ্টিকতা", আর "দেশকালের প্রতি উদাসীনতা"। হয়তো শ্রীচক্রবর্তী পরের বাংলা গান সম্বন্ধেও একই কথা বলতে পারেন— ভাস্কর বসু, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মুকুল দত্ত, সুমন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের গানের কথার ব্যতিক্রম বাদ দিলে। রেডিয়ো, চলচ্চিত্র ও ক্যাসেটের 'আধুনিক' গান শুনলে মনে হয় অজস্র গীতিকার গান রচনায় ঢুকে পড়েছেন যাঁদের অন্য কিছু করার কথা ছিল। তাঁরা না জানেন ছন্দ, না জানেন বাংলায় সঙ্গত মিলের রহস্য, না রাখেন কবিত্বময় চিত্রকল্প তৈরির সাধারণ বোধ।

এ প্রবন্ধে গণসংগীতের কথা খুব সুন্দর করে বলেছেন শ্রীচক্রবর্তী। তাতে বিষয় ও প্রসঙ্গ ন্যাকামিপূর্ম প্রেমের বাইরে অনেকটাই বিস্তারিত হল, সুর গেল বিশ্ববিহারে। কিন্তু হয়তো এ কথাও বলার দরকার ছিল যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত প্রমুখের কাব্যভিত্তির বাইরে অধিকাংশ গণসংগীতের কথা অংশ রচনার দিক থেকে উৎকৃষ্ট নয়। তবু কোনও একটা নতুন প্রেরণা নতুন সুরের সঙ্গে এই কথাগুলিকে জড়িয়ে নিয়েছিল, ফলে এ ক্ষেত্রেও শ্রোতারা কথার দুর্বলতা নিয়ে তত মাথা ঘামায়নি। এখনকার তথাকথিত 'জীবনমুখী' গানেও অসংখ্য শিল্পী গানের কথার সুষম বিন্যাস সম্বন্ধে অবহিত নন। তাঁরাও 'ছিলে'র সঙ্গে 'ব'লে' মিলে কোনও অস্বস্তি বোধ করেন না। এ প্রবন্ধটির কালগত ব্যাপ্তি অনেকটা বলেই এ প্রসঙ্গটি আর একটু আলোচিত হলে ভাল হত।

পরের প্রবন্ধ 'গত পঞ্চাশ বছরের গান' আগের প্রবন্ধের অর্ধাংশের পুনরাবৃত্তি নয়, এতে অনেক নতুন কথা এসেছে, যদিও পুনরাবৃত্তি সম্পূর্ণ এড়ানো যায়নি। এখানে বিশেষভাবে এসেছে 'সংকট'-এর কথা—শ্রোতাদের বিস্মৃতির কথা— সেইসব শ্রোতাদের, যাঁরা 'রিমেক'-কে মৌলিক গান মনে কবেন, অখিলবন্ধু বা মৃণাল চক্রবর্তীর গানকে ইন্দ্রনীলের গান মনে করেন। আমাদের মনে হয় এ এক অমোঘ ভবিতব্য। লেখক তো নিজেই বলেছেন যে মিডিয়া এখন সফল সংগীতশিল্পীকে যে বিপুল প্রচার দেয়, আগের শিল্পীরা তা আদৌ পেতেন না। ফলে নতুন প্রজন্ম আগেকার শিল্পীদের কাজের কথা জানবে কী করে?

'সে-আগুন ছড়িয়ে গেল' রচনাটি সম্পূর্ণত রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে, কিন্তু তার ভাষাপাঠ বা সুরপাঠ নয়, তার গ্রহণ ও বিস্তারের বিবর্তন নিয়ে। তিনি এটা লক্ষ করেছেন যে "রবীন্দ্রপ্রয়াণের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রসজ্ঞ ও বিচারশীল মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত তার স্বকীয় মূল্যে প্রতিষ্ঠিত ও সত্য।" এই প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সূত্র ও ইতিহাসও মনোজ্ঞ বিবৃতি পেয়েছে এ নিবন্ধে। 'ন্যাকামি ও প্যানপ্যানানি' জাতীয় প্রতিক্রিয়া থেকে রবীন্দ্রসংগীত যে এখানে উঠে এল সেখানে প্রজন্মগুলির একটা ইতিবাচক বিবর্তনও লক্ষণীয়, শুধু স্মৃতিভ্রংশ নয়।

'দিলীপকুমার রায়ের গান' এক সংগীতশিল্পী সম্বন্ধে এ বইয়ের একমাত্র প্রবন্ধ এবং মোটামুটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। এই গুণগ্রাহী ও বিচারমূলক প্রবন্ধ আমাদের সংগীত স্মৃতি-প্রবণতা এবং দিলীপকুমার রায়ের ব্যক্তিগত জীবনচর্যার সম্পর্কটিকে খুব স্পষ্ট ও কিছুটা বেদনাময় করে প্রকাশ করেছে, যা পাঠকদের শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে অনুরোধ করি। পৃথিবীর এক

শ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরস্রষ্টা কী করে কেবল নিজের জীবনসাধনার নির্বাচনে নিজের শিল্পীসত্তার প্রতি অবিচার করলেন তা ভেবে আমরাও একটা প্রবল অপচয়ের বোধে আচ্ছন্ন হই। লেখক বলেন Arts for Divine's sake বিশ্বাস থেকে দিলীপকুমারের "জীবনস্বপ্ন আর গান একটি বিন্দুতে মিলে গেছে।" 'ডিভাইন' যদি কেউ বা কিছু থাকে তার বা দিলীপকুমারের এত কী তর্পণ হয়েছে জানি না, কিন্তু আমরা এ কথায় সান্ত্বনা পাই না।

শেষ দুটি প্রবন্ধ 'নজরুলগীতি সংকটের উৎস' এবং 'আধুনিক বাংলা গান' যেন পরস্পরের পরিপূরক। তার কারণ, তথাকথিত 'আধুনিক বাংলা গান' মূলত নজরুলের রচনায় জনপ্রিয় শৈলীই অনুসরণ করেছে। কিন্তু গানে কিছুটা শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও নজরুলের প্রতিভার অমিতব্যয়িতা ও সংগীত রচনার বাস্তব পরিবেশ তাঁকে যে চটুলতা, আবেগাচ্ছন্নতা এবং জনরুচির তরঙ্গের বাইরে বিশেষ যেতে দেয়নি, তা শ্রীচক্রবর্তী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে, "তাঁর গান রচনার পিছনে কোনও নির্দিষ্ট অভিপ্রায়, স্থির প্রত্যয় এবং মননক্রিয়ার চিহ্ন খুঁজে পাই না।" শেষ প্রবন্ধটিতে 'শতবর্ষ' ও 'গত পঞ্চাশ' বছরের কথাগুলি আবার স্মরণ করা হয়েছে, কিন্তু দেখানো হয়েছে যে, 'এলিটিস্ট' শ্রোতা ও গবেষকদের কাছে নজরুলগীতি এ আধুনিক গান বিষয় হিসেবে তেমন মর্যাদা পায়নি। এক্ষেত্রে নারায়ণ চৌধুরীর মতো সংগীতজ্ঞানীদের একটু ব্যতিক্রম, হয়তো বা উৎকেন্দ্রিক বলতে হবে, কারণ বর্তমান সমালোচককে তিনি পত্রে রবীন্দ্রসংগীত যে নজরুলগীতির তুলনায় কত দুর্বল—তা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক গানের পক্ষ নিয়ে লড়াই করার এরকম লোকও পাওয়া কঠিন।

যাই হোক, শ্রীচক্রবর্তীর এই স্বল্পপরিসর, কিন্তু সংবাদ, আত্মজীবনপ্রসঙ্গ, তথ্য, বিশ্লেষণ ও বিচারসমৃদ্ধ বইটি বাংলা গানের এক শতাব্দীর বেশি সময়ের ইতিহাসকে ব্যাপ্তির সঙ্গে ঘনত্ব দিয়ে আমাদের সামনে ত্রিমাত্রিক মূর্তি দেয়। এ কাজ অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাপাঠে প্রথম যে প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন সেটি হল, সুর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তা কতটা কবিতা, এবং কবিতা যদি হয়ে থাকে তা কতটা 'আধুনিক' কবিতা। এ দুটি প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তর তিনি নিজেই দেন যে তা শিল্পসম্মতভাবে কবিতাই, এবং মনন ও প্রকরণে আধুনিক কবিতাও বটে। তিনি লক্ষ করেন কবিতায় গানের প্রাগ্‌রূপ এবং পাঠান্তরগুলিকে—কীভাবে একটি চিত্রকল্প বা শব্দবন্ধ ক্রমশ সংহত এবং অমোঘ হয়ে উঠছে। আধুনিকতার একটি সূত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই অভ্যাসের কথা বলেন লেখক—"এভাবে ফর্মের রূপান্তর ঘটান তিনি, তিনি জানেন ফর্মটাই কনটেন্ট।" সেই সঙ্গে লেখক উদ্ধার করেন গীতাঞ্জলির গানগুলির অন্তস্থল থেকে উঠে আসা "এক ব্যক্তির যন্ত্রণার বাণী"—যা আধুনিকতার আর এক সূত্র।

এমন নয় যে, লেখক সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের শব্দকৃতিকে সমর্থন করছেন। তিনি দেখান

'আজি শ্রাবণঘন-গহন মোহে' গানটিতে 'গোপন' শব্দটি নিরর্থক, 'নীলাজ-নীল'-ও অর্থহীন। তাঁর কথা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পরে-করা ইংরেজি অনুবাদের সাক্ষ্যও তুলে ধরেন। এ থেকে আমরা বুঝে নিই সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অতিশয় সতর্ক অথচ মরমি পাঠ-সমালোচক।

'তৃতীয় মাত্রা : তৃতীয় স্বর : রবীন্দ্রসংগীত' প্রবন্ধটিতে প্রথম এল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা—যিনি রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় সংগীতের ধারাতেই স্থাপন করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন, "আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য Composer জন্মাননি।" যত দূর শুনেছি, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষেরও বিশ্বাস তাই ছিল। কথা ও সুরকে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি অন্যোন্যবদ্ধ মিলনসূত্রে বেঁধেছিলেন যে, ভারতীয় সংগীতের সুরাশ্রিত abstraction (যেখানে কথাগুলি শ্রোতার নিজের কথা হয়ে উঠত না, হত রাধাকৃষ্ণের পুরাস্মৃতিলোকের কথা), রবীন্দ্রনাথের কথার সংযোজনে concrete ও humanized হয়ে ব্যক্তির গান হয়ে উঠল। এখানেও লেখক বলেন, "এই ব্যক্তিকতাকে যিনি সুরান্বিত করেন তিনি আধুনিকতার অগ্রদূত।" বাণীর ব্যক্তিগত আধুনিকতা এবং তাকে তার প্রতীক্ষিত 'সুরান্বয় দান'—এই হল এক তৃতীয় মাত্রা, যা রবীন্দ্রসংগীত ভারতীয় সংগীতের পরম্পরায় নতুন করে যোগ করেছে।

বস্তুতপক্ষে পরবর্তী ছোট-বড় চারটি প্রবন্ধও একই ভাবনাসূত্রে গাঁথা। অর্থাৎ প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ এক সঙ্গে গ্রথিত হওয়ার যোগ্য। 'রবীন্দ্রনাথের গান : আধুনিক কবিতা' এবং 'আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান' এবং পরের দুটি প্রবন্ধ এক হিসাবে আগের প্রবন্ধ দুটির সূত্রকেই বিস্তারিত করে। বিষয়ের মুক্তি, শব্দবন্ধে প্যারাডক্স, ফর্মুলা ও ক্লিশেকে বর্জন করে ব্যক্তিগত আমি-র প্রক্ষেপ— নির্ভুল আধুনিকতায় এইসব উত্তরণের আগের বিবর্তনও দেখান লেখক। নানা উপলক্ষে লেখা এইসব নিবন্ধে তাই একই উল্লেখ ও প্রসঙ্গের পুনরুক্তি এড়ানো সম্ভব হয় না, যেমন ঘটেছে "আমার পূজানিবেদনের দৈন্য/দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে" ছত্র দুটির বিশ্লেষণে নিবেদনের নিহিত 'বেদন'-এর কথায়। অন্তত তিনটি প্রবন্ধে পাই এ-প্রসঙ্গ। ৫৪ পৃষ্ঠায় "প্রতীক্ষমাণ যে কে সে তর্কে না গিয়েও শুধু প্রতীক্ষকের দিকে তাকিয়ে জানা যায় যে তিনি মুক্তিস্বরূপ"—বাক্যটিতে 'প্রতীক্ষক' কথাটি সম্ভবত মুদ্রণপ্রমাদ, হবে 'প্রতীক্ষ্য' বা 'প্রতীক্ষিত'।

'গীতবিতানে প্রেমের গান' এবং 'রবীন্দ্র-গীতবাণীর চিত্রকল্প : প্রকৃতি'-তে দুটি নির্দিষ্ট বিষয় এসেছে, যেমন শেষ প্রবন্ধে এসেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায় "পাগল" বিষয়টির অভিনব তাৎপর্যের আলোচনা। এগুলিতেও এসেছে আধুনিকতার সূত্র, রবীন্দ্রনাথের কথায় "নজির অনুসরণ" না করে "নজির সৃষ্টি" করার "চিরকালীন" আধুনিকতা। "বাণীহারা গান ও কবিতা" নিবন্ধটিতে লেখক লক্ষ করেছেন সংরূপের রূপান্তর—কবিতা থেকে গানে রূপান্তর কীভাবে প্রকাশের রূপান্তর ঘটায়—নতুন ফর্ম নতুন কনটেন্টের জন্ম দেয়, দুটি আলাদা সৃষ্টি হয়ে ওঠে। শুধু কবিতাশরীর ও গান নয়, বহু বছর আগে লেখা একই সূত্রের অন্য গানেরও তুলনা টানেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, ফলে তাঁর আলোচনা রবীন্দ্রনাথের গানের কতকগুলি মূল ভাবউৎসকে কখনও কখনও ছুঁয়ে

আসার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে দেখায় স্পষ্ট বিবর্তনের পথরেখাটিকে, যেখানে যৌবনের স্টিরিয়োটাইপ বা স্থিরপ্রতিমা থেকে পরে বেদনাশীল ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটে। প্রেমপর্যায়ের গানগুলিতে কবিপুরুষ, পুরুষ, নারী ইত্যাদির নেপথ্যবর্তী অনুভবটিকে স্বীকার করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির আবেদনের সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস লক্ষ করেন এবং "রবীন্দ্রনাথের গানের লিরিকের বাণী ও বারতায়" যে "নানা বিস্ময়" আছে তা আমাদের কাছে উপলভ্যমান করে তোলেন।

রবীন্দ্র গীতবাণীর প্রকৃতি বিষয়ক গানের চিত্রকল্পগুলি মূলত প্রতীকধর্মী, এই চমৎকার নিরীক্ষাটির পর তিনি তাদের বিবর্তনও লক্ষ করেন। এখানে দু-একটি সিদ্ধান্তের সমাজতত্ত্ব আমাদের কাছে একটু আরোপিত মনে হতে পারে। "সমাজ সংসার মিছে সব/মিছে এ জীবনের কলরব' তিনি "উপনিবেশের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সমালোচনা" বলেছেন (৮০ পৃষ্ঠা)। জানি না একথা লেখার সময় "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটির নেপথ্যপ্রসঙ্গ তাঁব মনে ছিল কি না! আমাদের মতে জন ডানের "for heaven's sake, hold your tongue and let me love" জাতীয় পঙ্‌ক্তিকেও অনৈতিহাসিকভাবে এই একই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্রকল্পের অন্ধিসন্ধি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নখদর্পণে— ষাট-বাষট্টি বছর বয়স থেকে বর্ষার চিত্রকল্পে যে গতিশীল নূতনত্ব এল, তা তিনি লক্ষ করতে ভোলেন না। আমাদের মনে করিয়ে দেন, "মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গ প্রয়াতে" পঙ্‌ক্তিটিকে, যেখানে সংস্কৃত ছন্দের একটি পরিভাষাকে তার শুদ্ধ আক্ষরিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য চিত্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্যই কোথাও কোথাও ধ্বনি ও চিত্রের সংঘাতে লিরিক ব্যাহত হয়েছে, চিত্রকল্পের বিষম মিশ্রণ ঘটেছে। তখন "সুর এসেছে বিপন্ন কবিতাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে। বলা দরকার, তার সে-ভূমিকা সে যথাসাধ্য পালন করেছে।"

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বর্ষা ও বসন্তের গানের ব্যাপক রূপকধর্মের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। এ প্রবন্ধটির শেষ দিকে, ৮৯ পৃষ্ঠার পঞ্চম লাইনে, 'নিলেম' শব্দটি আবার অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়।

পরবর্তী "রবীন্দ্রগীতির চিত্রকল্প প্রসঙ্গ"ও একই ভাবসূত্রের বাহক। এখানেও লেখক রবীন্দ্রসংগীতের শরীরী সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে আমাদের বরিষ্ঠ পথপ্রদর্শক। তাঁরই নির্দেশিকা অনুসরণ করে আমরা বুঝি যে, কোনও গান একটি প্রাথমিক চিত্রকল্পের বিস্তার, আবার কখনও কোনও গান শেষের একটি অমোঘ চিত্রকল্পের জন্য নিজেকে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করে। লেখক এ তথ্যও উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দেন যে "গানের ইমেজ আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন বছর পর্যন্ত এত ঘন ঘন এল। উনসত্তর বছরেও সে ইমেজ নিঃশক্তি হল না।"

আলোচনাসূত্রে যত প্রসঙ্গ লেখক তোলেন, যত ইঙ্গিত দেন— সব কটি তুলে আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটা লক্ষ করতেই হয় যে, টেক্সচুয়াল নিদিধ্যাসন থেকে শুরু করে বিপুল অধ্যয়ন, ইতিহাসের শিল্পতত্ত্বের সমাজতত্ত্বের বিবর্তন ও সংগঠনতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ—বিদেশি সাহিত্য—সমস্তই তাঁর আলোচনায় খুব স্বচ্ছন্দভাবে আশ্রয় পায়।

পাণ্ডিত্য দেখানোর সচেতন চেষ্টায় নয়, নিজের চিন্তা ও বিচারের স্বাভাবিক আমন্ত্রণে। কোথাও কোথাও তাঁর কথা একটু বেশি ছড়িয়ে যায় বলে এই সমালোচকের মনে হয়েছে, মনে হয়েছে আর একটা বা ওই কয়েকটা উল্লেখ না করলে যেন আলোচনা আর-একটু তীক্ষ্ম ও তন্ময় হত। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, আজ যখন দেরিদা প্রমুখ মানুষেরা বিচারমূলক রচনাকেও সৃষ্টিশীলতার গৌরব দিতে চান তখন সরোজবাবুর লেখায় তাঁর নিজস্ব শৈলীর ওই পরিচয়টুকু থাকলেই বা ক্ষতি কী?

দুটি বইই বাংলা সংগীত বিচারের ক্ষীণ ধারাতে মূল্যবান সংযোজন হয়ে থাকবে।

['বাংলা গানের আলোকপর্ব' এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছে বাঁধি' বই দুটি এখানে একসঙ্গে আলোচিত।]

দেশ
১৭ জুলাই ২০০৪

(গ) সাহিত্য

গ. ১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ

গ. ১.১ আলোচক : অনন্তকুমার চক্রবর্তী

আলোচ্য বইটি আগাগোড়া অনুসরণ করার পর কোন কোন পাঠকের মনে হতেও পারে বইটির মধ্যে তেমন একটা সমগ্রতার ছাপ নেই। পরিচ্ছেদগুলো যেন অনেকটা আলাদা আলাদা প্রবন্ধের মত ফলে কিছু পুনরুক্তিও এসে গেছে, কালানুক্রম সর্বত্র অনুসৃত হয়নি, পটভূমিকাটাও তেমন বিস্তৃত নয়, আর অন্তত ছাপা অক্ষরের বিবেচনায়, দ্বিজেন্দ্র সৃষ্টির যেটা সবচেয়ে বড় অংশ—নাটক সেদিকটাও, কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বাদ দিলে, প্রায় অনালোচিতই থেকে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে বর্তমান সমালোচকের প্রথম পরিচয় বাল্যকালে শোনা তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলির সূত্রে, তারপর প্রথম যৌবনে ঘটেছিল কিছু নাটকের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য। কিন্তু 'চন্দ্রগুপ্ত'-র মত একদা জনপ্রিয় নাটক যা দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থকতম নাটকগুলির অন্যতম, তেমন নাটকের অভিনয়েও আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র নাট্যকার ছিলেন না মোটেই, বরং পর পর দৃশ্যগুলোর শিথিল বিন্যাস অনেক সময়েই ছিল বিরক্তির কারণ, আসল আকর্ষণ ছিল চাণক্যবেশী শিশিরকুমারের অত্যুজ্জ্বল অভিনয়, এবং সেই নটশ্রেষ্ঠের (এবং অহীন্দ্র নরেশচন্দ্রদেরও) তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র নাটকের অভিনয় এ দেশে কার্যত বন্ধ। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলালকে বিস্মৃত হওয়ার কারণ এখান থেকেও হয়ত কিছুটা সন্ধান করা যেত কিন্তু লেখক সচেতনভাবেই তা এড়িয়ে গেছেন ('আত্মপক্ষ' দ্রষ্টব্য)। আজকের দিনে নিছক সংলাপের মেলোড্রামায় নাটক জমিয়ে তোলার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেন মনে হয় না। তথাপি লেখককে অসংখ্য সাধুবাদ এবং সেই সাধুবাদ একেবারে মুক্তকণ্ঠে। কেন না বিস্মরণের উজান ঠেলে তিনি স্মরণের দৃষ্টিপথে এনেছেন সেই পৌরুষদীপ্ত আবেগতাড়িত অথচ রণক্লান্ত মানুষটিকে, বুঝতে চেয়েছেন দ্বিজেন্দ্র প্রতিভায় মূল লক্ষণগুলিকে তাঁর কাব্যপ্রত্যয়কে—বিশেষ করে তাঁর গীতিকার সত্তাকে যেহেতু লেখকের বিবেচনায় এবং আমাদেরও বিবেচনায় 'গানই তাঁর সৃজনপ্রতিভার সবচেয়ে বড় সফলতার দিক।' এ কাজ গ্রন্থকার সম্পন্ন করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে, নিষ্ঠাবান গবেষকের একান্ত প্রত্যয়ে।

দ্বিজেন্দ্রলালের মোট নাটকের সংখ্যা কুড়িটি, কিন্তু অভিনীত হয় মাত্র দু একটি-তাও কালেভদ্রে। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে পাঁচটি, প্রায়ই পড়া হয় না। তাঁর একটিও পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়নি, এবং 'পাঁচ শতাধিক গানের এক-চতুর্থাংশও স্বরলিপিবদ্ধ নয়'। তাঁর নির্ভরযোগ্য কোন জীবনীগ্রন্থ নেই এবং তাঁর স্বকণ্ঠের রেকর্ড আজ 'কিউরিওর বস্তু।' তবে, দ্বিজেন্দ্রগীতির রেকর্ড সংখ্যা পাঁচিশ অতিক্রম করেনি—অবস্থাটা বোধহয় অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। তবু রবীন্দ্র বিদ্বেষের দুরোপনেয় কলঙ্ক সত্ত্বেও বিস্মরণের

মাত্রাটা যেন তাঁর প্রাপ্যেরও অধিক। লেখকের আলোচনা এখানে কিছু নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে।

শ্রীচক্রবর্তীর নাতিদীর্ঘ বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে যে এ দেশে স্বাদেশিকতার উদ্ভব ও বিকাশ মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল' (পৃঃ ৭৩) এবং তার ভিতরকার স্ববিরোধী দ্বিজেন্দ্রলালেও অনেকাংশে বর্তেছে। মধ্যশ্রেণীর 'চাকরিসম্বল অস্তিত্বে'র মধ্যেই ধ্বনিত হত এক ধরনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল এক আত্মধিক্কার। বিদেশীদের দ্বারা শোষিত লুণ্ঠিত এই দেশ স্বর্গাদপি গরীয়সী, কিন্তু তার বর্তমান দুর্দশা দেশবাসীর কোনও অজ্ঞাত পাপ থেকে উদ্ভূত—এ রকম ধারণার পিছনে কোন 'সমাজ বিশ্লেষণী চেতনা' কাজ করেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও ছিল এই স্ববিরোধ, ছিল স্বদেশপ্রেম আর ইংরেজিপ্রীতির দ্বৈধ। একদিকে তিনি বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করার গ্লানি মর্মে মর্মে অনুভব করেন, অন্যদিকে চাকরি রক্ষার খাতিরেই গানের পঙ্‌ক্তি বদলান, অথবা বেশ কিছু রচনা পুড়িয়েও ফেলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা গেছে এই দ্বৈধ, একদিকে তিনি প্রীতিময় স্বামী, পিতা, বন্ধু-অন্যদিকে সংসার বিষয়ে উদাসীন'। একদিকে তেজোদৃপ্ত পৌরুষ, অন্যদিকে চলতি উত্তেজনার স্রোতে ভেসে চলার নেশা। একদিকে তর্ক আর নাস্তিকতা, অন্যদিকে ভক্তি আর আত্মসমর্পণ। কবিতায় গানে যিনি বেশ কিছু নতুন ফর্মের স্রষ্টা, তিনি চোখের সামনে দেখেও শেষ পর্যন্ত ধরতে পারলেন না এদেশে সত্যিকার সৃষ্টির আসল দায় কোন সক্ষম হাতে!

ছন্দ মিলের অসামান্য দক্ষতায় দ্বিজেন্দ্রলাল একসময় তাঁর কবিতায় আনতে চেয়েছিলেন 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি'। এর পিছনে কাজ করেছিল তাঁর বিশিষ্ট সমাজবোধ ও আদর্শবাদ একটা প্রত্যক্ষ বহির্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু কোন দৃঢ় কাব্যপ্রত্যয়ে স্থিত না হওয়ায় 'কাব্যক্ষেত্রে তাঁর মূল অভিপ্রায়টুকু ধূসর থেকে গেছে' (পৃঃ ৬৩)। 'কবি' দ্বিজেন্দ্রলালকে বিস্মৃত হওয়ার এটাও হয়ত একটা কারণ! হাসির গানে তাঁর অসামান্য সিদ্ধি এককালে তাঁকে লোকপ্রিয় করেছিল-স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর উৎসাহী শ্রোতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই হাসির গান তাঁর ক্ষতিরই কারণ হয়েছে। এর আভ্যন্তরীণ নির্মিতটুকু বিশেষ কেউ লক্ষ্য করল না, শুধু মজাটুকুই উপভোগ করল এবং যথাযোগ্য ধারাবাহিকতাও তার রক্ষিত হল না পরবর্তীদের প্রয়াসে। মাঝখান থেকে 'নিজস্ব গীতিরীতির পথ খুঁজে নিতে' বেশ কিছুটা বিলম্ব ঘটে গেল। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনের এ-ও একটা মস্ত অপচয়!

অবশেষে দ্বিজেন্দ্রগীতির বিচার-বিশ্লেষণে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন শ্রীচক্রবর্তী। তাঁর কাছে এটাই ছিল আমাদের মুখ্য প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা অনেকাংশে তিনি পূরণ করেছেন, যদিও সর্বত্র তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন। শৈশবে একটা অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ তো দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্যই পেয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল তাঁর স্বাভাবিক সঙ্গীতকুশলতা। বিলিতি গানের অভিজ্ঞতা তাঁর সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল কিছু হাসির গানে এবং স্বদেশী গানে—নাটকের গানেও। বিশেষ করে স্বদেশী গানে উদ্দীপনার বাণী ফুটিয়ে তুলতে বিলিতি স্বরক্ষেপণের আঙ্গিক বিশেষ উপযোগী। ফলে 'কনটেন্ট' ও 'ফর্মে'র

একটা সাযুজ্য তৈরি হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল 'ভারতীয় আত্মিক শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সমন্বয়'—এটা কোন 'জোড়কলমী' ব্যাপার নয় (পৃঃ ৭৮)। কিন্তু পরবর্তীকালে আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'টপখেয়ালী' আদর্শ তাঁকে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরায় সাহায্য করে এবং তখন থেকেই শুরু হয় এক নতুন ধরনের বিশিষ্ট দ্বিজেন্দ্র-গীতি, যার চাল কিছুটা দীর্ঘায়িত ও জটিল, কিন্তু যা এক একটা রাগকে অবলম্বন করেও সাবলীলভাবে গড়ে ওঠে 'নিজের স্বভাবে-যেখানে রাগরূপটাই প্রধান কথা নয়। একেই তিনি বলেছেন 'কম্পোজিশন'। এবং তার পরেই (বিতর্কের ঝুঁকি নিয়েও) তাঁর চকিত মন্তব্য : 'এ-কাজটা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আগেই তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং করেছেন যোগ্যতরভাবে' (পৃঃ ১০০)। এই আগে পরে বা তর-তমর ব্যাপারটা সুধীরবাবুর কাছে ঠিক আশা করিনি, বিশেষ করে তুলনীয় ব্যক্তিটি যখন রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষেত্রটি যখন গান। বিস্তৃত তর্কের স্থান এটা নয়, তবু সবিনয়ে স্মরণ করাতে চাই যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্টতা বা রাবীন্দ্রিকতা (নিজের স্বভাব) এদেশের একান্ত অশিক্ষিত কানেও স্বপ্রকট—ভাল লাগা মন্দ-লাগা স্বতন্ত্র কথা। আর দেশীয় ঐতিহ্যের সন্ধান ও পুনর্নির্মাণ রবীন্দ্রপ্রতিভারই আর এক অনন্য দান। তবু উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে দ্বিজেন্দ্র-গীতির সুষ্ঠু পরিবেশনা যে ক্রমশ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গ্রন্থকার সত্যিই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দ্বিজেন্দ্র-গীতির চর্চার পিছনে কোনও যোগ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বরাবরই ছিল, আজও আছে।

আজকাল
৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

গ. ১. ২ আলোচক : **জ্যোতির্ময় ঘোষ**

ভুলভাবে নিন্দিত বা ভুলভাবে প্রশংসিত মানুষের সংখ্যা কিছু কম নয়। একই সঙ্গে ভুলভাবে নিন্দিত-প্রশংসিত মানুষও বিরল নন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই দু-রকম দৃষ্টান্তই বিদ্যমান। এরই সঙ্গে 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' যদি-বা না-ও বলি, তবু কবি-নাট্যকায়-গীতকার-সুরকার এবং দরিদ্র জনসাধারণের 'দয়াল বায়', জীবনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিরোধের সঙ্গে নিঃসঙ্গ আপসহীন সংগ্রামী, প্রবলভাবে দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচিত্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের ১২৫তম বর্ষ পরেও এই প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই পুরোপরি মিলছে না যে, জীবনের শেষ সাতবছরব্যাপী রবীন্দ্র-বিরোধিতার কালে নিতান্ত অশোভন রবীন্দ্র-দূষণের কতটা গুরুতর 'পাপে'র শাস্তিস্বরূপ সম্ভব হতে পারছে প্রায়-সুচিরস্থায়ী তাঁর প্রাপ্যের অতিরিক্ত এই অনাদর?

খেদোক্তিপূর্ণ এই প্রশ্নটি অবশ্য নতুন নয়। সাম্প্রতিকও নয়। প্রায় তিয়াত্তর বছর আগে দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থেও এই খেদ প্রকাশ করেছিলেন যে, 'বলিতে লজ্জায় শির নত হইয়া পড়িতে চায় যে, আজও এদেশে এই-সব তথাকথিত শিক্ষিত বাবুদের ভিতরে খুব অল্প লোকই দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনার সহিত পরিচিত' এবং এই আশা যে, 'আমাদের বিশ্বাস-দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক উপলব্ধি করিতে আরও একটু বেশি দিনের প্রয়োজন হইবে। আজও বঙ্গদেশে তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই।'

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার যথোচিত সমাদর ও স্বীকৃতিলাভের অন্তরায় হিসাবে এখন থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত (১৩৫৩) দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় উল্লেখ করেছিলেন যে-দুটি কারণ, তার 'প্রথম ও প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ' এবং 'দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং'।

মধ্যবর্তীকালে এবং পরে প্রশ্ন তুলেছেন এবং খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন আরো অনেকেই। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য সমাদর ও স্বীকৃতি কেন তিনি পেলেন না, তার কারণ সন্ধানের চেষ্টাও করেছেন তাঁরা।

মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল প্রয়াণ এবং রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের অমার্জনীয় ভূমিকা, যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা 'আনন্দ বিদায়' নাটকে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রহনন ও কুৎসা : দ্বিজেন্দ্র বিমুখতার এ সব কারণ নির্দেশ করেছেন অনেকেই। অথচ, প্রথম যৌবনে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র গভীর সখ্যও প্রবাদপ্রতীম। পারস্পরিক প্রীতি ও অনুরাগের বিস্তর নির্দশন সকলেরই জানা। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা আর্যগাথা, মন্দ্র, আষাঢ়ে কাব্য ও তাঁর হাসির গানের অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ সব রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করেছিলেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'বিরহ' নাটক, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কতবার সুহৃদ্ সম্মিলনে। শিলাইদহে হাউসবোটে দু'জনে সপরিবারে উচ্ছল থেকেছেন গানে গানে। পূর্ণিমা মিলনে মধ্যরাত পর্যন্ত আসর জমেছে দু'জনের। তাঁদের ডাকাতে ক্লাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' গানটি। খামখেয়ালি সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানের বন্যা বইয়ে দিতেন, কোরাসে নেতৃত্ব দিতেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ পর্যন্ত এই গভীর বান্ধবতায় ক্রমশ মারাত্মক চিড় ধরেছিল, তা-ও সত্য। অনেকেই অনুমান করেছেন, কিছু তথ্য-প্রমাণও পাওয়া গেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র সম্পর্কের ক্রমাবনতির মূলে তাঁদের অন্তরঙ্গ সহচর-অনুচরদের প্ররোচনারও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে তাঁদের সুস্থ সম্পর্কের পুনরুদ্ধার হয়তো সম্ভব হতো না, কেননা, মৃত্যুর অল্পদিন আগে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ আজ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও তিনি করেছিলেন। দু'জনের তীব্র বিরোধের সময়েও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে, 'বর্তমান সাহিত্য ক্ষেত্রে

তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না'।—দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। দ্বিজেন্দ্রলালও তার উত্তর লিখেছিলেন। সে-উত্তর অবশ্য পৌঁছায়নি প্রাপকের কাছে। চিঠিখানির পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়নি পরে, কেননা, সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের মাথায় এতজল ঢালা হয় যে, চিঠিখানি সম্ভবত ধুয়ে যায়।

'গণশক্তি'র 'রবিবারের পাতা'য় পাঠক পেয়েছেন সরকারী জরিপ বিভাগে কার্যকালে উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধের বৃত্তান্ত ও তার ফলশ্রুতির বিবরণ। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সঠিকভাবেই জানিয়ে গেছেন, 'আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অন্যায় কর বৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি'।

দ্বিজেন্দ্র শতবর্ষে ১৯৬৩ সালেই লিখেছিলেন 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯) দ্বিজেন্দ্র-গবেষক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, 'দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি সুরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য সমাদর দেওয়ার সুযোগ এসেছে'। 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গবেষণাগ্রন্থে প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ যথোচিত সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার, এই তথ্যও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

এই সমগ্র প্রেক্ষিত মনে রেখেও ড. সুধীর চক্রবর্তীকে তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ' গ্রন্থটির জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন যে-কোনো দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্ত যাবতীয় চর্চাকে যথোচিতভাবে শুধু অনুধাবন করে নয়, আত্মস্থ করেই প্রায় পৌনে দুশো পৃষ্ঠার মধ্যে ছ'টি সুবিন্যস্ত অধ্যায়ে সুধীরবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুনিষ্ঠ অথচ সহৃদয় যে-মূল্যায়ন উপস্থাপিত করেছেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বীকার করতেই হবে। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার মূল লক্ষণকে তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সুচিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর উচ্চারণ ঋজু এবং উপস্থাপনা সুচিন্তিত। সেই জন্যই দ্বিধাহীনভাবে জানাতে পেরেছেন, 'বইটিকে কোনোভাবে সামগ্রিক দ্বিজেন্দ্র-পরিচিতি বলে আমি দাবি করি না'। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিসত্তা, রচনারীতি ও কাব্য প্রত্যয়কে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। 'সবচেয়ে জোর দিয়েছি দ্বিজেন্দ্রগীতি বিষয়ে, কেননা, আমার বিবেচনায় গানই তাঁর সৃজন প্রতিভার সবচেয়ে বড়ো সফলতার দিক'।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা বহু আলোচিত এবং বেশির ভাগ দ্বিজেন্দ্র-নাটকের অভিনয় দেখেন নি, এই যুক্তিতে লেখক দ্বিজেন্দ্র-নাট্যপ্রতিভার পুনর্বিচারে প্রবৃত্ত হন নি। তাঁর দুটি যুক্তিরই সারবত্তা কম বেশি মানা হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার বিশ্লেষণের অভাবে তাঁর চমৎকার গ্রন্থটি জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে রইলো। কিন্তু 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে' বসাটা আপাতত তেমন জরুরী নয়, লেখক স্বয়ং যে-লক্ষণ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন গ্রন্থনাকালে, সাবলীলভাবেই যে সেই লক্ষণস্থলে উপনীত হতে পেরেছেন তিনি, এই কথাটাই সর্বাগ্রে গুরুত্বলাভের যোগ্য। তাঁর ঘোষিত 'লক্ষ্য'

উদ্ধৃতিকালে লেখকের সমৃদ্ধ ভাষাভঙ্গিটি পাঠকের লক্ষণীয় হওয়া উচিত : 'আমার লক্ষ্য বরং সেই-মানুষটিকে বোঝা, যিনি রবীন্দ্রসমকালে বাস করেও, স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, এক অনন্যতন্ত্র ও নিঃসঙ্গ সৃজনবেদনাকে মৌলিক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার এই বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নটি অনুধাবন করে আমার মনে হয়েছে, লেখক তাঁর লক্ষ্যপূরণে সম্পূর্ণ সার্থক। 'অবহেলিত উত্তরাধিকার', 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি, পদ্যে', 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব', 'দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি', 'বাংলা গানে বিলাতি চাল', 'পুত্রের চোখে পিতা'—পর পর এই ছটি অধ্যায় শুধু বিষযবস্তুর সুষ্ঠু বিন্যাসে নয়, শিল্পিত উপস্থাপনাগুণেও সহৃদয় পাঠকের পুনর্বিচার ও পুনর্বিবেচনা দাবি করবে। পূর্বসূরী ও সমকালীন বস্তুনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র-ভাবুকদের বলা ও না-বলা কথার সারাৎসার এই প্রথম একটি গ্রন্থে যিনি সযত্নে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নৈপুণ্যের সঙ্গে সাজিয়ে দিলেন, তাঁকে দ্বিধাহীন অভিনন্দন জানাতেই হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গে বঙ্গভাষী পাঠক-সমালোচকদের অসঙ্গত অনীহা ক্রমশ কাটিয়ে তুলতেও এই বই সহায়ক হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি-অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার এই রকম বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নই এতকাল অপেক্ষিত ছিল। সুধীরবাবু সেই করণীয়টি এতদিনে সুসম্পন্ন করলেন। শেষ দশ বছরের জীবনে (১৯০৩-১৯১৩) পত্নীবিরহিত দ্বিজেন্দ্রলালের ভগ্ন বিগ্রহটি পুনরুদ্ধার করে গ্রন্থকার দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন জীবন ও সাহিত্যের সহৃদয় পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ রচনা করে দিয়েছেন : এখানেও তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চিত উদ্ভাসন।

গণশক্তি
৫ জুন ১৯৮৯

গ. ১. ৩ আলোচক : সত্যজিৎ চৌধুরী

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের কথা। হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের ধারে বড়গাছিয়া গ্রামে থাকি। এক ঝাঁক ছাত্র এসে বলল, "রবিবার সকালে আমাদের দলের যাত্রা। থাকবেন কিন্তু স্যার। চন্দ্রগুপ্ত পালা।" সকলেরই বয়স ১৪-র মধ্যে। এদেরই নাকি যাত্রার দল। রবিবার সকালবেলায় আসরে গিয়ে বসা গেল। একটা হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলা ছাড়া কোনো বাজনা নেই। তাতেই সুর ভাঁজা চলে এবং ঠিক সময়ে পালা শুরু হয়ে যায়। অবাক করা দৃশ্য। একের পর এক চরিত্র আসছে--সবারই এক পোশাক। সেকেন্দার-সেলুকাস-চন্দ্রগুপ্ত-কাত্যায়ন-চাণক্য; মায় হেলেন-ছায়া-মুরা সব স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট পরে আসরে নামছে। কোথাও এ নিয়ে কৌতুক নেই, হাসি নেই। দাপটে অভিনয় করে গেল এবং তুঙ্গ মুহূর্তগুলোয় ঠিক ঠিক হাততালি কুড়োলো। গাঁয়ের পাঁচমিশালি শ্রোতারা ডি. এল রায়ের নাটকে মজে রইলেন সারাটা সকাল।

সুধীর চক্রবর্তীর নতুন কাজ 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ' বইখানা পড়তে পড়তে সেই সকালের কথা খুব মনে পড়ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লোক-চিত্ত থেকে সম্পূর্ণই মুছে গেছেন—তা নয় বোধ হয়। দূর দূর মফস্বলে এখনও তাঁর নাটক পুরোনো ধাঁচে অভিনয় করেন শৌখিন নাট্যসংঘ। তাঁর গান তো শোনা যায়ই, হয়তো অবিকল দ্বিজেন্দ্র-সুরে নয়, যেমন সুধীর দেখিয়েছেন।

তবু এও ঠিক, দ্বিজেন্দ্রলাল আর বাঙালি সংস্কৃতির কোনো সমারোহের উপলক্ষ নন আজ। আড়ালেরই মানুষ। সংস্কৃতির চলমান ধারায় তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চর্চা খুব জরুরী মনে করা হয় না। একটা সময় অবধি আসরের একেবারে মাঝখানেই ছিলেন। কেন সে মর্যাদা হারালেন—এই জিজ্ঞাসা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন। এবং সৃষ্টির ভুবন নতুন করে পিঁজে পিঁজে দেখা হয়েছে এই বইয়ের ৬টি পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদ ৬টি-১. অবহেলিত উত্তরাধিকার; ২, গদ্যের হাতুড়ি, পদ্যে; ৩. স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব; ৪. দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি; ৫. বাংলা গানে বিলাতি চাল এবং ৬. পুত্রের চোখে পিতা। পরিশিষ্টের ৫টি অংশে সংকলিত আছে "দ্বিজেন্দ্রলালের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও রচনা পরিচয়", "দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ব্যবহৃত গানের তালিকা", "স্বরলিপি-বদ্ধ দ্বিজেন্দ্রগীতির বিবরণ ও তালিকা", "দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ে দুটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা" (প্রিয়নাথ সেন এবং বিনয়কুমার সরকারের লেখা, বিনয়কুমারের কবিতাটি ইংরেজিতে), এবং "শ্রী অরবিন্দ-কৃত দ্বিজেন্দ্র গীতির ইংরাজি অনুবাদ" ('যেদিন সুনীল জলধি হইতে' এবং 'বঙ্গ আমার, জননী আমার....')।

ব্যক্তিজীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সুখী গেরস্ত। গৃহিনী ছেলেমেয়ে নিয়ে মাধুর্যের সংসার যতদিন ভরপুর ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যও ততদিন অবিচল ছিল। সমাজের, জীবিকার জগতের আঘাত লাঞ্ছনা তাঁকে অভিভূত করেনি। বিলেত যাওয়ার অপরাধে একঘরে হওয়া বা লেখায় স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তিতে রাজরোষ—সব উপেক্ষা করে কবিতা-গান-নাটক রচনায় মেতে থেকেছেন। একই কালে রবীন্দ্রনাথ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠছিলেন, খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে রবীন্দ্রনাথের ছায়া কোনো ভাবেই পড়েনি। কবিত্বে, সাংগীতিক প্রতিভায়, এমন কী নাটকেও স্বীকৃতি সমাদর সে সময়ে দিজেন্দ্রলাল যথেষ্টও পেয়েছিলেন। নিজের মধ্যে প্রতিভার স্বাদ পাওয়ায়, নিজের কাজের মূল্য-গৌরব সম্পর্কে সচেতনতায় মানুষ সাংসারিকতার উপরে এক সৃষ্টির অধিষ্ঠানভূমি তৈরি করে নেয়। স্রষ্টামানুষ এক ধরনের বিবিক্ত নিঃসঙ্গ স্রষ্টার চারিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে জাগেনি। একটি আঘাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য টলে যায়। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর আঘাত। মাত্র ৫০ বছরের আয়ু-কালের (১৮৬৩-১৯১৩) উজ্জ্বল সৃজনশীল সময় ছিল ১৬টি বছর, বিবাহ থেকে স্ত্রীর মৃত্যু অবধি সময় (১৮৮৭-১৯০৩)।

দ্বিজেন্দ্রলালের কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা এসেই পড়ে, এমন কী ব্যক্তি-জীবনের দিক থেকেও। সুধীর চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথেরও জীবনে একের পর এক শোকের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। সে সব আঘাত রবীন্দ্রনাথের সৃজনপর ব্যক্তিত্বটিকে

কখনও বিবশ করেনি। বিধ্বস্ত দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন, "সকলেরই এ সংসারে একটা কোনো আশ্রয় বা সান্ত্বনা থাকে। আর আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই। চারি দিকে শশ্মান, আর তার পর ধূ ধূ মরুভূমি।" (২৬ পৃষ্ঠায় তোলা চিঠির অংশ)। এর পাশে সুধীর 'পুনশ্চ' বই থেকে নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পাবার দিনে লেখা বিশ্বশোক কবিতার—

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে-আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।

এই কটি লাইন রাখতে পারতেন। এ পৌরুষ দ্বিজেন্দ্রলালে ছিলনা।

দুটি সন্তান নিয়ে দিশেহারা দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুতেই জীবনটাকে আর গুছিয়ে নিতে পারেন না। "তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয় অবলম্বন আছে; কিন্তু আমার তার কোনোটাই নাই, কিছুই নাই।" (২৪ পৃষ্ঠায় তোলা চিঠির অংশ)। অনপনেয় বিষাদ এবং ভয়ংকর শূন্যতার চাপ এড়াবার জন্য জীবনের শেষ দশ বছরে তিনি কেবলই বাইরের উত্তেজনার মধ্যে নিয়ে ফেলতেন নিজেকে। মদের নেশা তাঁকে ভালো রকম পেয়ে বসে। সুধীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, "সেই উত্তেজনা হতে পারে মদ্যপানের অনুষঙ্গে, হতে পারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনজনিত তৎসাময়িক মত্ত আবেগে, হতে পারে কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জনচিত্তজয়ী ঐতিহাসিক বা দেশোদ্দীপনার নাটক লেখায় এবং একই ভাবে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অশোভন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায়।" (পৃ২৪-২৫)। নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারানো এক বিড়ম্বিত মানুষের চরিত্রমূর্তি আমাদের সামনে দাঁড় করান লেখক। সৃজনশক্তি যা ছিল এই মানুষটির মধ্যে তার কোনো শৃঙ্খলাময় পরিণতি সম্ভবই ছিল না আর। ব্যক্তিত্বের ভরকেন্দ্র টলে যাওয়া মানুষ নিজেকে চালাতে পারেনা, চলে বাইরের ধাক্কায়। জীবনে এবং সৃজনে দ্বিজেন্দ্রলালের বিফলতার কথা, ব্যক্তিত্বের এবং বিচারবুদ্ধির দুর্বলতার কথায়ও অবশ্য লেখকের মমত্ব আমাদের গভীর স্পর্শ করে। অশেষ এই মমত্বের জন্যই বইখানিতে কঠিন সমালোচনার ঝাঁজ নেই কোথাও। অনুকম্পা আছে, খেদ আছে। যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষটির কীর্তির মূল্য-গৌরবটুকু চিনিয়ে দেবার যত্ন আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশক জুড়ে আধুনিক বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে উর্বরতার মূল উপাদান ছিল স্বাদেশিক চেতনা। অকৃত্রিম গভীর আবেগে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেকে সে উদ্দীপনায় সঁপে দিয়েছিলেন। দুর্গত স্বদেশের উজ্জ্বল অভ্যুত্থানের স্বপ্ন জাগে উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত বাবু ভদ্রজনের মধ্যে। আধুনিক মননে স্বাদেশিকতার তত্ত্ব-ধারণা সংগঠিত হয় ক্রমে। স্বদেশ তো ছিল আবহমান কাল, ছিলনা স্বাদেশিকতার তত্ত্ব। ছিলনা জাতিসত্তার ধারণা। এ বস্তু বিলেতের আমদানি এবং ইংরেজি শিক্ষিতেরাই এ আলোড়নের আধার। উপনিবেশে জাতীয়তার বোধ, স্বাদেশিকতার আবেগ অবধারিত চূড়ান্তে পৌঁছয় স্বাধীনতার স্বপ্নে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এক সংগ্রামের ভেতর দিয়েই পূর্ণ হতে পারে। অবধারিত ভাবে তাই সংগ্রামের উদ্দীপনা

সত্যি সত্যি কোনো রণক্ষেত্রে না হোক, ভাবের রাজ্যে শত্রুপক্ষ চিহ্নিত করে এবং অস্ত্র হানে। আর এইখানেই সমূহ সংকট ঘনায়। জাতীয় মুক্তির ভাবুক সংগ্রামী আবার প্রভু ইংরেজের চাকুরেও বটে। ফলে কর্মচ্যুতি না হোক, প্রোমোশন বন্ধ এবং ঘন ঘন বদলি মুক্তিসংগ্রামের আবেগ বেশ থমকে দিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও পারে, দ্বিজেন্দ্রলালকেও। ফলে হিশেব করে কথা বলার গরজ আসে। বক্তব্যকে ছদ্মবেশ পরাতেই হয়। দ্বিজেন্দ্রলালে এ পিছুটানের বেশ কিছু নজির রয়েছে "স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব" পরিচ্ছেদে। 'প্রতাপসিংহ' নাটক লেখার জন্য ক্রমাগত বদলি করে হয়রান করা হচ্ছে বলে খুব উষ্মা প্রকাশ করেন, "এমনি একটু হয়রান কর্লেই বুঝি আমি অম্‌নি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন কর্ব"। আবার "বঙ্গ আমার" গানের "আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" আরও জানা যায়, বেশ কিছু স্বদেশি গান নিজে হাতে পুড়িয়ে দেন একবার। ঔপনিবেশিক বাস্তবতার এক মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ পায় তাঁর চিঠিতে, "চাকরি সম্বন্ধে কি আর বলিব? এর জন্য আমার জীবনটাই বৃথা হইতে বসিয়াছে। মানসিংহের (দ্র. 'প্রতাপসিংহ') সহিত আমিও বলিতে বাধ্য—'মনে কর কি এই দাসত্বভার আমি বড় সুখে বহন কর্চ্ছি।' কিন্তু কি করিব? অন্য উপায় নাই যে।" (পৃ.৭৬)।

এই গ্লানিটা যেমন নিখাদ তেমনি আবার এমনও ভাবেন—দৈবক্রমে ইংরেজ যদি এদেশ ছেড়ে চলেই যায় তা হলে, "শ্যাল-কুকুরের অবস্থাও সেদিন আমাদের দুর্দশার কাছে বোধ হয় হার মানে", (পৃ.৮৭)। ফলত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে শুধু শোক-সংগীত রচনাই করেন না কোরাসের দল্ গড়ে কলকাতার রাস্তায় সে গান গেয়েও বেড়ান। (পৃ.৮৮)। আবার এই দ্বিজেন্দ্রলালই স্বদেশি গানের দল দেখে রাস্তায় নেমে আসতে পারেন এবং উর্ধ্ববাহু হয়ে মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনিতে অম্বলতল রোমাঞ্চিত করে তুলতে পারেন। (পৃ.৮৮)। এই মানুষেরই মনে অবমাননা বোধের গ্লানি দুর্বহ হয়, জ্বালা ধরায় যখন, তখন নিষ্করুণ ব্যঙ্গে বলেন—"পৃষ্ঠেতো মেরেছো লাথি—মারো দেখি পুরোভাগে! দেখি সেটা কেমন লাগে।"

সুধীর চক্রবর্তী দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্ববিরোধিতার, মর্যাদাবোধ এবং প্রভুভক্তির (এবং ভয়েরও) দোটানার বিবরণে উপনিবেশের চাকরিজীবী ভদ্রসাধারণের এক প্রতিনিধি-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ দৃষ্টান্ত আমাদের জাতীয়তার আন্দোলনের ভেতরকার খাঁটি বস্তু এবং খাদ চিনিয়ে দেয়।

খাঁটি বস্তুটুকু তবু কোনো ভাবেই উপেক্ষার নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টির উজ্জ্বল অংশ ওই সব দোটানা ছাপিয়ে ওঠা অকৃত্রিম উদ্দীপনার ফসল—যা বাংলার চিরসম্পদ হয়ে আছে। উৎকর্ষের বিচারে স্বাদেশিক প্রেরণায় রচিত তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে গানকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়। লোকচিত্তে প্রভাব ব্যাপক হলেও তাঁর নাটকের তেমন শিল্পগৌরব নেই। গানে তাঁর সৃজন প্রতিভার মৌলিকতার পাশে নাটকগুলিকে এখন মনে হয় জোড়াতালি দেওয়া এক ধরনের কাঠামো যার মধ্যে দরকার মতো দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, এখন কী বিশ্বপ্রেম পুরে দেওয়া যায়। নাট্যশৈলী নিয়ে যে তাঁর নতুন কোনো ভাবনা ছিল না, শিল্পগত দায়বোধ ছিল না—সুধীর চক্রবর্তী এই সীমাবদ্ধতার দিকটি যথার্থ দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার অনন্যতা যে গানেই উজ্জ্বল, একজন কম্পোজার হিশেবেই যে তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছিল, এই ধারণাটা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে সুধীর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইদানীং গান নিয়ে বাংলায় প্রচুর লেখা আমরা পেয়েছি। তার বেশির ভাগই গানের কথার বা কাব্যগুণের স্বাদ নেওয়া। একে তো কবিতার সমালোচনাই বলা উচিত। সুধীর চক্রবর্তীর লেখায় সাংগীতিক রূপের বিশিষ্টতা বাণী এবং সুর একত্রিত মর্যাদা পায়। গানের কবিত্বের আলোচনা নয়, যথার্থত সংগীত রূপের আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল বিষয়ে তাঁর যাবতীয় অবলোকনের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব পাবে, স্থায়ী মূল্য পাবে, দ্বিজেন্দ্র গীতির মূল্য বিচারের অংশগুলি। এই বিশ্লেষণ আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। কোন্ গুণে দ্বিজেন্দ্রলালের গান লোকচিত্ত মাতিয়ে দেয়? শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মূল্য-গৌরব পায় কোন্ গুণে? ঐতিহাসিক ভাবে আধুনিক বাংলার গানে তাঁর স্থায়ী কীর্তি কী—এই তিনটি বিবেচ্য সুধীর স্থিরভাবে মনে রেখেছেন। তাঁর বিচারদৃষ্টি বোঝার জন্য একটি দুটি জায়গা স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"-র চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল তথ্যের বিবরণের জন্য। সুধীর দেখাচ্ছেন, "সার্থক জনম আমার" ভাবনায় উচ্চতর হলেও সুর কঠিন মীড়বহুল এবং তালহীন হওয়ায়, চর্চাহীন সাধারণের গলায় ফুটবে না এমন-সব পর্দা থাকায় এ গান মুখে মুখে ফেরার সম্ভাবনাই ছিল না। সম্মেলক কণ্ঠের উপযোগীও নয়। অনে পক্ষে মধ্যসপ্তকে বোনা সুরের একতালা "বঙ্গ আমার" গানটিতে সহজেই সকলে গলা মেলাতে পারেন। (পৃ.৬৫)।

কৃষ্ণনগরের বনেদি কালচারের পুরুষ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ছেলে দ্বিজেন্দ্রলালকে হিন্দুস্থানি সুর শেখান, আর সে-সুরে বাংলা গান বাঁধার দীক্ষা দেন। এই দীক্ষার ভিতের উপরে কম্পোজার হিশেবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। যেমন রবীন্দ্রনাথে তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালেও হিন্দুস্থানি সুরে বাংলা কথা যোগ করা ছাড়িয়ে গানের বাণী অনুযায়ী সুরবিন্যাসের আলাদা আলাদা ধরন বড়ো হয়ে ওঠে। সুধীর দেখান, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মতো "খুব বেশি রাগমিশ্রণের মধ্যে না গিয়েও সাবলীলভাবে গানের মধ্যে রাগরূপের প্রাধান্য কমিয়ে একটা নতুন স্বরূপ এনেছেন....।" হতে পারে বিলিতি গানের মুভমেন্টের চমৎকার গীতভঙ্গি তাতে জুড়ে গেছে বলে। হতে পারে সুর দিয়ে বাণীর দীনতা ভরিয়েছেন বলে, কিংবা সুরের মায়া রয়ে গেছে ছন্দে। যাই হোক এটা ঠিক যে, "ধনধান্য পুষ্পভরা" গান শুনলে ঠিক কেদারা ঠাটের কথা মনে থাকে না, "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে' গান ভৈরবীকে ছাপিয়ে যায়, "নীল আকাশের অসীম ছেয়ে" গান শোনবার সময় খেয়ালই থাকে না যে তার ভিত 'দেশ'-এর (পৃ.৯৯)। কম্পোজিশনের এই দক্ষতা ব্যাখ্যার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকে লেখক আর একটু গৌরব দিয়েছেন, "এ কাজটা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আগেই তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং করেছেন যোগ্যতরভাবে। কেননা প্রায়ই রাগমিশ্রণের পথে না গিয়ে তিনি একটা নির্দিষ্ট রাগের আশ্রয়ে চলেও গানকে তুলে ধরেছেন নিজের স্বভাবে"। (পৃ.১০০)। এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য এই লেখায় নেই। এটা

একটি আলাদা প্রবন্ধের বিষয় হতে পারত।

হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর এই কীর্তি প্রায় হারিয়েই গেল চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মতো গাইয়ের অভাবে। মৌলিক সুরসৃষ্টি এবং গাইবার নিজস্ব ঢঙের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কেমন মাত করে দিতেন—তার স্মৃতি কিছু সুধীর চক্রবর্তী সংগ্রহ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক যখন নিবিড় ছিল সেসব দিনে দুই কবির মিলিত গানের দৃশ্য অবিস্মরণীয় । "দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—'হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেই তো, তা বটেই তো'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্রনাথ গাহিতেন—'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। (পৃ২৯, অতুলপ্রসাদের স্মৃতিধৃত)।

হাসির গান প্রসঙ্গে এই রম্য আলোচনা থেকে আর একটি কথা মনে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রাণ ব্যাক্তিত্বেরই আর এক প্রতিফলন রয়েছে হাসির গানে। শুধুই কৌতুকে, শুধু মজায় তাঁর হাসির গান শেষ হয়ে যায় না, একধরনের জ্বালা এবং আক্ষেপ এবং কঠিন কটাক্ষ জেগে থাকে এইসব গানে। তাঁর সরল মহৎ-উদার আদর্শের মাপে দেশবাসীর যাবতীয় সংকীর্ণতা, স্ববিরোধ, বজ্জাতি তাঁকে ব্যথিত করত। সেই আহত অন্তঃকরণ হাসির গানে জ্বালা সঞ্চার করে দিত। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন, "এ কি হাসির গান? এ যে cruellest tragedy".

রবীন্দ্রনাথ বিলেত যান ১৭ বছর বয়সে, ১৮৭৮ সালে, দ্বিজেন্দ্রলাল যান ২১ বছর বয়সে, ১৮৮৪ সালে। প্রথম প্রথম দুজনেরই বিলিতি গান রুচত না, কিন্তু ক্রমে দুজনই ওদেশের গানের গভীরে যান। শুধু ভালো করে শেখা নয়, ওদেশের সংগীত নিজেদের সৃজন প্রক্রিয়ায় উপাদান হিশেবে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করে ফেরেন। "বাংলা গানে বিলাতি চাল" পরিচ্ছেদে সুধীর চক্রবর্তী আইরিশ-স্কচ ইংরেজি গান ভেঙে বাংলা গান রচনায় এই দুই কম্পোজারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেসব গান দুজনে ভেঙে নতুন সৃষ্টি করেছেন, তার মূল রূপগুলি সব পাওয়া সহজ নয়, সেদিক থেকে এই খুঁটিয়ে দেখা যোগ্য বিশ্লেষণটিকেও সম্পূর্ণ বলা যাবে না। কিন্তু দুই প্রতিভার প্রবণতা বোঝায় একটি স্থির দৃষ্টি সুধীর ধরিয়ে দিয়েছেন। এই কথাটা বেরিয়ে আসে যে দ্বিজেন্দ্রলাল মূল গানের কাঠামোটি, সুর ও ছন্দ অটুট রেখে বাংলা গান বাঁধতেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন বশ্যতা বড়ো একটা মানেন নি, তাঁর পক্ষে বিদেশি ভঙ্গি ছিল সেই বয়সের আত্মপ্রকাশের এক তাৎক্ষণিক অবলম্বন মাত্র, অচিরেই তিনি খুঁজে নেবেন তাঁর নিজস্ব "বন্দিশ, যা ভারতীয় মার্গ সংগীত, বিলাতি গান ও বাংলা লোকায়ত গানের ত্রিধা সমন্বয়ের উৎসার এর মৌলিক গীতরীতি"। (পৃ. ১৪১)। দ্বিজেন্দ্রলাল, ভিন্নভাবে, নিজের গানে বৈচিত্র্য-উচ্ছলতা সুরের দোলার উপাদান হিসেবে মূল বিলিতি গানের ঢঙ নিজের গানের শৈলীতে সঙ্গত করে নিতে পেরেছিলেন। অনেকটাই প্রকট এবং প্রকাশ্যভাবে এই উপাদান তাঁর গানে থেকে গেছে এবং একে তিনি সচেতন ব্যবহারে আমাদের সংগীত-সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে সেভাবে বিলিতি গানের

প্রকট প্রভাব নেই, যেটুক্ রয়েছে তা অন্তর্লীন। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য সুধীর চক্রবর্তী অনুরাধা পালচৌধুরীর 'বিলাতী গানভাঙা রবীন্দ্রসংগীত' বইখানির উল্লেখ করেছেন।

'বন্দেমাতরম্' গান সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, "....আমাদের প্রধান স্বদেশী সংগীত বন্দেমাতরম্ বাণীগত রচনাশৈলীর দিক থেকে জোড়কলমি। এভাষা শিষ্ট সংস্কৃত ও সরল বাংলা। ফলে 'দ্বিসপ্ত-কোটিকণ্ঠভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' এবং 'অবলা কেন মা এত বলে' এমন বিরুদ্ধ গীতিবাণী পাশাপাশি রয়ে গেছে। এর রচনাগত দুর্বলতা আজ পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি কেন কে জানে?" (পৃ. ৮১)। তা কেন? ও গান যেদিন প্রথম শোনানো হয় সেদিন যে কারোই ভালো লাগেনি সেকথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন : "যেদিন তাঁহার দরবারে বসিয়া সর্বপ্রথম বন্দেমাতরম্ গান শুনিলাম, গানটি কাহারো মনে ধরিল না। একজন বলিলেন, 'অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে'— 'শস্যশ্যামলাং' শ্রুতিকটু নয় তো কী? 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে'— ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না। একজন বলিলেন— 'কে বলে মা তুমি অবলে' অবলের এ-কার না ব্যাকরণ, না-কিছু।' বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি একঘণ্টা ধরিয়া ধীরভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'আমার ভালো লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছে হয় পড়ো, না-হয় ফেলে দাও, না-হয় পড়ো না।' শ্রুতিকটু দোষ, ব্যাকরণ দোষ থাকিলেও 'বন্দেমাতরম্' সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমেরই জয় হইয়াছে।" ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১-৩২)।

বাংলা কবিতায় কি দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন? কাব্যের ভাষায় কোনো-না-কোনো ভাবে আভরণ থাকবেই— আমাদের এই অভ্যাস মধুসূদনের সময় থেকেই পাকা হয়ে আছে। গদ্যে এলাকায় কবিতার খানিকটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পরীক্ষায় হাত দিয়েও রবীন্দ্রনাথ আভরণহীন সাদা গদ্যে কোনো গদ্যকবিতা লেখেন নি। 'আষাঢ়ে' বইখানির সমালোচনায় ('ভারতী', অগ্রহায়ণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ছন্দ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। সে আপত্তি ওই চিরাচরিত অভ্যাস থেকেই আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কবিতা পড়িবার সময় পদ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া পড়িতে স্বতই চেষ্টা জন্মে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যদি স্খলন হইতে থাকে তবে তাহা বাধাজনক ও পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে।" পর্বের মাপ অসমান হয়ে পড়লেই এই বাধা জন্মায়। সেটা কবি ইচ্ছে করেই করতেন। উদ্দেশ্য, পদ্যকে মুখের ভাষার চালে চালানো। পরে কবিতার আঙ্গিকের এই কারুকর্ম নিয়ে রাশি রাশি তর্ক হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এসব তর্ক শুরু হবার অনেক অনেক আগে যে দৃষ্টান্ত রচনা করে গেছেন তা একালেও খুব দুঃসাহসের কাজ মনে হয়। এ কৃতিত্ব ছাড়াও সে সময়ের পটে তাঁর কবিতার অনন্যতা আমাদের কবিতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রোমান্টিক বিশ্বদৃষ্টির জাগরণ এবং বিকাশ যখন মূল প্রবণতা, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের না-রোমান্টিক মেজাজ বড়ো রকমের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই। তাঁর কবিতার এই চরিত্র বিশদ আলোচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুধীর চক্রবর্তী। এবং এও দেখিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের মেজাজে যে বিশিষ্ট বস্তুনিষ্ঠ কবিত্বের বীজ ছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। কবিতা বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্বচেতনার বা

কাব্যপ্রত্যয়ের শিরদাঁড়া পেলেন না শেষ অবধি এবং কবিতা লেখা ছেড়েই দিলেন। সে তুলনায় শিল্পমূল্যে খুব গৌরবের বস্তু না হয়ে উঠলেও নাটকে তিনি নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় সমকালীন স্বদেশের কিছু যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। বিশেষ উল্লেখেরই বিষয় যে, নাটকের গানে তিনি বড়ো মাপের সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। (পৃ. ১২১)। আমাদের অবিচিত্র নাটকের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশৈলী আলাদা করে চিনে নেওযাও যায়। এই মাধ্যমটি আশ্রয় করে যে তিনি দেশের চিত্ত অনেক দূর অবধি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন বড়গাছিয়া গ্রামের সেই কিশোরদের অভিনয় তারই নজির।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৮৯

গ. ১. ৪ আলোচক : পিনাকীরঞ্জন গুহ

সম্প্রতি কোনো বাঙালির যদি দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রয়োজন হয় তবে তাকে অবশ্যই দূরবীনের সাহায্য নিতে হবে। কারণ, ইদানীং দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোনো পপুলার মিডিয়া-র নেকনজরে নেই। অতএব বাঙালিও তাঁকে চেনে না বা জানে না। ইতিহাস, শিল্প সাহিত্য বা সংস্কৃতির প্রয়োজন বেশ কিছুকাল ধরেই ফুরিয়েছে। অতএব, এসবের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল বা তেমন কারোকে মনে রাখা সম্ভবও নয়। এসব দুঃখের কথা না বাড়ানোই ভালো। তবু প্রসঙ্গত মনে হয়ই। কারণ, এ বছর তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর জন্মমাস শ্রাবণ।

রবীন্দ্রনাথের দু'বছরের ছোট হয়েও রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার বছরেই দ্বিজেন্দ্রলালের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। যাবতীয় নাটক, কবিতা ও গান ছাড়াও সমসময়ে রবীন্দ্র-বিরোধের সূত্র ধরেই দ্বিজেন্দ্রলালের রায় বিশেষ বিতর্কিত হয়ে উঠেছিলেন। শেষ দিকের সাতটি বছর এই বিতর্ক-পর্বের ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাংলার সাহিত্য-মহল খুবই বিপর্যস্ত ছিল। এই বিসম্বাদে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রর ভূমিকা ততটা ছিল না । ছিল তথাকথিত ঘনিষ্ঠদের উস্কানি।

অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী সম্প্রতি লিখেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ' নামক একটি বিশিষ্ট বই। যদিও বইটির শুরুতে তিনি স্বীকার করেছেন, সমগ্র দ্বিজেন্দ্রলাল এতে নেই। বিভিন্ন সময়ে লেখা কিছু রচনার সংকলন মাত্র। দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকী থেকে এই পঁচিশ বছরে কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁকে লিখতে হয়েছে। বইটি তারই সম্মেলক। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার সিংহভাগ যাতে বহুবর্ণে ব্যাপ্ত, সেই নাট্য বিষয়ক কোনো আলোচনা বইটিতে রাখা যায়নি। এর সকারণ উল্লেখ অবশ্যই আছে। তবে নাটকের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলালের সময় বেশি ব্যয় হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুধীরবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে আলোচনা না করার পক্ষে দুটি কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক

বহু আলোচিত। দ্বিতীয়ত সেইসব নাটকের অধিকাংশর অভিনয় তিনি দেখেননি। সুধীরবাবুর দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ সম্পর্কে বলার কিছু নেই। তবে প্রথমটি খুব যুক্তিগ্রাহ্য কৈফিয়ৎ নয়। সুতরাং বইটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কিত যে কোনো অ্যাঙ্গেলের একটি রচনা থাকা খুবই জরুবি ছিল।

সুধীরবাবুর বইটিতে যেসব রচনা আছে তা নিঃসন্দেহে ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে 'অবহেলিত উত্তরাধিকার' এবং 'পুত্রের চোখে পিতা'—রচনা দুটি বিষয়বস্তুর জন্যই উল্লেখযোগ্য। তবে, কবিতা ও গান সম্পর্কিত চারটি রচনাও দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রসাদগুণে বিশিষ্ট। বইটির পরিশিষ্ট ও নির্দেশিকা পটটিও মূল্যবান এবং শ্রমসাপেক্ষ। পরবর্তী আগ্রহীদের কাছে এই অংশটি বিশেষ সহায়ক হবে। কেননা, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোচনার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

'অবহেলিত উত্তরাধিকার' পরিচ্ছেদটিতে দ্বিজেন্দ্র-চর্চার অভাব, অনাদর, অবহেলা প্রসঙ্গটি লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। তবে গোড়ার দিকে তুলনার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ এসে যাওয়ায় একটু খটকা লাগে। অস্বস্তিও হয়। বারবার তুলনায় রবীন্দ্রনাথও যেন খানিকটা অপরাধী হযে ওঠেন। দ্বিজেন্দ্র-চর্চার প্রয়োজনীয় উদ্যোগেব অভাব আজ নতুন নয়। ভেবে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা দ্বিজেন্দ্রলাল কেউই উপযুক্ত সমাদর লাভ করেননি। গানের সুবাদে ওই ত্রয়ীর তুলনায় বরং কাজী নজরুল ইসলাম এখনও ঠিক মিউজিয়ামের সামগ্রী নন। বাস্তব ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন, তার জন্য রবীন্দ্রনাথ দায়ী নন।

বইটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গানের বিস্তারিত আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ এবং যুক্তিগ্রাহ্য। 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি, পদ্যে' এবং 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব' বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে অব্যর্থ। দ্বিজেন্দ্র-গীতি প্রসঙ্গে 'দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্র-গীতি' পরিচ্ছেদটিতে ক্রমবিকাশ খুবই সুআলোচিত। সেই তুলনায় 'বাংলা গানে বিলাতি চাল' প্রবন্ধটি আলোচনার তুলনায় উদ্ধৃতিবহুল। তাহলেও এই চারটি প্রবন্ধই বইটির মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়েছে, সন্দেহ নেই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তুলনায় প্রতিপক্ষ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনও কখনও খুবই উপর্যুপরি। লেখক যেন অনেক ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিকতা ছাড়িয়ে আনমনে বিচরণ করেছেন। সেসব জায়গায় প্রায়শই এসে গেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, বইটির উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'পুত্রের চোখে পিতা'। ওই পরিচ্ছেদে দিলীপকুমার রায়েব অকৃত্রিম ব্যাখ্যা এবং লেখকের স্বকৃত বিশ্লেষণের মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে। এই অংশটি দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুবই জরুবি।

সব মিলিয়ে বইটির জন্য লেখক আগ্রহী পাঠকের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। দ্বিজেন্দ্রলালের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীই নয়, সামগ্রিকভাবে দ্বিজেন্দ্র-চর্চার অভাব ও অবহেলার নিরিখেও এই প্রয়াস মূল্যবান।

বর্তমান
১৬ জুলাই ১৯৮৯

(ঘ) শিক্ষা

ঘ. ১ লেখাপড়া করে যে

ঘ. ১. ১ আলোচক : স্বপন চক্রবর্তী

একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকের কথা শুনিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী তার বইয়ের শেষ লেখাটিতে। ট্রেন-বাস বদলে শেষটা পায়ে হেঁটে হুগলির এক গ্রামের ইশকুলে লাইফ সায়েন্স পড়াতে যান তিনি। ইশকুলে পৌঁছোনোর মেটে রাস্তা ধরলে প্রতিদিন তাঁকে কিছু স্থানীয় মাতব্বরের মুখোমুখি হতে হয়। বটগাছের তলায় বাঁশের মাচায় বসে গুলতানি করে চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষের এই দলটি। পার্টির দালালি, গণধোলাইয়ের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষকদের ওপর নজর রাখা এদের কাজের মধ্যে পড়ে। শিক্ষককে দেখলে তারা ঘড়িতে সময় মিলিয়ে বলে, 'কি মাস্টার এলে? হুঁঃ সময়মতোই এসেছে। রোজ তাই আসবা। ...মন দিয়ে পড়াবা। একদম ফাঁকি দেবা না। বুঝলে? মনে রাখবা, এই গ্রাম থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছ।' শিক্ষকদের মাইনে সরকার দেয়, একবার একজন শিক্ষক একথা বলে ফেলায় তাঁকে শুনতে হয়েছিল, 'টাকা সরকারের কি তোমার বাবার সেটা আমরা বুঝব। চাকরি করতে এসেছ চাকরি করবা। ...নইলে ঐ পা দুটো খোঁড়া করে দেব। চিরকালের মতো।'

আমাদের অনেকরই মনে হতে পারে যে গাছতলার স্বনিযুক্ত মুরুব্বিদের বোলচালের সঙ্গে দেশের অনেক নেতা ও আমলার হাবভাবের গভীর মিল আছে। শাসনের বাগ্‌বিধির এহেন গূঢ় অন্তর্ব্যাপ্তির পরিচয় হালে ত্রস্ত শিক্ষককুল প্রতিনিয়তই পাচ্ছেন। মাস্টারদের মাইনে দিতে হয় বলেই নাকি প্রতিটি রাজ্যের রাজকোষ শূন্য, হাসপাতাল-রাস্তাঘাট সরকারি পরিবার এই হাল। হবে, সরকারি টাকা কার বাপের সেটা শিক্ষকরা মুখের ওপর প্রশ্ন করবেন কোন সাহসে। পশ্চিমবঙ্গে তাও সরকারি স্কেল পাওয়া যায়, ওড়িশা নতুন বেতন চালু করা নিয়ে টালবাহনা চালিয়ে গেছে বছরের পর বছর। ওদিকে ছাত্রছাত্রীদের বাপ-মার কাছে বেশি পয়সা চেয়ে অপ্রিয় হতে হচ্ছে সরকারগুলিকে। মাস্টারদের ধান্দাবাজির মুণ্ডপাত করছেন ঝানু মন্ত্রী থেকে কচি সাংবাদিক, আবার কর্পোরেট কর্তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরাই আক্ষেপ করছেন যে মাস্টাররা বড় গেঁতো, রাষ্ট্রের লাই পেয়ে তাদের বারোটা বেজে গেছে, বাজারে মাল বেচে খেতে হলে এসব আখ্যান-ব্যাখ্যান ছুটে যেত।

ধিক্কার ও অনুকম্পায় জর্জর শিক্ষকরা নিজেরাই ভুলে যান তাঁরা অনেকেই দ্বিগুণ চতুর্গুণ আয়ের মোহ উপেক্ষা বা ত্যাগ করে এককালে এই পেশা বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের মনে থাকে না যে রাষ্ট্রের বদান্যতার সুবিধাভোগী তাঁরা নিজেরা নন, সুবিধাভোগী তাঁরা যাঁরা নিখরচায় এই শিক্ষকদের কাছে পড়ে আমলা-রাজনৈতিক নেতা-ব্যবসা পরিচালক হয়েছেন। একরাশ লাঞ্ছনা ও অপরাধবোধের গ্লানি মাথায় করে প্রত্যহ এক

ঘর ছাত্রের অবজ্ঞা ও উপহাসের মুখোমুখি হতে হয় যে শিক্ষককে, তাঁর দুই পা নতুন করে আর কী খোঁড়া করবেন বটবৃক্ষমূলের বিধায়ক?

অবস্থাটা চিরকাল এরকম ছিল না। শিক্ষকদের মাইনে কোনোকালেই আহামরি নয়, চাকরির শর্ত ও পরিবেশ কখনো সখনো রীতিমতো অপমানজনক। সেটা নিয়ে সমাজের এক ধরনের অস্বস্তিও ছিল, নইলে গরিব শিক্ষকের প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তির আদিখ্যেতা এই সেদিন পর্যন্ত দেখা যেত তার ব্যাখ্যা হয় না। এর অনেকটাই স্রেফ অভ্যাস, মেয়ের বিয়ে শিক্ষক পাত্রের সঙ্গে দিতে কোনো বাপ-মা বিশেষ রাজি ছিলেন না। তবু হয়তো এই অস্বস্তি ও প্রথার জোরেই শিক্ষকতাকে আর পাঁচটা চাকরির সঙ্গে এক করে দেখা হতো না। প্রণামী বিশেষ না জুটলেও শিক্ষকরা বর্ণনির্বিশেষে মানুষের প্রণাম পেতেন, ডাক্তাররা তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। অবশ্য যে সব অধ্যাপক সরকারি কলেজের মাইনে-পেনশন পেতেন, গেজেটেড অফিসার হিসেবে সমাজে তাঁদের একটা আলাদা খাতির ছিল।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আয় বাড়তে থাকে। ততদিনে অবশ্য মধ্যবিত্তের সামনে অন্য কয়েকটা লোভনীয় পথ খুলে গেছে। জাতীয়করণের দৌলতে ব্যাঙ্কে মাইনে তরতর করে বেড়েছে, বিভিন্ন সরকারি কমিশন নানা চাকরির ন্যূনতম মাইনে-ভাতা বেঁধে দিয়েছেন, উত্তর আমেরিকা ও কানাডায় চাকরি করার সুযোগ বেড়ে গেছে। এতৎসত্ত্বেও এ রাজ্যে আপিস-কলকারখানা ঝটপট বন্ধ হতে শুরু করায় মনে হতো শিক্ষকতার জীবিকায় একরকম নিরাপত্তা আছে। এরপর খেপে খেপে বেড়েছে অধ্যাপক ও ইশকুলের শিক্ষকদের বেতন, উন্নতির সুযোগ ও অবসরকালীন সুবিধা।

শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করার নামে সমাজে যে ভণ্ডামি চালু ছিল তার চেয়ে এই নতুন বন্দোবস্ত শতগুণ শ্রেয়। কিন্তু এসব সংস্কারের ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। নতুন স্কেলগুলিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কলেজের শিক্ষকদের বেতন বাড়লেও পেশাগত মর্যাদা কমে যায়, ওদিকে ইজ্জত বাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ও দেশের অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার-প্রোফেসার হবার সুযোগ আছে, গবেষণা ও বিদেশযাত্রার পথে বাধা সেখানে খানিকটা কম, পদের সংখ্যা বেশি, স্নাতকোত্তর পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের পড়ানোর পক্ষে অনুকূল। অন্যদিকে বছর পনেরো আগেও বেসরকারি কলেজে লেকচারারের চাইতে উঁচু কোনো পদ প্রায় ছিলই না। সরকারি কলেজে সিনিয়র সার্ভিস ও প্রোফেসারের পদ ছিল বটে, কিন্তু সত্তরের সংস্কারে ওই পদের মর্যাদা খর্ব করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারের সমতুল্য করে দেওয়া হয়। এর ওপর সরকারি চাকরির অন্যান্য হ্যাপার একটিও লাঘব করা হলো না। এ রাজ্যে স্টাডি লিভ সংক্রান্ত নিয়মের প্রশংসনীয় সংস্কার হলেও বদলি, গোপন রিপোর্ট, অ্যাসেট ডিক্লারেশন, তুচ্ছতম ব্যাপারে রাইটার্সে দৌড়োদৌড়ি, অধ্যক্ষদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার পথে নানা বিধিনিষেধ, সরকারি কর্মীদের রাজনৈতিক মতপ্রকাশে বাধা— এসব ঔপনিবেশিক প্রতিষেধক দিব্যি বহাল

রইল। এগুলি প্রত্যেকটি অপ্রয়োজনীয় এমন কথা যেসব অধ্যাপকরা মনে করতেন না তাঁরাও নিজেদের চাকরির ইজ্জত খাটো হয়ে যাওয়ায় এই সার্ভিস রুলসের পিঞ্জরে হাঁপিয়ে ওঠেন। সত্তর দশক থেকেই শুরু হয় সরকারি চাকরি থেকে অধ্যাপকদের গণ-নিষ্ক্রমণ। যাঁরা রয়ে যান তাঁদের মধ্যে সাধ করে থেকে গিয়েছিলেন হাতে-গোনা কয়েকজন। আশি-নব্বইয়ের দশকগুলিতে দেশের অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অধ্যাপকদের অবস্থার অবনতি কম হয়েছে। কিন্তু সেই সুখ সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের ভাগে কিছুটা তেমন পড়েছিল বলে মনে হয় না।

আরো কয়েকটি সমস্যার কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। মাইনে বাড়লেই 'দায়বদ্ধতা' ও 'কর্মসংস্কৃতি' সংক্রান্ত প্রশ্ন ওঠে। সরকার যাঁদের মাইনে দেয় তাঁদের ক্ষেত্রে আরো বেশি করে। এমনিতে এটা কোনো মন্দ ব্যাপার নয়, জবাবদিহি করার একটা দায় যে কোনো পেশাতেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রাইভেট টিউশনি ও চিকিৎসক-শিক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিশ ঠেকাতে গিয়ে শিক্ষকদের সবরকম ব্যক্তিগত উদ্যোগকে দমবন্ধ করে মারা বোধহয় কাজের কথা নয়। টিউশনি আগের মতোই চলেছে, অথচ শিক্ষকতা ছেড়ে চলে গেছেন বহু চিকিৎসক, স্থপতি, আইনজ্ঞ, ব্যবসা পরিচালক, গ্রন্থাগারিক, চিত্রশিল্পী, সংগীতশিল্পী। শিক্ষকতার পেশা যে এতরকম প্রতিভাবান ও উদ্যমী বিশেষজ্ঞদেরও পেশা, এটা অনেকেই ভুলে যান। প্রতিটি ব্যাপারে শিক্ষকদের রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য করার পর এখন দেখছি তাঁদের আলস্যের নিন্দায় অর্বাচীনতম রিপোর্টারও মুখর। যাঁদের সুযোগ ছিল তাঁরা চলে গেছেন বিদেশে, দেশের গবেষণাকেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটগুলিতে, বা শিল্প-বাণিজ্যে ও স্বনিযুক্ত পেশায়। কংগ্রেসি আমল থেকেই গবেষণাকেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটগুলির কদর বেশি, এখন তাদের সুনামের জোরে সেখানকার অধ্যাপকদের কনসালটেন্সির সুযোগ দেদার। হরেদরে এখন যা দাঁড়িয়েছে তা হলো সরকারি হাসপাতালগুলির মতোই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের গলগ্রহ। বছরের পর বছর এদের স্বাধীন বিকাশের প্রতিটি অঙ্কুর পিষে মারার পর এখন তাদের বলা হচ্ছে চরে খেতে। মাস্টারদের পা চিরতরে খোঁড়া করে দেবার পর তাঁদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপদেশ গাছতলার গেঁয়ো মাতব্বররাও দেয়নি।

বলা হয় এ সমস্তই দেশের অর্থনীতির মোড়বদলের জের। ইন্দিরা গান্ধীর আমলের চরম রাষ্ট্রিকতা থেকে এখনকার ন্যূনবাদী নীতি পর্যন্ত যে নাটকীয় পর্বান্তর তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। খানিকটা হলেও কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। সরকারি ব্যয় কমলেই যে রাষ্ট্র পিছু হটবে এমন আশা বৃথা। শিক্ষার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হালে রাষ্ট্রের খবরদারি কমেনি, বরং বেড়েছে। গরিব দেশে শিক্ষার মতো সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায় কখনোই এড়ানো সম্ভব হবে না, এটা জেনেই শিক্ষাকে মতাদর্শের লড়াইয়ে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে দেশের শাসককুল। অঙ্গ রাজ্যগুলি এই জবরদস্তি কিছুটা রুখতে পারে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় থাকায়। অথচ সকলেই জানেন নয়া ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির রোজগার নেই, শিক্ষকদের মাইনে তারা সময়মতো দিতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সোহাগ কমলেও শাসন জারি থাকবে জেনে সামাজিক সেক্টরে

রাষ্ট্রের বিনিয়োগ বজায় রেখেও অর্থসংস্থানের একটা নমনীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল রাজ্যগুলির। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশির ভাগ রাজ্যের নীতিপ্রণেতারা খুব একটা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেননি। ফলে সুপ্রিম কোর্ট যাই বলুক, বিভিন্ন নামে ক্যাপিটেশন ফি চালু হয়েছে সারা দেশে, শুরু হতে চলেছে এ রাজ্যেও।

প্রশিক্ষিত কর্মচারীর চাহিদা ও কাঁচা টাকার জোর যে রাজ্যগুলিতে বেশি সেখানে অবশ্য অনেক আগেই শিক্ষার এই পণপ্রথা চালু করা গেছে। শিক্ষা জগতের প্রশাসন ও নীতি যাঁদের হাতে তাঁদের গরিব ছাত্র, বিশেষ করে গ্রামের ছাত্র সম্পর্কে কোনো শ্রেণীগত পিছুটান আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ ইত্যাদি সংস্থার কাজকারবার এমনিতেই নগরাভিমুখী। ভবিষ্যতে এর যে খুব একটা পরিবর্তন হবে এমন আশা সুদূরপরাহত। অধ্যাপকদের মাইনে বাড়ায় গ্রামের গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী সন্তানরা এই পেশায় বেশি করে আসবে বলে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের আশায় বাদ সেধেছে দেশব্যাপী এক অদ্ভুত নিয়োগনীতি। বিদেশি ডিগ্রি বা নিদেনপক্ষে দেশি পি এইচ ডি না পেলে আজকাল ভালো প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার চাকরি জোটানো যায় না। তার মানে বারো বছর ইশকুলের পর কম করে আরো দশ বছর উচ্চশিক্ষায় লগ্নি করার সময় ও সামর্থ্য যাঁদের আছে তাঁরাই এই চাকরিতে আসছেন। মেধাবী ছাত্রকে চাকরি দিয়ে পরে তাকে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উন্নতির সুযোগ করে দেয় পশ্চিমেব ও এশিয়ার অনেক সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের গরিব দেশে এই বিকল্পটি ক্রমশই দুর্লভ হয়ে আসছে। এই প্রক্রিয়া পেরিয়ে যাঁরা অধ্যাপক হবেন তাঁরা ক্রমে শিক্ষা-প্রশাসক বা শিক্ষানীতির রূপকার হলে মফস্বল ও গ্রামের দুঃখ বুঝবেন এমন আশা নেই।

শুরু করেছিলাম ইশকুলের শিক্ষকের গল্প দিয়ে, পরে আলোচনাটা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রসঙ্গে আটকে গেল। তার কারণ আলোচ্য বইটিতে এই প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক ছত্রিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন, এবং এই সময়টার প্রায় পুরোটাই তিনি কাটিয়েছেন মফস্বলের সরকারি কলেজে। এই কালপর্ব জুড়ে বদলেছে সরকারি কলেজের মান, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা, ছাত্রদের চাহিদা, অভিভাবকদের প্রত্যাশা, রাষ্ট্রের শাসকদল ও শিক্ষানীতি। বদলেছেন অধ্যাপকও। বইটি এক হিসেবে এই পরিবর্তনের কড়চা, অন্য হিসেবে 'এরকম স্বীকারোক্তি ও আত্ম অবলোকন'।

পূর্বোক্ত বেশ কিছু প্রসঙ্গ এসেছে গ্রন্থভুক্ত আটটি লেখায়—সরকারি কলেজের অধোগমন, মফস্বল কলেজের সমস্যা, বদলির নীতি, অধ্যাপকদের শ্রেণীভেদ, টিউশানি, শিক্ষকতা পেশার মর্যাদাহানি, ছাত্র রাজনীতি। দোষারোপে রুচি নেই লেখকের। তার বদলে রয়েছে সরস কথন, তির্যক শ্লেষ, এবং কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্র— টিউটোরিয়াল হোমের মালিক, সরকারি কলেজের পিওন ও হেড ক্লার্ক, মফস্বল শহরের টিউটর, ছাত্রনেতা এবং শিক্ষকতায় সহনীয়তার আস্থা ফিরিয়ে আনেন এমন কিছু নিরভিমানী সন্ধিৎসু মানুষ। সহজ কথা সহজে বলার কঠিন কাজে সুধীর চক্রবর্তীর স্বভাবসিদ্ধির কথা তাঁর পাঠকমাত্রই জানেন। কিন্তু এই লেখাগুলিতে সহজ কথা কোথাও কঠিন প্রসঙ্গ

গুলিকে এড়াতে ব্যস্ত নয়। সেই প্রসঙ্গগুলির সমালোচক বেরসিকভাবে ফের পাড়তে পারেন কেবল। তবে পড়া ও পড়ানো নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের এই বইটি যে পড়ে দেখতে হবে এ কথা তিনি সানন্দে রাষ্ট্র করতেই পারেন।

বারোমাস
শারদীয় ২০০৩

ঘ. ১. ২ আলোচক : দীপেন্দু চক্রবর্তী

সব বই পুরোপুরি পড়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনও হয় না—এ কথা বহু যুগ আগেই বলেছিলেন বেকন সাহেব, এবং তা এখন এই অতি প্রকাশনার যুগে যেন আরও বেশি প্রযোজ্য হয়ে উঠেছে। সুধীর চক্রবর্তীর 'লেখাপড়া করে যে' এমনই একটি বই যা পড়তে শুরু করলে থামা যায় না। পুরোপুরি পড়তে হয়। এ যেন এক গল্প সংকলন, এমনই এর পাঠ্যগুণ, অথচ এটি কোনও গল্প-সংকলন নয়। তবে কি প্রবন্ধ-সংকলন? বিষয় যখন লেখাপড়ার এক নেপথ্য কাহিনী তখন সংকলিত লেখাগুলিকে তো প্রবন্ধই বলা উচিত। কিন্তু প্রবন্ধের জন্য, বিশেষ করে শিক্ষা নামক বিতর্কিত বিষয়ে, যে-রকম তথ্য, পরিসংখ্যান ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দরকার, সে-পথে তিনি হাঁটেননি। তিনি লিখেছেন অধ্যাপক হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, তাহলে তো বইটিকে আত্মজীবনীমূলক এই অভিধায় চিহ্নিত করতে হয়। তবু এ-বই শুধুমাত্র আত্মজীবনের আখ্যান নয়, ব্যক্তিক সীমানা ছাড়িয়ে স্পর্শ করেছে শিক্ষাজগতের বহু আলোচিত বিষয়গুলি—যেমন টিউটরিয়াল হোম, প্রাইভেট টিউশন, সরকারি ও স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপকীয় জগতের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা, পরিবর্তিত বেতন কাঠামোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতছানি, সন্তান পালনের নামে বর্তমান অভিভাবকদের ঘোড়দৌড় ইত্যাদি। এসব বিষয় নিয়ে অনেক অনেক কথা বলা হয়, লেখা হয়, কিন্তু এত রসালো পরিবেশন কম দেখা যায়। সুধীর চক্রবর্তীর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি গবেষকের গুরুগম্ভীর নিরাসক্ত অবস্থান ও তথাকথিত রম্যরচনার চপলতা কোনওটাই অবলম্বন করেননি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এই দুটি পরিপূরক পথ ধরে তিনি বিষয়ের সঙ্গে কখনও যুক্ত কখনও বিযুক্ত হয়ে তাঁর তৃপ্তি-অতৃপ্তি, রাগ-অনুরাগ, প্রত্যাশা ও প্রশ্ন এমন এক কোমল স্বরে ও কৌতুকের সুরে উচ্চারণ করেছেন যা আমাদের ভাবতে ভাবতে হাসায়, এবং হাসতে হাসতে ভাবায়। এই কাজটি তখনই সম্ভব যখন ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও গল্পলেখক একই বয়ানে মিশে যায়।

লেখকের নিজের ভাষায়, 'গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের ছাঁচে এসব কথা হয়তো আঁটতও না', কেননা শিক্ষাজগতের অন্দরমহলের বাসিন্দা হিসেবে 'এ-বই আসলে একরকম স্বীকারোক্তি ও আত্ম-অবলোকন'। এর সঙ্গে এটাও বলতে হয়, যে-ধাঁচের আখ্যান তিনি রচনা করেছেন একমাত্র তাতেই জীবন্ত অভিজ্ঞতার নানান খুঁটিনাটি ধরা যায়, এবং এই

খুঁটিনাটির মধ্যেই উঁকি দিয়ে যায় বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়া।

ধরা যাক প্রথম রচনাটি 'সেই ট্রাডিশন সমানে'। কলকাতার একটি টিউটরিয়াল হোমের সঙ্গে লেখকের জড়িয়ে পড়ার কাহিনী। যাঁরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয় নিয়ে হাহাকার করে থাকেন, এবং কিছুতেই বিষবৃক্ষের শেকড় সন্ধানে অতীতমুখী হবেন না তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, আলোচ্য টিউটরিয়ালটি 'চুয়াল্লিশ বছর' আগেই স্বমহিমায় বিরাজ করত। যিনি এই প্রতিষ্ঠানের মালিক সেই দুলালচন্দ্র দত্ত তখনই বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষাও পণ্য হতে পারে, এবং তা কেনা-বেচার জন্য লোকের অভাব হয় না, তাতে এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও সাগ্রহে অংশ নেন। দুলালচন্দ্র দত্তের অজস্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ও তা বিক্রি করার কেরামতিও আছে। স্বচক্ষে সব দেখেও সুধীর চক্রবর্তী কিন্তু এই ব্যক্তিকে ভিলেন হিসেবে দেখাননি। বরং তাঁর জমিদারি মেজাজ, বদান্যতা ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যে মনে হয় তিনিও একটি দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থারই বিকলাঙ্গ সন্তান। সুধীরবাবু গল্প লিখলে মনে হয় অনেককেই ছাড়িয়ে যাবেন। শিক্ষাজগতের অলিগলিতে অদ্ভুত সব চরিত্র তিনি এমনভাবে এঁকেছেন যে মনে হয় এ শুধু কোনও পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট নয়, এ তো একজন প্রথম সারির গল্প লেখকের মূর্তি গড়ার নমুনা। আজকের একজন ঢালাও টিউশনি করা শিক্ষক মফস্বলে কেমন হিন্দি সিনেমার ঢঙে একজন শিক্ষিকাকে প্রেমিকা হিসেবে পেয়ে যান এবং সুখে ঘর করেন, এই ঘটনা শুধু এইটুকু বোঝায় দুলাল দত্তদের উত্তরাধিকার সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে, এবং যুগোপযোগী চেহারাই নিয়েছে। সুধীরবাবুর কাছে জানা গেল মফস্বলে টিউশনি পড়া বলে একটা কথা চালু আছে। ছাত্রছাত্রীরা শুধু পড়তেই যায় না সেখানে, তাদের অন্য রকম জগৎও তৈরি হয় সেখানে, বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের নানান অনুষ্ঠানে একটা সমান্তরাল প্রাতিষ্ঠানিকতাও তৈরি হয়। তবে এর মধ্যেই এমন টিউটরকে তিনি দেখেছেন যিনি শুধু অর্থের জন্য নয়, প্রকৃত জ্ঞানদানের জন্যও সদাব্যস্ত থাকেন। টিউশনি নিয়ে আজ যে-বিতর্ক ও সরকারি বিধিনিষেধ তার এক কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন লেখক— এক দিকে টিউশনির পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল, অন্য দিকে সরকারি বিজ্ঞপ্তি এর বিরুদ্ধে, মাঝখানে টেলিফোনে টিউটরদের হুমকি শিক্ষিত বেকারদের। গোটা ছবিটি যতটাই বেদনাদায়ক ততটাই কৌতুককর। এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অভিভাবকদেরও যথাযোগ্য স্থান দিয়েছেন লেখক। ছোট পরিবারকে আরও সুখী করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় একমাত্র সন্তানকে এভারেস্ট-জয়ী করার যে প্রতিযোগিতা চলছে পিতামাতাদের মধ্যে তার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি মুচকি হেসে। তারিফ করাব মতো তাঁর মন্তব্য— 'স্টেশন থেকে দু'মিনিট দূরত্বে গর্ভপাতের নিরাপদ এম. টি. পি. সেন্টার। তার পাশেই জানানদারি স্টেশনের উত্তরপূর্ব কোণে রবিদার নির্ভরযোগ্য কোচিং।'

সুধীর চক্রবর্তী সঙ্গীতজ্ঞ, আমরা জানি। তাই বাংলা পপ গানের মধ্যেও তিনি বর্তমান কোচিং ক্লাসের কালচারকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন (লেখাপড়া করে যে)। এই রচনাটির বিভিন্ন অংশের নামও সাঙ্গীতিক—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। শুধু কি

তাই, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাব নানান সংকটের বর্ণনা দিতে গিয়েও তিনি নানান গানের বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের, নানান পঙ্‌ক্তি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে পড়ে আমাদের না হেসে উপায় নেই। এ যেন কোনও দক্ষ কার্টুনিস্টের খেলা। সরকারি কলেজের বদলি ইত্যাদি ব্যাপারে রবীন্দ্রসঙ্গীত যে এতটা প্রাসঙ্গিক তা তাঁর লেখা না পড়লে বোঝা যেত না।

দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে চাকরি করার জন্য তিনি এমন একটি শিক্ষাজগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছেন যা অবক্ষয়ী জমিদারপ্রথার সঙ্গে তুলনীয়। একদা গর্বোদ্ধত সরকারি কলেজের অধ্যাপকেরা বিভিন্ন পদমর্যাদার পতাকা কেমন করে প্রদর্শন করতেন, এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনের পর কীভাবে তাঁদের ক্রমশ গৌরবহানি হল, তার ট্র্যাজি-কমিক আখ্যান তিনিই রচনা করতে পারেন যিনি শুধু অন্যদের নিয়েই হাসাহাসি করেন না, নিজেকে নিয়েও হাসতে পারেন (ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে)। তবে হাসানোটাই তাঁর প্রধান কাজ নয়, প্রয়োজনে তিনি রূঢ় কথা বলতেও ছাড়েননি, যেমন—'প্রত্যেকটি সরকারি কলেজ বলতে গেলে এক-এক রকমের খাঁচা আর সেই খাঁচার মাপে তার চিড়িয়াগুলোর স্বভাব বা ধরনধারণ গড়ে ওঠে।' সুধীরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলে আরও কিছু নমুনা দিতে পারতেন। সরকারি কলেজ-শিক্ষকদের সংগঠন সম্বন্ধেও তাঁর নির্ভীক মন্তব্য শ্রদ্ধা জাগায়।

আটটি রচনার সংকলন বিভিন্ন সময়ে চিহ্ন ধারণ করলেও তাদের যোগসূত্রটি সহজেই ধরা যায়। সব মিলিয়ে এ বইটি যারা শিক্ষক এবং যাঁরা শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামান তাঁদেরই আত্মদর্শন। যাঁরা আদর্শবাদী পণ্ডিত তাঁরা হয়তো ভাবতে পারেন এই বৃত্তের বাইরে তাঁদের অবস্থান, সুতরাং লেখাপড়ার লেনদেনের কারবারে তাঁরা কোনওভাবেই জড়িত নন। পার্টি রাজনীতির আধিপত্য এখন এতই স্পষ্ট যে তা আর বিতর্কের বিষয় নয়। কিন্তু আব একটি রাজনীতি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তা হল আদর্শবাদী পণ্ডিতদের গোষ্ঠীগত রাজনীতি, যার নিয়মে বিরুদ্ধ-গোষ্ঠীর পণ্ডিত কোনওরকম স্বীকৃতি পান না, অথচ নিজেদের অতি সাধারণ মানের সদস্য অভিনন্দিত হন। সুধীর চক্রবর্তীর মতো কেউ কি 'লেখাপড়া করে যে'-এর মতো আর একটি গ্রন্থ উপহার দেবেন, যেখানে বিখ্যাত অধ্যাপকেরা শিক্ষাজগতে নিজেদের মূর্তি-নির্মাণেই তাঁদের সব আদর্শবাদ প্রয়োগ করে চলেছেন? সেই গ্রন্থটিতেও প্রয়োজন দেবাশীষ দেব-কৃত আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ, তবে সনাতন অধ্যাপকের জায়গায় বসাতে হবে অতি-আধুনিক বিদেশ ভ্রমণকারী অধ্যাপকের আত্মসচেতন মুখভঙ্গিমা। বোঝাতে হবে, লেখাপড়া করে যে সে গাড়িঘোড়া নয়, এখন এরোপ্লেনেই চড়ে। ঠিক এইখানেই আদর্শহীন শিক্ষা-ব্যবসায়ী ও আদর্শবান শিক্ষাদাতা অনেকেই ভিন্ন রুট ধরে এসেও খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দাবাড়ু হয়ে যান। আর তাঁদের ভক্তদের কীর্তনগানে চাপা পড়ে যায় একটা গ্রাম-প্রধান দেশের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

দেশ

১৭ মার্চ ২০০৪

(ঙ) আখ্যান

ঙ. ১ সদর মফঃস্বল

ঙ. ১.১. আলোচক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বেছে বেছে নয়, বই আমি যা পাই তাই পড়ি। খুব সম্প্রতি একটা বই আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়ে গেল। সুধীর চক্রবর্তীর 'সদর মফঃস্বল'। সুধীরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আমার সহপাঠী ছিল। স্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে পড়েছি। এখন কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান। এতদিন ওর গবেষণামূলক লেখাই পড়েছি। 'গভীর নির্জন পথে' বইটা বাংলার লৌকিক ধর্মসম্প্রদায় নিয়ে লেখা। 'সদর মফঃস্বল' একেবারে অন্যরকম। গল্প-উপন্যাস নয়। রম্যরচনা বা রিপোর্তাজও নয়। একথা সুধীর গোড়াতেই মুখবন্ধে বলে নিয়েছে। কিন্তু আছে মানুষের গল্প। শহর, বিশেষ করে কলকাতাব সঙ্গে গ্রাম মফস্বলের মনোগঠন আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেরই বিরাট তফাত। আমি নিজে মফঃস্বলে ছিলাম। নিজের কাজে এখনও মফঃস্বলে ঘুরতে হয়। তাই তফাতটা আরও বেশি করে টের পাই। ছোটবেলা থেকে দেখা সেই বাংলার মুখ খুঁজে পেয়েছি বলেই বোধহয় বইটা আমার আরও ভাল লেগেছে। কৌতুক আছে, গাম্ভীর্য আছে, আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাও। সবই মানুষের গল্প বলার ছলে। রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার আর্তি। অনেক চরিত্র - বলতে গেলে চরিত্রের চিত্রশালা। করিমপুর সীমান্তের কাছে থাকে রূপা। তার স্বামী স্মাগলার। এখন আরবদেশে চলে গেছে। সেই রূপার পরিবারে ওপর সামাজিক প্রতিক্রিয়ার চমৎকার ছবি রয়েছে। সংসারে অভাব ঘুচে গেছে, কিন্তু রয়েছে একাকিত্ব। রয়েছে ঝি, চাকর, চালের চোরাচালানিদের কথা, তাদের গল্প। ধর্ম নিয়ে এই হইচইয়ের মধ্যে সুধীরের বইতে পড়লাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা দারুণ কাহিনী। মুসলিম অধ্যুষিত এক গাঁয়ে মাত্র একঘর হিন্দু ছিল। সেই পরিবারের কর্তাটি মারা যেতে মুসলমান গ্রামবাসীরা হরিধ্বনি দিয়ে দাহ করে এসেছেন। চাঁদা তুলে শ্রাদ্ধকর্ম করেছেন। এটাই কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক ছবি। মানুষের প্রতি এই ভালবাসা বারবার খুঁজে পেয়েছি বইটায়। মানুষের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, গভীর মূল্যবোধ রয়েছে। কৌতুক, শ্লেষ, ব্যঙ্গ রয়েছে — কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। কোথাও কোনও জীবন বিরোধিতা নেই। কাজের খাতিরে আমাকে নানারকম বই পড়তে হয়। তার বাইরেও যা ভাল লাগছে পড়ছি। আমি নাটক ভালবাসি। তাই 'সদর মফঃস্বল'-এর হেডমাস্টার সহদেব পাল, অর্ধশিক্ষিত হরিচরণ, বাউল কৈলাশ কয়াল, গুণীবাবুরা আমাকে নাড়া দিয়ে গেল।

[নিবন্ধটি 'বইপড়া' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল]

আজকাল

১৮ আগস্ট ১৯৯২

আলোচক : আনন্দ বাগচী

যতদূর মনে পড়ছে, ছাত্রজীবনের শেষদিকে সুধীর চক্রবর্তী পরিচিত ছিলেন কবি হিসেবেই। কবিতা আর ছড়া লিখতেন অজস্র। তার কিছু কিছু প্রকাশ করতেন, বাকি বেশির ভাগই জমা থাকত, তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসাবে। কখনও বা খেয়ালী বান্ধব সমাবেশে সেগুলি শ্রব্য ছিল। যেমন ছিল তাঁর দরাজ গলার গান। দ্বিজেন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের গান বিশেষ করে। গান তাঁর কাছে কেবল শখের ব্যাপার ছিল না, শেখার ব্যাপারও ছিল। গানের গুরুও ধরেছিলেন তিনি। আর ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন সেই সিরিয়াস টাইপের পড়ুয়া, পরীক্ষা-ফলের দিকে তাকিয়ে যাঁরা লম্ফমান নন, পাঠ্যকেতাবের বাইরেই যাঁদের কৌতূহল এবং অন্বেষণ অহরহ সজাগ থাকে। স্পষ্ট অথচ নম্রভাষী সুধীর ছিলেন অন্তরঙ্গ, আড্ডাপ্রিয় এবং বন্ধুবৎসল। মফস্বলাগত হয়েও কৃষ্ণনাগরিক সপ্রতিভতা ছিল তাঁর মধ্যে, গবেষণাধর্মী মানসিকতা এবং পর্যবেক্ষণী ঔৎসুক্য যুগপৎ। গ্রাম্যতাবর্জিত এই তরুণ ইউনিভার্সিটির তোরণ পেরিয়ে চলে গেলেন স্বভূমে, মফস্বলের সরকারী কলেজে। আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বিচ্ছেদ ঘটলো এই সময় থেকেই। কৃষ্ণনগগরে গিয়ে কাব্যচর্চায় সম্ভবত ইস্তফাই দিলেন সুধীর, কারণ পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা কিংবা ছড়া আর তেমন চোখে পড়ছিল না আমার। হতেই পারে, কারণ তিনি তখন দায়িত্বশীল অধ্যাপক, ছাত্রজগৎ নিয়ে নতুন ভাবনায় মেতে উঠেছেন। দৃষ্টি এবং মনোযোগ ঘুরে গেছে অন্যদিকে, জীবনজীবিকার পরিপ্রেক্ষিতে ঘেরা মানুষের দিকে। কবি এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও তাঁর প্রাবন্ধিক কলম ভিন্নমুখী হয়েছে, তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রকর্মের পটভূমি বদলেছে, তিনি হাতেকলমে ঝুঁকে পড়েছেন সংগীত শিল্পকলা ও লোকধর্মের দিকে। একাধিক গ্রন্থের জন্ম হয়েছে ক্রমে ক্রমে। 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : স্মরণ বিস্মরণ' গ্রন্থটি ছাড়া বাকিগুলি ভিন্ন পর্যায়ের। যেমন—'গভীর নির্জন পথে', 'সাহেবধনী সম্প্রদায় : তাদের গান' 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান', 'গানের লীলার সেই কিনারে', বাংলা গানের সন্ধানে', কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ'। তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থও আছে। 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প', 'আধুনিক বাংলা গান','বাংলা দেহতত্ত্বের গান' এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। দীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পরে সুধীরের সঙ্গে আমার পুর্নদর্শন ঘটলো আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সম্ভবত। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর অনেক রচনাই আমার অপঠিত থাকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিই ছিল আমার কাছে তাঁর রচনাকর্মের প্রত্যক্ষ নিরিখ, ফলে তাঁর মোড় ফেরার, কল্পসাহিত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন চোখে পড়েনি। সম্প্রতি সুধীর চক্রবর্তীর 'সদর মফস্বল' হাতে আসায় চমকে গেলাম। দীর্ঘ অন্তর্ধানের পর আবার সেই লেখক মানুষটির সঙ্গে যেন দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। এ তো মননিষ্ঠ গবেষণা নয়, এ সৃজনশীল অর্ন্তদৃষ্টির অলোছায়ায় মানুষের আত্মানুসন্ধান, 'মনের' মানুষের সরস সরেজমিন তল্লাস। 'আত্মপক্ষ' ব্যাখ্যায় লেখক জানিয়েছেন, "সদর-মফস্বল বইয়ের অন্তর্গত রচনাগুলি স্বাদেগন্ধে চরিত্রে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় একটু হাওয়া

বদলের আভাস আনতে চেয়েছে। লেখাগুলি একজন মফস্বলবাসীর, যদিও সদরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও দেওয়া-নেওয়া বেশ ঘনিষ্ঠ ও সানুপুঙ্খ। রচনাগুলির জাতবিচার অবশ্য কঠিন। তবে নির্ভয়ে বলা চলে এগুলি গল্প, রিপোর্টাজ বা রম্য রচনার শ্রেণীভুক্ত নয়।" নয় যদি, তবে এর শ্রেণী গোত্র কি? এটা কি স্মৃতির রেখায় ধরা শিথিলবদ্ধ কাহিনী, যাকে এক অর্থে বহুসূত্রী উপন্যাসিকা বলতে পারি, আত্মজীবনের প্রচ্ছন্ন সুতোয় গাঁথা। বাংলাসাহিত্যের প্রচলিত ধারায় একটু স্বাদবদল যে ঘটল তাতে সন্দেহ নেই। সুধীরের সপ্রতিভ কথনভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে রক্ষণশীলতার আড়ভাঙা দুঃসাহস, যথোচিত শব্দব্যবহারের নৈপুণ্য ও দার্শনিক রসদৃষ্টি।

আনন্দ-বিষাদ-বিস্ময়কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে তির্যক কৌতুক এবং শ্লেষকষায় বিশ্লেষণ। অনেকগুলি সম্ভবনাময় গল্পকে তিনি যে ভাবে নির্বিচারে নষ্ট করেছেন, দেখে কষ্ট হয়। এত অসংখ্য চরিত্র যিনি দেখেছেন, এত বিচিত্র পরিবেশের অভিজ্ঞতা যাঁর সঞ্চয়ে আছে তিনি অনায়াসেই তাকে পুরোপুরি গল্পমূর্তি দিতে পারতেন কিন্তু দেননি! হাসির এবং গভীর অন্তঃস্পর্শী গল্প লেখার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, এই দ্রুতগতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাহিনীধর্মী রচনার মধ্যেও সেটা জানান দিয়েছে থেকে থেকে। তবে এটাও ঠিক, সাংবাদিক প্রতিবেদনধর্মিতা এবং নিবন্ধনিষ্ঠ শৈলী এখনো তাঁর কলমের নিবে জড়িয়ে আছে। দীর্ঘ অনভ্যাস সৃজনশীল মানুষকে অতিক্রম করতে হয় আবার নতুন উদ্যমে, অনুপুঙ্খ অনুশীলনে। সুধীরকে হয়তো সেটাই করতে হবে। করলে তিনি সফল হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, সুধীর আবার ফিরে আসছেন কল্পসাহিত্যের জগতে। আবার গল্প উপন্যাসে হাত দিতে তিনি বাধ্য হবেন অচিরেই। তাঁর দ্বিরাগমনের পদধ্বনি বোধ হয় ঠিক শুনতে পেলাম এই 'সদর-মফস্বল' নামক সার্থক বইটির মধ্যে। সুধীর মৈত্রের প্রচ্ছদ এবং যুধাজিৎ সেনগুপ্তের স্কেচগুলি উপভোগ্য হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে লেখা সদর মফস্বল, শহর-অশহর, চেনা-অচেনা, ধর্ম-অধর্ম, জীবন-জীবিকা ও শিক্ষা অশিক্ষা এই ছটি রচনার যোগসুত্রে গ্রন্থটি গড়ে উঠেছে।

দেশ

[ ]

৬. ১. ৩ আলোচক : **অজিত মণ্ডল**

সন্দেহ নেই বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লেখকের আকর্ষণীয় রচনাশৈলী আলোচ্য গ্রন্থের সম্পদ। মজলিশি কথ্যভাষা ও সুচারু শব্দ ব্যবহারে পাঠক মুগ্ধ। রচনার অনায়াস সৌন্দর্য এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। শুরু করলে সহজে ছাড়া কঠিন। ভাষা ভাব ভাবনা এমন সরসভঙ্গি অনুসরণ করেছে যা সচরাচর দেখা যায়না। তবে এই যে স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি, এর পেছনে লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসু চোখ আর ব্যাপক অভিজ্ঞতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

সমাজের সব ধরনের পেশার মানুষকে তিনি দেখেছেন, আর দেখার চোখটিও লেখকের নিজস্ব। আছে নানা চরিত্র—রিকসাঅলা ডাক্তার হাকিম সাংবাদিক, কি নেই! সমাজে লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী দিকটি কোথাও শ্লেষ ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ছেড়ে স্রেফ স্নিগ্ধ হাস্যরসের কাহিনী অবলম্বন করে মানুষের জীবনের অসঙ্গতি অথবা প্রার্থিত পরিণতির চিত্র এঁকেছেন। আবার অনাবিল হাসির মধ্যে মানবজীবনের করুণ বিয়োগান্তক ছবিও উপহার দেন কিছু কাহিনীর পটভূমিকায়। ছোট ছোট চিত্র, ছোট ছোট কাহিনী—যেন বিমূর্ত শিল্পের মত, যাতে অনেককিছু বলা হয়ে যায়, আর না বলা কথা গভীর ব্যঞ্জনায় উপলব্ধির অভ্যন্তরে চলে যায়। হালিশহরের ন্যাড়াদা, ভদ্রেশ্বর চন্দননগরের সত্যাচরণ সাধুখাঁ, ডাক্তার সুধাংশু কর, দুনীচাঁদ প্রভৃতি চরিত্র স্বমহিমায় পাঠককে আকৃষ্ট করে। লেখকের অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে রহস্যময় মানব জীবনের সামাজিক ও নৈতিক জিজ্ঞাসাবলী, জীবনযাপনের স্ববিরোধিতা। পাঠক কেবল লঘু হাস্যরসের সন্ধানই পাননা, পাশাপাশি তাকে ভাবায় এই অসম সমাজব্যবস্থা ও প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পর্কেও। যেমন একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনেক বছর পর্যন্ত বিয়ে করেননি, কারণ তিনি সব মেয়ের মধ্যে দেখেন 'নেগেটিভ ভ্যালু'। তার কথায়—'আমার চারটে বোনকে বিয়ে দিতে গিয়ে জমানো টাকাও শেষ, মাথার চুলও সব সাফ। বিয়ে করিনি আর। আর বিয়ে করতে ভয়ও পাই। যদি আমার আবার গুচ্ছের নেগেটিভ হয়?' মেয়েদের সম্পর্কে ধারণাও চমকপ্রদ 'মেয়েরা কীরকম জানেন? অনেকটা আমাদের কনটাক্ট্ ডারমাটাইটিসের মতো।...বেশ আছেন। শরীরে কোন চর্মরোগ নেই। কিনলেন এক সস্তার চটি। তার কন্টাক্টে চর্মরোগ বেধে গেল।' না, লেখকের হাস্যরসে কোন কটাক্ষ নেই। স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি লেখকও সহাস্য আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। ডাক্তার অবশেষে 'লাস্ট বাস' ধরার লোভকে জয় করতে পারেনি। মধ্যবয়সী সুদর্শনা সখীসোনা বসু অবশেষে ডাক্তারের সেই 'লাস্ট বাস'।

শ্রীচক্রবর্তী কেবল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের ছবি আঁকেন না, বামাপদ'র মত মস্তান ও একেবারে নিচু স্তরের মানুষের ছবিও উপহার দেন খুবই বিশ্বস্ত এবং বাস্তবভঙ্গিতে। এমনকি এই শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে লেখক যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা অসাধারণ।

শুধু কি হাস্যরস? মানুষের জীবনযাপন ও জীবিকা, অধ্যাত্ম চেতনা, সামাজিক রীতি-নীতি-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবহমান জীবনের বিয়োগান্তক দিকটিও অস্পষ্ট থাকে না লেখকের সৃষ্ট কিছু সার্থক করুণ রসাত্মক চরিত্রে। এছাড়া, লেখকের নিজস্ব পেশার জগত—শিক্ষা ও শিক্ষকতার সামাজিক পরিমণ্ডল, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্রদের মেধা অধ্যবসায়, পরিবেশের প্রভাব ইত্যাকার বিষয়ে লেখকের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা কিছু রচনার উপজীব্য হয়েছে। সবশেষে আছে এই লেখকের (?) জীবনের এক বেদনাবিহৃত অধ্যায়—জড়বুদ্ধি কন্যার জন্য জ্ঞানতপস্বী পিতামাতার আকুলতা। লেখকের কথায় প্রতিধ্বনিত হয় উত্তমপুরুষের হাহাকার—'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা যার ঘরেই আলো জ্বলে না।' হাস্যরসিক স্রষ্টার সরস শুদ্ধ হাসির অন্তরালে ফল্গুধারায় প্রবাহিত হয় মানুষের জীবনের আর্ত অসহায়তা।

এই গ্রন্থের কিছু কাহিনী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, অনায়াসে সেগুলি ছোটগল্পে উত্তীর্ণ

হতে পারত। লেখকের ভাষা বর্ণনাকৌশল অন্তর-অনুভূতি সবদিক থেকেই এই খণ্ড কাহিনীগুলি ছোটগল্পের আঙ্গিকে উপসংহার টানার উপযোগী ছিল। লেখক অবশ্য সে উদ্দেশ্যে কাহিনীগুলিকে শেষপর্যন্ত ব্যবহার করেননি।

এই শ্রেণীর গ্রন্থের একটা মস্ত সুবিধা/ অসুবিধা হল, এক নাগাড়ে মুখে বই রেখে পড়ে ফেলতে হয়না, যায়না। কেননা একটা কাহিনী পড়বার পর সেটা অনেকক্ষণ ধরে মনের ভেতর তোড়পাড় করতে থাকে। এই ফাঁকে কিছু ব্যক্তিগত অন্য কাজকর্ম সেরে নেওয়া যায়। কিন্তু বইটা থাকে নিজস্ব হেফাজতে, সময় পেলেই পাতা ওল্টাতে হয়, এমনই এর আকর্ষণ। আসলে এক লপ্তে পর পর বইটা পড়ে ফেললে এক খণ্ড খণ্ড বিচিত্র মানবজীবনের কাহিনী-উপকাহিনীর স্বাদ আলাদাভাবে অনুভব করা সম্ভব নয়, অন্তত রসিক পাঠকের পক্ষে।

পরিশেষে বলা যায়, এই জীবনধর্মী হাস্যরসপ্রধান খণ্ড কাহিনীমূলক গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শিল্পরসের সঙ্গে অকৃত্রিম জীবনরসের এমন সংমিশ্রণ ইদানীংকালের সাহিত্যে খুব বেশি চোখে পড়েনা।

পশ্চিমবঙ্গ
৬ ডিসেম্বর ১৯৯১

ঙ. ১. ৪ আলোচক : **রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। নিজের অজান্তেই আমরা ঢুকে পড়েছিলুম একটা সুড়ঙ্গে। কেউই একা নেই। সর্বদাই সঙ্গে, অল্প হলেও, কিছু লোক ছিলেন। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কিছু করছি—এই বোধটাই বেঁধে রেখেছিল আমাদের।

সুড়ঙ্গর মধ্যে থেকেই কাজ করতুম আমরা। তার বাইরে যে-জগৎ, সেখানকার মানুষজনের গায়ে গা লাগার কোনো সুযোগই ছিল না। তবু ভেবেছিলুম : মনের যোগটুকু তো রইল। তা-ই যথেষ্ট।

এই করতে করতে মানুষ ব্যাপারটা হয়ে উঠেছিল একটা গড় অঙ্কর মতো : যারা মিছিলে হাঁটে, যারা হাঁটে না—যারা বিপ্লব করবে, যারা করবে না। চিনতুম তো শুধু সুড়ঙ্গর বাসিন্দাদের। মাঝে মাঝে যেসব ভাবনা বুকের ভেতর বিল্লি আঁচড়াত, মুখ ফুটে তা বলতে পারতুম কই? মনের ভাব গোপন করাটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ভয় হতো : এসব শুনলে লোকে কী ভাববে! আমরা, যারা বহুজনের হিত ও সুখের জন্যে কিছু করছি বলে ভাবি, তাদের পক্ষে এসব মানুষিক দুর্বলতা একেবারেই বেমানান।

এইভাবে, সুড়ঙ্গটাই হয়ে গিয়েছিল আমাদের পাকা ঠিকানা, বাঁধা আস্তানা। সেখানে বাইরের বিরাট জগতের খবর আনলেন সুধীর চক্রবর্তী। দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙুল দিয়ে : আমাদের সুড়ঙ্গটা কত সংকীর্ণ, কত অপরিসর!

'গভীর নির্জন পথে'র মতোই 'সদর মফস্বল' সটান ঘা দেয় মনের গহনে। লেখকের

পেছন-পেছন আমরা ঘুরতে থাকি মফস্বল শহরে। যে-কোনো মফস্বল শহর। এ-পাড়া থেকে ও পাড়া, এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। যাই ফেরিঘাটে স্টেশনে। রাজমিস্ত্রি রিক্‌শাওয়ালা থেকে জজ ম্যাজিস্ট্রেট সবার সঙ্গেই আলাপ হয়। পরিচয় হয় রেলের হকার, উদ্বাস্তু কলোনির মেয়ে, চুল্লু ঠেকের মস্তান—এমন কত লোকের সঙ্গে। সেখান থেকে বাস ধরে কখনো বা চলে যাই আরো ভেতর দিকের কোনো গ্রামে। আবার হঠাৎই পাড়ি দিই ট্রেনে চেপে দূর পাল্লায়—পুরী বা হরিদ্বারে। সর্বত্রই দেখা হয় নতুন নতুন লোকের সঙ্গে। লেখকেরই তৎপরতায়।

সুড়ঙ্গর বাইরে এত আশ্চর্য মানুষ ছিলেন! যেমন, শ্রীসরোজ সিংহ। মফস্বলের সাধারণ দোকানদার। বিয়ে করেছিলেন এক মুসলমান মহিলাকে। তাঁর ছেলে এল কলেজে ভর্তি হতে। ফর্ম-এ 'ধর্ম'র ঘরটা সে ফাঁকা রাখে। কর্তৃপক্ষ যখন ডেকে পাঠান, সরোজবাবু অকুণ্ঠে বলেন, 'দেখুন, আমাদর ধর্মাধর্ম জাতপাত সম্পর্কে কোনো সংস্কার নেই। আমি জন্মসূত্রে হিন্দু, আমার স্ত্রী মুসলমান। কেউই ধর্ম পালন করি না। বিশ্বাস নেই বলতে পারেন। তাই আমরা চাই না আমাদের ছেলের ওপর কোনো রকম ধর্ম চাপিয়ে দিতে। রিলিজিয়নের ঘরটা ফাঁকাই থাক না। ও যখন বড় হবে, জ্ঞানবুদ্ধি হবে, তখন যদি মনে করে ও নিজেই ঠিক করবে।'

ইনি তো আমাদেরই সহযাত্রী। তবু এঁকে তো চিনতুম না! অন্য প্রসঙ্গে সুধীরবাবুর একটা মন্তব্য মনে বাজে : দেখার চোখটারই যা অভাব।

'বারোমাস' ও 'পরিচয়'-এর পাতায় যাঁরা লেখাগুলো আগেই পড়েছেন তাঁদের হয়তো নতুন করে বোঝানোর দরকার নেই : কী অসাধ্যসাধন করেছেন সুধীরবাবু! তবু ছটি লেখা (সদর মফস্বল, শহর-অশহর, চেনা-অচেনা, ধর্ম-অধর্ম, জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-অশিক্ষা) পর পর পড়লে সে বিস্ময় বাড়ে বৈ কমে না। প্রায় প্রতি পাতায়ই যেখানে হাজির হন কোনো-না-কোনো নতুন লোক, সেখানে ছিয়ে পড়ার ঝোঁকটাই বড় হয়ে উঠবে—এ ভয় একেবারে অমূলক নয়। বিস্তারের ফলে হয়তো ঘাট্‌তি পড়বে গভীরতার। কিন্তু সুধীরবাবুর ক্ষমতা আছে। মানুষের ভেতর ও বাইরের চেহারাকে—যে প্রসঙ্গে যতটুকু দরকার—তিনি তুলে ধরতে পারেন খুবই অল্প কথায়, বিরল দক্ষতায়। প্রতিটি মানুষই জ্বল-জ্বল করেন চোখের সামনে।

অজস্র মানুষের মধ্যে লেখক নিজেও একজন। শুধুই দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে নয়, ভুক্তভোগী হিসেবেও। ''শিক্ষা-অশিক্ষা'র শেষে যখন ব্যাহতবুদ্ধি শিশুর কথা আসে, তখন অবস্থার গোটা অসহায়তা ধরা পড়ে লেখকের নিজের জীবনে। এ এমন এক বিষয় যা আর কারও জবানিতে বা বকলমে বলা যেত না, উত্তম পুরুষে ছাড়া আর কোনোভাবে বললে তঞ্চকতা হতো।

এক-একটা কেন্দ্রীয় ভাববস্তু (থিম)-কে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক-একটি রচনা। সত্যিই গড়ে উঠেছে। চার হাতে কম্পোজ-করা ম্যাটার যেমন মিলে যায় মেক্-আপ ম্যানের হাতে। একে-একে হাজির হয় ছোট-ছোট ঘটনা, কোনো পথচল্‌তি লোকের সঙ্গে লেখকের দুটো টুকরো কথা—সেই সূত্রে আর একটা ঘটনা বা আরো দু-চারটে চরিত্র। ঘটনাগুলোও রকমারি। কারো স্বাদ মিষ্টি, কোনোটা ঝাল বা নোন্‌তা। আর, একটা হাল্‌কা হাসির

হাওয়া ফুরফুর করে বয়ে চলে গোটা বই জুড়ে। শেষে কিন্তু একটা ধাক্কা অবধারিত—প্রবল বিস্ময়ের বা প্রগাঢ় বেদনার।

এই ধরনের লেখায় নতুনত্ব আছে, সম্ভাবনাও প্রচুর (যদি অবশ্য লেখকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার সুধীরবাবুর মতো ভরা থাকে)। প্রতিটি উপাখ্যানেরই একটা পরিণতি আছে কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় না—তার পরেও কিছু ঘটার থাকে, ঘটতেও থাকে। সংযমী লেখক কিন্তু ততদূর যান না। ভাববস্তুর সঙ্গে যতটুকু তার যোগ, ঠিক ততটুকুই বলেন। ফলে প্রতিটি উপাখ্যানই হয়ে হয়ে দাঁড়ায়, অলঙ্কারশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থে, এক-একটি দৃষ্টান্ত, 'এক্‌সেমপ্লুম'।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন : এতগুলো ছোট গল্পের বীজকে ভদ্রলোক বেহিসেবির মতো নষ্ট করলেন। এমন আক্ষেপ তাদেরই সাজে যাদের কাছে সাহিত্য জিনিসটা কেবলই কলমবাজি—পাঠককে খানিক নন্দনের স্বাদ দেওয়াই যেন তার পরমার্থ। সুধীরবাবু তো চেয়েছেন জীবনের গভীর ও জটিল কিছু প্রশ্নের মোকাবিলা করতে। প্রতিটি উপাখ্যানই এসেছে সেই জিজ্ঞাসার নিরিখে। শুধুই গল্প লিখতে চাইলে তো আরো কত কিছুই করা যেত।

সুধীরবাবু নিজেও বলেছেন, 'রচনাগুলির জাতবিচার করা কঠিন। তবে নির্ভয়ে বলা চলে এগুলি গল্প, রিপোর্টাজ বা রম্য রচনার শ্রেণীভুক্ত নয়।' জাত ঠিক করার এক্ষুণি কোনো দরকার আছে কি? সাহিত্য এখানে বুৎপত্তিগত অর্থেই জীবনের সহিতত্ব অর্জন করেছে—হ্যাঁ, অর্জনই; স্বভাবের ওপর ছেড়ে দিয়ে এমন জিনিস লেখা যায় না। প্রতিটি লেখার আছে নিজস্ব গড়ন—প্রতিটি মানুষের কথার ভঙ্গিতে আছে তাঁর ব্যক্তি স্বরূপের নিশ্চিত অভিজ্ঞান—হাসিকান্নার বুননে আছে নিখুঁত পরিকল্পনা। বিষয়ই ঠিক করে দিয়েছে আঙ্গিক। এ এক নতুন ঘরানা। সুধীরবাবু নিজে এবং আরও কেউ কেউ যদি এই ঘরানায় লিখে চলেন, তখন না-হয় এর নামকরণের কথা ভাবা যাবে। আপাততত বোধ হয় এই বলাই যথেষ্ট : একটা নতুন ঘরানার পত্তন হলো। এর দরুনই সুধীরবাবুকে গড়ে নিতে হয়েছে তাঁর নিজের ভাষারীতি। বেশ নাক উঁচু তৎসম শব্দর পাশে অসংকোচে এসে বসে নেহাতই আটপৌরে অনাত্মীয়। মিশে যায় বর্ণনা আর সংলাপ; আর তারই ফাঁকে চলতে থাকে, সূত্রধরের ভূমিকায়, খানিক চাপা গলায়, লেখকের আত্মকথন। যে অমল দৃষ্টিতে তিনি দেখেন মানুষকে, যেমন অনায়াসে মিশতে পারেন যে-কোনো লোকের সঙ্গে—তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই সহৃদয়তা ও সত্যিকারের সামাজিক সত্তাই লেখার এনে দিয়েছে মরমী শ্রীছন্দ। ভাব ভাষা ভঙ্গি—সব মিলিয়ে বইটি হয়ে উঠেছে গর্ত চার দশকের বাঙালি জীবনের ক্যালিডোস্কোপ। সরস মাধুর্য আর গভীর সংবেদনের এমন সুষম মিলন সচরাচর চোখে পড়ে না।

প্রচ্ছদপট, ভেতরের ছবি, ছাপা-সবই চমৎকার খাপ খেয়েছে বইটির সঙ্গে। প্রকাশক যত্নের ত্রুটি করেন নি। সব চেয়ে স্বস্তির কথা : বুদ্ধিজীবী ছাড়াও যে-কোনো পড়ুয়ার হাতে বইটি নির্দ্বিধায় তুলে দেওয়া যায়। এ ধরনের বই সুধীরবাবু আরো লিখবেন তো?

বারোমাস

এপ্রিল ১৯৯১

(ঙ) ২. নির্বাস

ঙ. ২. ১. আলোচক : **রামকুমার মুখোপাধ্যায়**

বৌ-ঝিরা লক্ষ্মীমন্ত হলে কুনকির কানা উপচে বেশ কিছু শস্যদানা নিচে পড়ে। ঐ সোনামুঠি দানা থেকেই নতুন বছরের ফসল মাথা তোলে, ক্ষেতের সীমারেখা মুছে যাছ। তখন মনে হয় মাপা শস্যের চেয়ে উদ্বৃত্ত শস্যের মান বড়, দাম বেশি। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা তাই বলেন। যে-মেয়ের হাঁড়িতে সাবার খাওয়ার পরেও বাড়তি অন্ন থাকে সে মেয়ে অন্নপূর্ণা। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও এই কথাগুলো বোধ হয় কাজের। সমস্ত রকম তথ্য ও তত্ত্বের পরেও জীবনে কতকিছুই অধরা থেকে যায়। তখন প্রশ্নে জাগে ঐ মাপহীন অংশটিই আসল জীবন কিনা।

সুধীর চক্রবর্তীর লেখালেখির মধ্যে জীবনের এই উদ্বৃত্তকে ধরার একটা প্রচেষ্টা থাকে। তাঁর 'গভীর নির্জন পথে' বইটিতে বালাহাড়ি, সাহেবধনী, লালনপন্থী ইত্যাদি উপাসক সম্প্রদায়ের কথা ছিল। সে কথার ভেতর কিন্তু উপকথাও ছিল। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল ধর্মটা লক্ষ্য নয়—মাধ্যম। জীবনের ঘর-সংসারে পৌছানোর এও এক অন্যতম পথ। 'নির্বস'ও তেমনই একটি উদ্যোগ। আশ্রয়চ্যুত কিছু মানুষজনের কথা শুনিয়েছেন তিনি বইটির সাতটি লেখায়। যাঁদের নিয়ে এই বই তাঁদের মধ্যে আছেন মধ্যবিত্ত নাগরিক, ট্রেনের গায়ক-গায়িকা, মফঃস্বল বাংলার অধ্যাপক-ছাত্রছাত্রী, গ্রামীণ মুসলমান সমাজের সংস্কার মুক্ত যুবক-যুবতী—এমনই নানা গোত্রের মানুষ। এসব মানুষজনকে একটি মোটিফ-এর অন্তর্গত করেছেন তিনি। আশ্রয়চ্যুতির সমবায়ের যুক্ত করেছেন তাঁর চরিত্রদের।

বিষয়ের কেন্দ্রভিগতা এই বইটির একটি জরুরি উপাদান, বক্তব্যের কেন্দ্রাতিগতা বইটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতীয় অংশটি উদ্বৃত্তর সঙ্গে কোনো-না কোনোভাবে যুক্ত। পড়তে পড়তে মনে হয় এই উদ্বৃত্তের গড়ে ওঠা যেন লেখক-নিরপেক্ষভাবেই। যেমন প্রথম লেখা 'গ্রামের পাঁচালি'র কামাখ্যার নির্বাস হওয়ার পাশাপাশি ধরা থাকে তার বাবা যতীন্দ্রনাথের স্ত্রী-বিয়োগের পর গ্রাম ছাড়ার বৃত্তান্ত। সে রকমই গ্রামের পুরনো মানুষ মোহন গ্রামে থেকেও পরবাসী হয়ে যায়। 'নগরতলী'র হীরেন কাহিনীর পরিচিত বিন্যাসেই আশ্রয়চ্যুত কিন্তু উমেশও তো আশ্রয়ের নিরাপত্তার ভেতর নেই। পরিবর্তনের সন্ধান রাখতে পারেনি বলে হীরেন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি আঘাত পায়। এর বিপরীতে উমেশ নিজেকে অভ্যস্ত করে নেয় সময়ের বেহিসেবি পরিবর্তনের মুখোমুখি। গ্রহণের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হলেও সময় ও সমাজের চেহারাটা একই। ফলে উমেশকে যেন আরো বেশি অসহায় মনে হয়। তার তো হীরেনের মতো বিফল আশ্রয় কিংবা আশ্রয়হীনতা নেই।

'কলিকাতা কোলাজ'-এর প্রিয়নাথ তাঁর বহরমপুরের সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে

কলকাতাকে মেলাতে পারেন না। মৃত্যুতে তাঁর পরিণতি ঘটে। এই কাহিনীর মধ্যেই আছে প্রিয়নাথের নাতি স্কুল-ছাত্র অর্জুন নামের একটি চরিত্র। সে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে কিন্তু বাবা-মা এবং দাদুর কাছে থেকে দেশজ সাংস্কৃতির শিক্ষা পায়। অর্জুন এ কাহিনীর কেন্দ্রে নেই কিন্তু সেও তো হয়ে উঠছে আমাদের বিশেষ সামাজিক-সংস্কৃতিক পরিবেশের এক ভিন্ন গোত্রের চরিত্র। 'প্রমোদ ভ্রমণ'-এর মধ্যেও এরকমই অনুপস্থিত তিন ছাত্র—রণেন, সন্তোষ আর মোশারেফ -এর কথা আসে। তারা আসতে পারেনি কারণ বেড়ানোর টাকা তারা যোগাড় করতে পারেনি। ফলে প্রমোদ ভ্রমণের আনন্দের মাঝে তাদের উল্লেখ কাহিনীর সুর কেটে দেয়। সে সর জুড়েও যায় হাজার দুয়ারি ঘোরাব পর্বে। আবার ভাঙ্গে যখন খেজুর রসের কারবারী জব্বর আলির ঘর-সংসারের কথা আসে। জ্বালানি কিনে বস ফুটিয়ে গুড় বানাবে এই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনও তাব নেই। একই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে কাহিনীর হাঁড়িউলি মেয়েরা। পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন দেশের উদ্বৃত্ত নাগরিকদের আখ্যান, যারা বেঁচে থাকে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে।

'চেরাগ আর রোশনি'র প্রেমও বাসভূমির নিরাপত্তা পায় না। চেরাগ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। শিশির বাঁচে চেরাগ-হীন। এর পরেও কাহিনীর কিছু অন্য কথা থেকে যায়। কবিতার কী হলো, কবিতার কী হয়, কী হবে। যে শিশির-চেরাগের অবলম্বন ছিল কবিতা, সেই কবিতাও কি হয়ে যায় নির্বাস, বেহিসেবি সময়-সমাজের ইচ্ছেয়? 'নির্বাস' নামের যে লেখাটি সেখানে এক সময়ের রাজনৈতিক কর্মী মন্টুর রাজনৈতিক আশ্রয় হীনতার কথা আছে। দুলরিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের ভেতর একটি বাসযোগ্য আবাসের স্বপ্ন আছে। কিন্তু নায়েমদের আভিজাত্যের যেভাবে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের নির্বাসী হয় তার সত্য তো মন্টুর স্বপ্নে কূল পায় না।

'সরযূর সাক্ষাৎকার' এই বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। ট্রেনের গায়ক-গায়িকাদের কথা এসেছে এ লেখাটিতে। শে, হয়েছে ব্যাণ্ডেল-রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নিত্য গায়িকা সরযূ মাখালের সাক্ষাৎকারে। আশ্রয় ও নিরাশ্রয়ের মাঝে কোনো এক গোধূলি ভূখণ্ডে তার থাকা সরযূর আশ্রয় তার দশ বছরের ছেলে নকুল। সরযূর আশ্রয়হীনতা তার নিজের মানুষকে কাছে না পাওয়া —'মরণকালে সেই মানুষটা যদি এসে দাঁড়ায় শিয়রে, যদি মাথায় হাতটা রাখে।' সরযূর আশ্রয়হীনতাও কি ছুঁয়ে যাবে একদিন নকুলকে? সে কি পিতৃপরিচয়হীনতার নিরাশ্রয়ে কখনো আন্দোলিত হবে?

এমন অনেক কথা জড়ো হয়েছে বহুজনের সামাজিক নিরাশ্রয়ের এই আখ্যানগুলিতে। কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর নেই, কিছু উত্তর আছে যার প্রশ্নগুলো চিহ্নিত নেই। কিছু ভাব আছে যা চেনা, কিছু ভাবনা আছে যা অচেনা। লেখক-নির্দিষ্ট কিছু কথা আছে আবার লেখক-ব্যতিরেক অনেক উপকথাও আছে। ঠিক বা ভুলের হিসেববিহীন উচ্চারণও আছে বেশ কিছু। সব মিলে বেশ কয়েকটি স্তর আছে লেখাগুলিতে, আর শোনা যায় নানা স্বরের অনুরণন যেখানে লেখক-ভাবনা যতখানি অনির্দিষ্ট সেখানেই লেখাটি স্তরবিন্যাস অর্জন করেছে তত বেশি।

পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খালেদ চৌধুরী রেখাচিত্রগুলি সুন্দর। যাঁরা ছবি নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কাছে এই সব রেখার একাধিক স্বর নিশ্চয় ধরা পড়বে।

বারোমাস
এপ্রিল ১৯৯৭

৬. ২. ২. আলোচক : উজ্জ্বল চক্রবর্তী

গান ও লোকধর্মের নানা ধুলোপথে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে মাটির ঢেলা আসলে মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনাই সুধীর চক্রবর্তীর কাজ। এর জন্য আমরা তাঁকে অনেকদিন চিনি। এখন আমাদের হাতে এসেছে সাতটি আখ্যানের একটি সংকলন যেখানে কোনো রহস্য-ঢাকা তত্ত্ব নয়, প্রতিদিনের অতিচেনা মানুষের কথা। 'আখ্যান' পরিচয়ে অবশ্য লেখকের কিছু আপত্তি থাকবে। তিনি এই রচনাগুলিকে না-গল্প, না-অখ্যান না-প্রতিবেদন বলছেন। মধ্যবিত্ত শহরবাসী, গ্রাম ছেড়ে দূরে চলে আসা মানুষ, ট্রেনের গায়িকা, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, হতাশ রাজনৈতিক কর্মী —এখন সব চরিত্রের নিজেদের কাহিনীতে ক্রমশবিকশিত হওয়া এই সাতটি টুকরো একটি অভিন্ন সূত্র আছে। মুল চরিত্ররা, এমনকি অধিকাংশ পার্শ্বচরিত্রই 'নির্বাস'— কোনো না কোনা ভাবে আশ্রয়চ্যুত। লেখক বলছেন : 'আজকের দিনে নির্বাস সকলেই, নানাভাবে নানা মাত্রায়'। 'কলিকাতা কোলাজ'-এ বহরমপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রিয়নাথ রায় কলকাতার হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টের স্কাইলাইনে নির্বাস। থাকেন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক-পুত্রের বাড়িতে, সুখের সংসারই তাঁর। কিন্তু চারপাশে মূল্যবোধের দ্রুতপতন তাঁকে আসলে নিরাশ্রয় করে দেয়। মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি ফিরতে চান বহরমপুরেই।'গ্রামের পাঁচলি'-তে নদীয়ার দিগনগরে বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে শৈশব কাটানো গ্রামের জমিদারপুত্র প্রতিষ্ঠিত সাংবাদ্দিক হিসেবে পুনরায় ফিরে আসেন বহু বছর বাদে। তাঁরচেনা গ্রাম অনেক বদলে গেছে। নিরাশ্রয় বোধ করে সে-ও। গ্রামের মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতার মাঝখানে, জাতপাত ধর্মবৈষম্যের উর্ধ্বে দুই মুক্তমনা জীবনানন্দপ্রেমীর ভালোবাসার গল্পে অবশ্য আশ্রয়হীনতার চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে মানবধর্মের চিরকালীন নিরাপত্তা । এইসংকলনের সব কাহিনীরই একটি মজা আছে এক গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আরও গল্প, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষের মতোই। আর, আচ্ছন্ন-করা এক স্মৃতিকাতরতা। মেঘর মতো ঢেকে রেখেছে সব কাহিনীকেই। সেই নস্টালজিয়ার অনেক কিছুই এমন যে সত্যিই ছাড়তে মন চায় না।

যেমন : "…. বড়দার বিয়েতে 'প্রভাস মিলন' যাত্রায় মুসলমান পাড়ার নুরুদ্দিন মাস্টার যখন কৃষ্ণ সেজেছিলেন এখন শুধু কামাখ্যা কেন, কোনো গ্রামবাসীরই মনে একথা জাগেনি যে মুসলমান কেন কৃষ্ণ সাজতে পারে? কেন তার আকুল করা অভিনয় দেখে চিকের আড়ালে কামাখ্যার পিসি প্রণাম করেন তা বুঝতে কামাখ্যার অসুবিধে হয়নি।"

পুরনো মফঃস্বল কলেজের পথে যেতে যেতে কয়েক দশক পরে এক চরিত্রের মনে পড়ে: 'সেখানে সেই দেবদারুর অ্যাভেনিউ আর কলেজ কার্নিসের গায়ে ঝাঁক ঝাঁক

চন্দনা পাখি থাকত আগে। ... হয়তো দেখতে হবে অমন দেবদারুর প্রজাতি কেটে সাফ। হয়তো চন্দনা পাখির ঝাঁক চলে গেছে কলেজ কার্নিস ছেড়ে অভিমানে।'

সুধীর চক্রবর্তীর সন্ধানী চোখ আর মরমী হৃদয় সবসময়েই তুলে আনে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনকে। এই আখ্যানেও তাঁর একাধিক উদাহরণ। 'সরযূর সাক্ষাৎকার'-এ ট্রেনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে বেঁচে থাকা এক ভিখারিনীর কথা আছে। অন্ধ এই ভিখারিনী শৈশবেই শিখে নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান।

অন্ধের যষ্টির মতোই তাঁর দরকার ছিল এক পুত্র — স্বেচ্ছায় এক পুরুষের কাছে ধরা দিয়ে সেই সন্তান আদায় করে নিয়েছে সে। ঝাঁ-চকচকে সংবাদপত্রে রবিবারে পাতায় অভিনেত্রী আর মডেলদের সেরকম সাক্ষাৎকার থাকে, সেই আদলে ভিখারিনী সরযূর একটি সাক্ষাৎকার নির্মাণ করেছেন লেখক। অংশবিশেষ:

পুরোপুরি সুখ বলতে তুমি কী বোঝ সরযূ?

সুখের মুখ আর দেখলাম কবে? খোকা যখন পেটের মধ্যে নাড়াচড়া করত তখন সুখ হাতো, হ্যাঁ সেটাই সবচেয়ে বড় সুখ।

তোমার মনে সবচেয়ে বড় ভয় কী?

যদি খোকা চলে যায় কোথাও।

তোমার নিজের এমন কী আছে যা পছন্দ করনা ?

আমার ভীষণ খিদে পায়।

কোন্ কথা বলতে তোমার ভালো লাগে?

'আমার শোনা, আমার গোপাল' খোকাকে বলি।

জীবনের সবচেয়ে আনন্দ কবে হয়েছিল?

যখন শুনলাম খোকার চোখে দৃষ্টি আছে।

অনুভবে আলোকিত এই আখ্যানগুলি পড়তে পড়তে দারুণ ভালো লাগার পাশাপাশি মনে হয়েছে, হয়েছে, স্মৃতিকাতরতা অনেক সময় রচনাকারের দৃষ্টিকেও আড়াল করেছে। অবাস্তব, অতিকৃত চরিত্রেরা তাই ভিড় করেছে অনেক সময়েই। যেমন, 'কলিকাতা কোলাজ' — এ জনৈক-বখ যাওয়া সুন্দরলাল। সে কীরকম? লোককে মেরে গেঞ্জি কেড়ে নেয়, মেয়েদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের বিরক্তি করে, যখন সেরকম দরকার সেই রকম রাজনৈতিক সঙ্গ রাখে, লোকনাথের লকেট পরে, 'হাতখরচা' দিলে 'খুকুমণিদের' সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, ড্রাগ খায় এবং সুবিনয় রায় শুনতে রবীন্দ্রসদনে যায়, বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের দলে ঢুকে যায়।

সম্ভবত এই আবেগের আতিশয্যই গত দু'দশক পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মানুষের লড়াই, ত্রুটি-দুর্বলতা-ব্যর্থতা-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর নবোত্থিত জীবনের সুর গানের 'গভীর নির্জন পথে' থাকা সুধীর চক্রবর্তীর কানে ঠিক বেজে ওঠেনি। তাঁর কথিত 'নির্বাস'-এর পেছনে আসলে পণ্যনির্ভর অর্থনীতি, যা সমগ্র মানবসমাজকে বাজার ভাবে। এই উপলব্ধিও কিন্তু ফুটে ওঠেনি এই বিশাল চিত্রপটে।

[ ]

(ঙ) ৩. পঞ্চগ্রামের কড়চা

ঙ. ৩. ১. আলোচক : **সৌম্যেন্দ্র সিকদার**

'পথের পাঁচালি' লেখার সূচনা দিবসে দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, ''জগতে অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট.. অস্তসূর্যের আলোয় রঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য.. গজতের শতকরা ৯৯ জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ থেকে যায়।'' কিন্তু কেবল প্রকৃতির রাজ্যেই নয়, শহর মফস্বল-গ্রামের মানুষের সুখে-দুঃখে দিন যাপনে মধ্যেও এক নিবিড় উল্লাসের স্পন্দন আছে যাকে বোধ যার অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলে জীবনে সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে। এ বোধ, বলা বাহুল্য, সবার থাকে না বা একে অর্জনের প্রয়াসও সবাই করে না। যারা করে তারা ঐ শতকরা নিরানব্বই এর বাইরে। বাকিদের কাছে 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' আবৃত্তিজীর্ণ ক্লিশে মাত্র। ঐ আনন্দের স্বাদ যেসব ভাগ্যবান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আবার লেখনীর কুশলতা সকলের থাকে না, ভাগ্যক্রমে ব্যতিক্রমী একজনকে আমরা সুধীর চক্রবর্তীর মধ্যে পেয়েছি।

ভিন্নগোত্রীয় জীবনের ছন্দকে ধরতে পারা মোটেই সহচর নয়। করুণা বা মেকি সহানুভূতি বা বিশেষজ্ঞের চতুরতা ঠেকিয়ে রাখতে তো রীতিমত দক্ষতার প্রয়োজন মাটির কাছাকাছি মানুষদের আঁকতে গিয়ে কত লেখনী যে এই ফাঁদে আটকা পড়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ধ্রুপদী রুশ সাহিত্যিকরা আর বিভূতিভূষণ অমর। আরেকটা যে বইয়ের কথাও বিশেষভাবে মনে আছে সেটা হলো ডেনমার্কের লেখিকা ইসাক দিনেসেনের 'আউট অফ আফ্রিকা'। বিয়ের পর কফির খামারের কর্ত্রী হয়ে পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার মানুষদের আপন করে নিতে পেরেছিলেন এই শ্বেতাঙ্গিনী। উদ্ধত শ্বেতপ্রভুদের হীন সংকীর্ণতার বাইরের জগৎটাকে আলিঙ্গন করতে পেরে তাঁর জীবনে পরশমণির ছোঁয়া লেগেছিল। তিনি লিখেছেন 'The discovery of the dark aces has been for me a magnificent enlargement of the horizon.' দিনেসেনের স্বামীর শ্বেতাঙ্গ সরচরদের মতো আমরা — শহুরে ভদ্রলোকেরাও এক বিশাল কৃষ্ণাঙ্গ গোষ্ঠীর নিকট প্রতিবেশী হয়েও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্ধভাবে অচেতন। এই অদৃশ্য ভারতবর্ষীয়রা আমাদের খাদ্য যোগান দেয়, রান্না করে, বাসন মাজে, মোট বয়, রিক্সা চানে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে, বাজারে আলুপটল আর লোকাল ট্রেনে বাদাম, লজেন্স, জালমুড়ি বিক্রি করে। 'পঞ্চগ্রামের কড়চা' মতো লেখা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় অন্ধ উদাসীনতায় আমরা নিজেদের মানুষ্যত্বকে কতটা খর্ব করে ফেলেছি। আমাদের দিগন্ত দিনের পর দিন সংকুচিত হতে হতে একেবারে সুড়ঙ্গের বাসিন্দা হয়ে পড়েছি। লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। চিরদিনের অভ্যাস ফিরতে দেরি করে মা ঠিকই, তবে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঝে মাঝে চোখের সামনে কালো পর্দাটা উঠে যাওয়াও নিশ্চয় অত্যন্ত প্রয়োজন।

সুধীর চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় 'বারোমাস' পত্রিকার পাতায়। লেখাগুলো ('সদর-মফস্বল' বই-এ সংকলিত) পড়ে মনে হতো ঠিক এ জাতীয় কিছু তো আগে পড়িনি; গল্পও নয়, প্রবন্ধও নয়, রম্যরচনাও নয় অথচ অতীব সুখপাঠ্য। স্বচ্ছ অবলোকনের সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকের সুন্দর মিলন। কয়েকজন বান্ধবকে পড়ালাম। অনেকে বললেন, উপভোগ্য লেখা, প্রচলিত কাহিনীর ছকটা ভেবে ফেলতে লেখক সক্ষম হয়েছেন, তবে ঠিক যেন সাহিত্য বলে মনে হচ্ছে না। এর থেকে অনেকগুলো চমৎকার গল্প বের করে আনা যেত। আলোচ্য বইটার সম্বন্ধেও তাঁরা একই কথা বলবেন। এর সুন্দর উত্তর দিয়েছেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (বারোমাস, এপ্রিল, '৯১) 'সাহিত্য এখানে ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই জীবনের সহিতত্ব অর্জন করেছে—হ্যাঁ, অর্জনই; স্বভাবের ওপর ছেড়ে দিয়ে এমন জিনিস লেখা যায় না। প্রতিটি লেখার আছে নিজস্ব গড়ন—প্রতিটি মানুষের কথায় ভঙ্গিতে আছে তার ব্যক্তিস্বরূপের নিশ্চিত অভিজ্ঞান—হাসিকান্নার বুননে আছে নিখুঁত পরিকল্পনা। বিষয়ই ঠিক করে দিয়েছে আঙ্গিক। এ কথা নতুন ঘরানা। সুধীরবাবু নিজে এবং আরো কেউ কেউ যদি এই ঘরানায় লিখে চলেন তখন না-হয় এর নামকরণের কথা ভাবা যাবে।' আমি এর সঙ্গে একমত। শুনেছি স্পেনের লেখক কামিলো সেলা নাকি স্বদেশের রৌদ্রতপ্ত, ধুলিধূসর প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে ঘুরে সেই অভিজ্ঞতার উপাদানে তিলমাত্র প্রসাধন না করে একাধিক বই লিখেছিলেন। যুৎসই লেবেলের অভাবে সেগুলোকে quasi-novel আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আমি বলি, আখ্যা কি একটা না দিলেই নয়।

গ্রামের একেবারে খাঁটি জিনিসটি সুধীরবাবু দিতে পেরেছেন কিনা তা শহুরে লোক আমি বুঝব কী করে? তবে মেকি ফোকপ্রীতি যে এ নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বহতা এক নদীর বুকে আলোছায়ায় ঝিকিমিকি খেলা দু'চোখ ভরে দেখেছেন এবং তার আনন্দে আমাকেও অংশীদার করে নিয়েছেন এ জন্য আমার ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। লেখক সরাসবি অতলে ডুব না দিলে যে পাঠকের মন ওঠে না এ লেখা তার জন্য নয়। আমি কিন্তু সে দলে নই।

এ বইতে পাঠক পরিচিত হবেন এক নতুন ধরনের অধ্যাপকের সঙ্গে যিনি ক্লাসের প্রথমদিন একটা ছোট নোটবুকে ছাত্রছাত্রীদের নাম ঠিকানা টুকে রাখেন, যার ফলে কৃষ্ণনগরের চারপাশে শিরা-উপশিরার মতো ছড়ানো গাঁগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় কোনো-না-কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মুখ। গ্রামে গেলে ছাত্রের কথা বা অনেককাল পরে ছাত্র রাস্তায় প্রণাম করলে তার গ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। এই অধ্যাপক বাংলা বন্ধের দিন সাইকেল চালিয়ে হাজির হন উষি, খুশি, মেঘলি, পুষ্পদের গ্রামে যারা প্রতিদিন তাঁর পাড়ার বাজারে তরিতরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসে। স্থানে অস্থানে বাস থামলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সাইনবোর্ড পড়েন, জায়গার নাম 'খোকাপট্টি' বা 'জব্দপুর' কেন হলো সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেন, সেই সূত্রে মাঠাল-ব্রতের গাঁ-এর নামবৃত্তান্ত জানা হয়ে যায়। যেসব নাম মনে ধরে যায় সেসব জায়গায় আবার ফিরে আসেন, বিশেষত যদি গানবাজনা সংক্রান্ত কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা কানে আসে। একেবারে গোড়ায় 'আত্মপক্ষ' অংশে লেখক বলছেন : 'গান আর গ্রাম, আমার বরাবরের অনুরাগের দুটি বিষয়। বছর

তিরিশ ধরে বাংলা গানের নানা ধরন খুঁজতে ঘুরে বেড়িয়েছি অগণন গ্রাম। সেই সুবাদে ঘটেছে একজন শহরবাসী মানুষের নানা গ্রামিক অভিজ্ঞতা। সঞ্চিত হয়েছে কত রকমের আখ্যান ও লোককথা, কত গান ও যাপনের বিভঙ্গ।.....খবরের কাগজের চোখ, রাজনীতির চশমা কিংবা সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রাহকের কেঠো তথ্যপঞ্জির বাইরে রয়ে গেছে অন্য একরকম গ্রামীণ জীবন, অন্য এক ধারার স্পন্দ। আমার চেষ্টা সেইটাকে ধরা। সমাজ ইতিহাস আর সমাজ-বিজ্ঞানের উৎসাহী মানুষজন এসব লেখায় পেতেও পারেন কোনো সত্য। সৎ অবলোকন ও উদ্ধার। এখানে কোনো বানানো বিবরণ নেই, সবই স্বচক্ষে দেখা।'

অচেনা যে জগতের সামনের পর্দাটা লেখক তুলে দিয়েছেন তাতে কত আশ্চর্য চরিত্রের ভিড় : গ্রামসেবিকা অর্পিতা অ্যাঞ্জেলা বাড়ুই আর তার বন্ধু স্যামুয়েল, পাখমারার ওজবুত (রাজপুত) সুধন্য রায়—যাঁর পূর্বপুরুষরা রাজা মানসিংহের আমলে এসেশে আসেন, ভূতচন্দ্রপুরের অসামান্য গণেশমামা (ও তাঁর অ্যাডমিট কার্ড), কৃষ্ণনগরে বাসাভাড়া করে থাকা আম্বিয়া বেগম— যে মোল্লাশাসিত গন্ডগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে ছেলেমেয়ে দুটোকে আধুনিক শিক্ষায় পোক্ত করবে বলে, উদাস বৈরাগী শ্যামাদাস গণাই—যাঁর ছেলে ভক্তদাস প্রথমে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে এফিডেভিট করে হলো উদয়ন গণাই আর পরে কাকলি রায়কে বিয়ে করে তার কথায় গণাই পাল্টে হলো রায় ("দুটো এফিডেভিটে এপিঠ-দুপিঠ দুটোই গেল"), যাঁর নাতি সুদর্শন রায় উচ্চমাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করে এখন কানপুর আই.আই.টির ছাত্র, এরকম লোকেরা পাতায় পাতায় ভির করে রয়েছেন, কাকে ছেড়ে কার কথা বলি!

অত্যন্ত অনায়াসে সকলের সঙ্গে মেশার ক্ষমতার গুণেই সুধীরবাবুর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারটি সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। তবে শুধু অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট নয়, সঙ্গে লেখার হাতও থাকা চাই। সজীব উপাদানের উপযুক্ত তরতরে ভাষা লেখকের আয়ত্তে। চমৎকার আখ্যান 'চায়নার পালাকীর্তন'-এর সূচনা থেকে একটুখানি উদ্ধৃতি এ ভাষার স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

> কীর্ণাহার যাবার পথে বাসরাস্তায় নানারকম গ্রাম বিছানো আছে। বাসের জানালার ধারে বসে সেইসব গ্রামপথের সূচনা দেখি, গ্রামের নামটা জানতে পারি না। কেবল যেখানে বাসস্টপ সেইখানে আছে কটা খড়ের চালার দোকান। দোকানের সাইনবোর্ড থেকে গ্রামের নাম জানা যায়। যেতে যেতে নামটা মনে থেকে যায়। যেমন কোমরপুর। বেশ চার-পাঁচটা দোকান। তার মধ্যে চালু একটা মিষ্টির দোকান : শ্রীনিবাস মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। দোকানের বারান্দায় বড় কড়াতে টগবগ করে ফোটে টাটকা রসগোল্লা। বেশ লোভ লাগে টপাটপ কটা মুখে পুরি। হয় না। আধ মিনিটের স্টপ বড় জোর। যাত্রী তোলা-পাড়া করে হুস্ করে বাস ছেড়ে দেয়। মিষ্টির দোকানের পাশেই মহাপ্রভু স্টোর্স, সেখানে পাওয়া যায় গৌরাঙ্গ বিড়ি স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। এ

দোকানটাও খুব টানে আমাকে। মহাপ্রভুর এই বিড়ি-পরিণতি ভারি চমৎকৃতিপূর্ণ। দোকানের পাশে একটা ঝাঁপানো কেলিকদম গাছ। তার গুঁড়িতে বেশ বড়সড় একখানা সাইনবোর্ড চোখে পড়ে : কীর্তনরসসিন্ধু কৃষ্ণভামিনী দাসী। লীলাকীর্তনের পায়নার জন্য যোগাযোগ করুন। করুন বানানটি করুণ। সত্যি বেশ লোভ লাগে নেমে পড়তে। নামলে মন্দ হয় না। থ্রি-ইন-ওয়ান। একই সঙ্গে শ্রীনিবাসের রসগোল্লা, গৌরাঙ্গ বিড়ি এবং কৃষ্ণভামিনীর কীর্তন।...

গত তিন দশকে গ্রামবাংলার জীবন-স্পন্দে পরিবর্তনও কম হয় নি। ইউরিয়া, পটাশ, নাইট্রোজেন, শ্যালোপাম্প, ভটভটি নৌকার সঙ্গে এসেছে হাতবোমা, পাইপগান, জিনসের প্যান্ট আর ভিডিও হলে নীলছবি। কড়চার দর্পণে এরাও প্রতিফলিত। মুনিষরা বিকেলবেলা দলবেঁধে মাঠ থেকে চলে এল কারণ কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বিদেশী দলের খেলা আছে। গজর গজর করতে করতে জমির মালিক ব্যাটারির টিভি চালিয়ে দিলে। 'সন্ধ্যেবেলা আমার আসব চিত্রহার দেখতে।'

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছেন। সুন্দর বাঁধানো, ধপধপে কাগজে সুন্দর ছাপানো বইটি হাতে নিলেই ভালো লাগে। একটু অন্যধরনের চওড়া গড়ন আর কৃষেন্দু চাকীর অভিরাম অলংকরণ লেখার চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে। ঠিক মনে হয় একটি ঝক্ঝকে অ্যালবামের পাতা উল্টে চলেছি। আশা করছি প্রতিক্ষণ ও শ্রীচক্রবর্তী তরফ থেকে এরকম বই ভবিষ্যতেও পেতে থাকব।

বারোমাস
শারদীয় ১৯৯৫

৬. ৩. ২. আলোচক : **সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী**

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। ক'জন পারেন এ কথা বলতে? ক'জন দেখেছেন বাংলার মুখ? সুধীর চক্রবর্তী দেখেছেন। নিজেই বলেছেন, তাঁর অনুরাগের বিষয় দু'টি : গান আর গ্রাম। গত তিরিশ বছর ধরে বাংলার অগণন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। খুবই কাছ থেকে দেখেছেন গ্রামের জীবনকে। মানুষের কাছাকাছি গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের জীবনযাপনের বিন্যাস, সংগ্রহ করেছেন লৌকিক কাহিনী, মানুষের গল্প; লক্ষ করেছেন তাদের বিশ্বাসের জগৎ, পরিবর্তনের মাত্রা, জীবনযাপনে আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনার নানা দিক। "খবরের কাগজের চোখ,/রাজনীতির চশমা কিংবা সরকারি পরিসংখ্যান সংগ্রাহকের কেঠো তথ্যপঞ্জির বাইরে রয়ে গেছে অন্য এক রকম গ্রামীণ জীবন, অন্য এক ধারার স্পন্দ।" আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেটাকেই ধরার চেষ্টা করেছেন।

সতত পরিবর্তনশীল গ্রামীণ জীবনের খবর শহুরে লোকেরা খুব বেশি রাখেন না।

সুধীর চক্রবর্তী রাখেন এবং তার সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায়। যে মানবিক মমত্ব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষুধার পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকলে গ্রামীণ জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি চোখে পড়ে তার প্রতিটিই লেখকের মধ্যে আছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেমন তিনি চলে যান তেমনই অনায়াস তাঁর সঞ্চরণ এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনীতে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, জীবনের এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা, সর্বদা সজাগ তাঁর বিশ্লেষণী মন। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রামকে তিনি দেখেছেন গ্রামের চোখ দিয়ে। শহুরে মানুষের চশমা—"গ্রামের মানুষের প্রতি উপহাস আর করুণার দুটি পরকলা তাতে"—দিয়ে দেখা এ বৃত্তান্ত নয়। লেখক নিজেও সজাগ যে গ্রামের প্রতি আরও এক ধরনের আগ্রহও দেখা দিচ্ছে, সম্প্রতি?...'সব কিছু হাতিয়ে নেওয়া। বাগানভরা আম, পুকুরের মাছ, দুধ ছানা, টাটকা ডিম, দেশী হাঁসমুরগি, পাঁঠা, এঁচোড়, ফলপাকুড় যা পাবে কিনে এনে শহুরে বেচে দাও ডবল দামে। শুধু কি তাই? আনো মন্দির থেকে টেরাকোটার প্যানেল ভেঙে, ঘর সাজাও। আনো গ্রামদেবতার মূর্তি। গ্রাম্য গানের খাতা, পি এইচ-ডি হবে মওকায়।" বলা বাহুল্য, এই স্বার্থবোধ থেকেও তিনি গ্রামের পথ পা বাড়াননি।

বিচিত্র সব চরিত্র এসে ভিড় করেছে সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়। কত অভিজ্ঞতা, কী বিপুল তাঁর সংগ্রহ। আর তা থেকেই স্পষ্ট হেয়ে ওঠে গ্রাম-জীবনে পরিবর্তনের ছবি—যে পরিবর্তন ধরা পড়েছে 'বোলান' গানের 'রং পাঁচালি' অংশে। গ্রামেও এখন ভিডিও নীল ছবির রমরমা।

বিদ্যালয়ে চাকরি পেতে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিতে হলে তা উসুল হয়ে যায় বিয়ের সময়ে, আদায় করা বরপণ থেকে। গ্রামের বড়লোকরা পাড়ি দিচ্ছেন শহরে। পালটে যাচ্ছে গ্রামের মানুষের হিসাবি বুদ্ধি। কলকাতার মিছিলে যোগ দিতে এসে মওকা বুঝে পারিশ্রমিব বাড়িয়ে নেন; নিরাপত্তার সন্ধানে যোগ দেন রাজনীতিতে, তার সূত্রেই চাকুরি জোটে, ঘটে উন্নতি।

গ্রাম-জীবনের অন্তহীন খুঁটিনাটি বিষয় আছে এই গ্রন্থে। সীমান্তে মানুষজনের উত্তেজনা, অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণির সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, গ্রামের মানুষদের বঞ্চনা, শহরের বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করতে আসা মেয়েদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অনেক আয়োজনে তার আহরণে যত্নময়।

আমেরিকা-প্রত্যাগত কাঠের কারিগরের চতুর বুদ্ধি , তাঁতির জীবনকাহিনী—শিক্ষিত পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে সর্বাবধি পার্থক্য, আত্মসচেতন আম্বিয়া বিবির সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্য সংগ্রাম, এক হাঁড়ি রসগোল্লার জন্য দু'জন যুবককে খুন, গ্রামের তেজি অর্থনীতির চেহারা, কবি সম্মেলন, কবিতা-পাগল যুবতী (তাঁর মডেল স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত, অনুরাধা মহাপাত্র), রবীন্দ্রজয়ন্তীতে স্থানীয় শিল্পীর গাওয়া 'মেহনতি মানুষের গান' ("দই চাই গো দই চাই"), মহিলা কীর্তন শিল্পীর দারিদ্র, অপরাধের আবছায়া জগৎ, বন সংরক্ষণের সমস্যা—প্রতিটি চরিত্র, বিষয়ই তাদের নিজস্বতা, খুঁটিনাটি নিয়ে উপস্থিত।

এটি সমাজতত্ত্বের বই নয়। গুরু গবেষণার বোঝা এর গতিকে শ্লথ করেনি। এটি লঘু ছন্দে, অত্বর গতিতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলার পথের সঞ্চয়। সেই সুযোগে লেখকের হাত ধরে পাঠক পৌঁছে যান গ্রামীণ জীবনের প্রতিটি অনুপুঙ্খে। এই বইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ এর প্রসন্ন মানবিক দৃষ্টি। আর এই কারণেই তিনি সহজেই প্রবেশ করতে পেরেছেন গ্রাম-জীবনের গভীরে, অনুধাবন করতে পেরেছেন তার পরিবর্তনের মাত্রা। গ্রামেরও কি মুখ ঢেকে যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে? রবীন্দ্রনাথের "ফিরে চল মাটির টানে—" গানের উল্লেখ করে লেখক প্রশ্ন করেছেন, সেটা কোন মাটি? এই প্রশ্ন কিন্তু পাঠকের মনেও থেকেই যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

(চ) বিচিত্র

চ. ১. রূপে বর্ণে ছন্দে

চ. ১. ১. আলোচক : গৌতম ঘোষদস্তিদার

আমরা যাঁদের লেখা পড়ে বড় হয়েছি, সরাসরি ছাত্র না-হলেও, যাঁদের দুর থেকে জেনেছি অমোঘ মাস্টারমশাই বলে, তাঁদের একজন হলেন শঙ্খ ঘোষ, অন্যজন সুধীর চক্রবর্তী। এঁদের কখনও জানানো হয়নি, তাঁদের কোনও টুকরো লেখা বা আস্ত বই পড়ে কীভাবে খুলে গিয়েছে আমাদের কোনও উদ্ভূত জট-জটিলতা, সাহিত্যের, সমাজ ও সময়ের। জানানোর তেমন প্রয়োজন হয়নি। কেবল জেনেছি, জানার চেষ্টা করেছি। সব সময় সমস্ত মতামত, সিদ্ধান্ত, বিশ্লেষণ মানতে পারিনি। কিন্তু, নতুন ভাবনা-উপাদান পেয়েছি। লক্ষ করেছি, সমকালীন এই দুই সাহিত্যবিদ সুহৃদের নিজস্ব লেখালিখির মধ্যে, বিস্তর বিষয়িক ফারাক সত্ত্বেও, কোথায় একটি গভীর সৌহার্দ্য রয়ে গিয়েছে। তাঁদের বিষয়গত বিস্তৃতি আর লেখনভঙ্গির অন্তর্গত সাদৃশ্য আমাদের দিনে-দিনে সমৃদ্ধ করেছে। গভীর নির্জন পথের এই দুই পথিক যে এক অর্থে উঠেছেন আমাদের সময়ের কে অনিবার্য প্রবক্তা, এ-কথাটি এখন বেশ বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, নিচু কণ্ঠে কথা বলাও কী প্রবল দেদীপ্যমান, প্রভাববিস্তারী হতে পারে।

শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিকতম বই 'দামিনীর গান' সম্পূর্ণ গানের বই। এ-কথা কে না-জানে যে, গান মানে, শঙ্খ ঘোষের কাছে, রবীন্দ্রনাথের গান। শম্ভু মিত্রর শেষবেলার অভিনয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে যে-প্রাপ্তি ছিল না, আমরা যেমন শিখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নাটক, শঙ্খ ঘোষ পড়ে সে-ভাবেই অধীত হয়েছি রবীন্দ্রগান, চিনতে পেরেছি তাঁর গানের মোহিনী আড়াল। 'দামিনীর গান' বইটি আমাদের আবার নতুন করে সমৃদ্ধ করল।

শঙ্খ ঘোষের অধিকাংশ বই যেমন হয়, বক্ষ্যমান বইটিও অনুরূপ, সংক্ষিপ্তকায়। তিনটি অংশে বিবক্ত এই বইয়ে পর্যায়ক্রমে রয়েছে এগারোটি নাতিদীর্ঘ রচনা—শিল্প থেকে জীবন, গান আর ধর্ম, প্রত্যয়ের গান, অভিমানের গান, দামিনীর গান, আমি বলে, মিলাই আমি নীরব গীতরসে, সে-কথা কি গেছে ভুলে, বোঝা-না-বোঝায় মেশা, সোনালি রেখার চিহ্ন, হারিয়ে যাওয়া গান। নামকরণেই রচনাগুলির নিহিত বিষয় পরিস্ফুট হয়। আমরা, এই রচনাগুলির পাঠ নিতে-নিতে প্রবেশ করি রবীন্দ্রনাথের গানের এক অননুভব্য জগতে। আলোচ্য গানগুলি তখন আমাদের ভিতর-শ্রবণে অলক্ষে বাজতে থাকে। মনে হয়, এই সব গান আমরা তো আগে এ-ভাবে অনুভব করিনি, শুনিনি এমন ব্যঞ্জনায়, এমন সংকেতে!

অবনীন্দ্রনাথ বলতেন, "তোমরা সব রবিকার জীবনী খুঁজছ, রবিকার গানই তো তাঁর জীবনী।" আবার নীরদচন্দ্র চৌধুরি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের "গানগুলিকে তারিখ অনুযায়ী সাজাইলে এগুলি হইতেই তাঁর মাসিক জীবনী লেখা যায়।" শঙ্খ ঘোষ এই দু'টি অমোঘ ও পরস্পরবিরোধী নিরিখে, বিভিন্ন গানের অনুসরণে, আমাদের দেখাতে চান রবীন্দ্রনাথের দু'টি

জীবন—বাইরের ও ভিতরের। উদ্ধৃত, বহুশ্রুত গানগুলি তখন আমাদের কাছে নতুন করে ঝলসে ওঠে। আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান নতুন রবীন্দ্রনাথ, আমাদের হাত ধরেন, অন্ধকারে।

আমরা ক্রমশ লক্ষ করতে থাকি, গোটা জীবনে গানের অবলম্বনে তিনি কীভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, একটি উপলক্ষ-রচিত গান থেকে তিনি নিজেই কীভাবে পরবর্তী সময়ে খুঁজে নিতে পেরেছেন ব্যক্তিগত পরিত্রাণ। এমনকী, অন্যে কীভাবে তাঁর গানে আশ্রিত হয়েছেন, তা-ও জেনে যাই আমরা। জেনে নিতে পারি, আপাত-সরল গানের কথার অন্তর্নিহিত দুরূহতা, গভীরতা। কুমুদিনী আর দামিনী—রবীন্দ্র উপন্যাসের দুই গভীরতর নারীর গানের বেদনা এই বইয়ে লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। গানে-উপন্যাসে মিলিয়ে দেখেছেন গানকে। দেখেছেন সময়ের সঙ্গে, বিস্মরণের সঙ্গে, জানা-অজানার সঙ্গে মিলিয়ে। আর, সমস্ত দেখা আর দেখানোটি এমনই স্বভাবত-মিতভাষ আর প্রশ্নাতুর আত্মবিশ্বাস পরিপূর্ণ যে, আমাদের এই বই পড়ার পর এক ধরনের প্রশান্তি আর অস্থিরতায় বশীভূত না-হয়ে উপায় থাকে না।

রবীন্দ্রগানের শিক্ষা আমরা যদি পেয়ে থাকি শঙ্খ ঘোষের কাছে, লোকায়ত গানের ভুবনটি তা হলে আমাদের কাছে সুবিস্তৃত করে দিয়েছেন সুধীর চক্রবর্তী। গভীর নির্জন পথে তাঁর ব্যক্তিগত যাত্রায় আমরা দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করেছি। তাঁর সাম্প্রতিকতম বই 'রূপে বর্ণে ছন্দে' অবশ্য সবিশেষ সংগীত-সংক্রান্ত সংকলন নয়। গান আছে এখানে আবহ সংগীতের মতো, বেশিটা জুড়ে রয়েছে সময় আর সমাজ। পাচটি বিষয়-পর্বে বিভক্ত তেইশটি খণ্ড-রচনা জুড়ে এখানে তৈরি হয়েছে যে-সামগ্রিকতা, তা পূর্ণ করে আমাদের পরিপাশ।

হিন্দু-মুসলমানের কিসসা, ভাবনা আমার পথ ভোলে, বিশ্বায়ন ও বাংলার গ্রাম, সীমানা ভাঙা ধর্ম, স্টেশনে জাগিছে শ্যামা, জাদু-বাস্তবের শৈশব, আগমনীর আগমনে, গভীর গোপন ইত্যাকার রচনার অধিকাংশই আগে আমরা সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে পড়েছি। সংবাদপত্রের উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধেও সুধীর চক্রবর্তী বারবার আমাদের মুগ্ধবোধ জাগিয়ে তুলেছেন। একটি আপাত-অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বা প্রসঙ্গের নিরিখে আমাদের মুখোমুখি করে দিয়েছেন অভাবিত নানা প্রশ্নের, সংশয়ের, বিশ্বাসের। আমরা দেখেছি, তাঁর সহজাত, স্বাভাবিক এবং সুপ্রচারিত প্রবণতার বাইরেও তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক এবং অব্যর্থ।

এই সংকলনের সমস্ত রচনাই পারিপার্শ্বিকতার নানা অভিঘাতে প্রাণিত। সুধীর চক্রবর্তীর রচনার সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ হল, নানা গূঢ় কথাও তিনি বলেন খুব সহজ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশে থাকে তাঁর রচনার পরতে-পরতে—তা সে বাউল-ফকিরের বৃত্তান্তই হোক, আর হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কই হোক, বা খাওয়াদাওয়া-বিষয়ক রচনাই হোক। এই সংকলনের রচনাগুলিও তাঁর বিবিধ সংরাগের ভাষারূপ হিসাবে হয়ে উঠেছে পূর্বাপর অনবদ্য, যার বাহক আসলে তাঁর সাবলীল ও সুস্বাদু গদ্য—যেমন শঙ্খ ঘোষেরও।

['দামিনীর গান', শঙ্খ ঘোষ ও 'রূপে বর্ণে ছন্দে', সুধীর চক্রবর্তী, বই দুটি একত্রে আলোচিত হয়েছে।]

প্রতিদিন
২০ এপ্রিল ২০০৩

জ. শিল্পকলা

জ. ২. চালচিত্রের চিত্রলেখা

জ. ২. ১. আলোচক : **স্বপনবরণ আচার্য**

এমন লেখা কচিৎ হাতে আসে, যা পড়তে পড়তে একথা স্বতই মনে হয় যে, এ শুধু একজন লেখকের লেখা নয়, একটি সম্পূর্ণ চরিত্রের ফসল। সুধীর চক্রবর্তীর 'চালচিত্রের চিত্রলেখা' তেমন একটি বই।

বইটি চালচিত্র সম্বন্ধীয়। একথা ব'লেই পরক্ষণে ভাবতে হচ্ছে, বিষয়বিচারটুকু খণ্ডসত্য হয়ে গেল। আমাদের দেবীচাল, তার উৎস ও বৈচিত্র্যের হাজারো দিক, তার বর্তমান অবস্থা এবং প্রায় নিশ্চিত পরিণতি, আমাদের চালচিত্রের চিত্রকরের—বইটি এমন বহু বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করে। এবং যদি শুধু তাই-ই হতো তবে 'বইটি চালচিত্র সম্বন্ধীয়', একথা বলে তাকে খণ্ডসত্য বলতে হতো না। দ্বিতীয় বার ভাবতে হতো না। ভাবতে হচ্ছে কারণ, বইটি এই বিষয়াতীত। এবং ঠিক এই কারণেই, এই বইয়ে প্রদত্ত 'সমাজ-ইতিহাস-পুরাণ-জাতিতত্ত্ব-ধর্ম-শিল্প' সংক্রান্ত অজস্র তত্ত্ব ও তথ্যকে স্বীকার (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বীকারও) করে নিয়েও আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে সেই বিষয়াতীতে যা বইটির প্রায় প্রতিটি শব্দকে উপলক্ষ্যমাত্র করে দিয়ে নিজে দ্যুতিমান হ'য়ে উঠেছে। কি সেই বিষয়াতীত, সে কথায় যাবার আগে একথা অবশ্যই ব'লে নিতে হবে যে, তত্ত্ব ও তথ্যসংক্রান্ত কূটকচালি নিয়ে যদি মাতি—যদি অমুক সালটা তমুক সাল হবে আর অমুক গ্রামটা তমুক পরগনায় নয় আর অমুক রঙটা তমুকভাবে লাগায় না ইত্যাদি হাজার তর্কে পাতা ভরাই তবে সমালোচকীয় 'কড়াত্ব' কিংবা 'জ্ঞানভাব' বেশ প্রকাশিত হয় কিন্তু বইটি বাদ পড়ে যায়। বইটি লজিকের নয় এবং দেখতে-শুনতে গবেষণাগ্রন্থ হলেও তথাকথিত গবেষণাগ্রন্থ নয় যা রসের অভাবে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথায় পড়ে আর রসের অভাবে ধাতব মাথায় মহা শব্দ তোলে। চালচিত্রের চিত্রলেখার বিষয় চালচিত্র হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য অন্য। সেটিই আলোচ্য। বইটি যথেষ্ট সরস এবং সহৃদয়, একজন মানুষের আশৈশব লালিত ইচ্ছা আগ্রহ এবং তিরিশ বছর ব্যাপী খোঁজ-বিশ্লেষণ-শ্রমজাত নির্যাস নিয়ে পঁচানব্বই পৃষ্ঠা। এইজন্যই বলি, এ নিছক কোনো লেখকের লেখা নয়, একটি সম্পূর্ণ চরিত্রের ফসল।

পাঠকের ভুল বোঝার শিকার হতে পারি এই আশঙ্কা থেকে বলি, 'চালচিত্রের চিত্রলেখা'র আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার বৃত্তটি একটু বড়োই করে নিতে হচ্ছে যাকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে হতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। আমাদের এখন 'টুক-ক'রে লিখে-ফেলা' বইয়ের যুগ এবং সেগুলি আমরা হুট করে পড়ে ফেলে 'দুম্' ক'রে মত দিয়ে দিতে অভ্যস্ত। এহেন অভ্যাসে লালিত চিত্তে এই রকম একটি বহুদিনও শ্রমজাত বই এসে পড়লে, কিছুটা তো দিশেহারা লাগেই। বোঝা যায় না কোথা থেকে টেনে আনব এর প্রাসঙ্গিকতা। মাটির নীচে কতটা খুঁড়ে দেখাব। গাছের যে চেহারা আমরা মাটির সরলরেখার উপরে দেখতে অভ্যস্ত গাছ তো সম্পূর্ণত তেমন নয়। শিকড়টুকু নিয়ে

পুরো গাছ। তাই হঠাৎ তেমন একটা ছবি দেখলে কেমন চমক লাগে, অচেনা লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, চালচিত্র ব্যাপারটা কি তা আমরা কজন জানি? ঐতিহ্যবোধবিবর্জিত, মূর্খের স্বর্গের বাসিন্দা, আত্মকেন্দ্রিক অথচ আত্মবিশ্বাসে-রুগ্ন আমাদের সদর্থে-ছিন্নমূল জীবনে 'চালচিত্রের চিত্রলেখা'র আলোচনা তো শুধু চালচিত্র নিয়ে নয়। সেটি একটি দিকমাত্র। আমাদের ইতিহাসসমৃদ্ধ অথচ ইতিহাসবোধহীন জীবনে মহান অতীতের তিলে তিলে সর্বনাশপ্রাপ্ত হবার আরও কত দিক আছে। সুধীরবাবুর আলোচ্য তেমনই একটি দিক। বইটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়, চালচিত্র উপলক্ষ্যমাত্র। এ বইয়ের বিষয় 'সামাজিক যক্ষ্মার' ক্ষয়। মনে হয়, এ বইয়ের মূলকথা তিরস্কার। পড়তে পড়তে ভাবি, যেন এক বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির শেষ উদাহরণ কয়েকটি নিভৃতচারী খুব-রঙিন পাখীর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান-লোপ-এর মর্মান্তিক কাহিনী শুনছি একজন প্রাণ-প্রেমিক জীবনবিজ্ঞান শিল্পীর মুখে। একটা হাহাকারও, আত্মবিস্মৃত, কুয়োর-ব্যাঙদের কানে একটা সামুদ্রিক আবেদন। সুতরাং 'চালচিত্রের চিত্রলেখা'র বিষয় ঠিক চালচিত্র নয়।

আমাদের দেবীর পিছনে, মাথার একটু উপরে সযত্ন নির্মিত পটভূমে যে রঙ ও রেখার বন্যা থাকে, কিংবা থাকত, সেই সমুদ্র থেকে কত দূরে চলে এসেছি আজ আমরা। আমাদের বারোয়ারীতে আজ চালচিত্রের চিত্রকরের জায়গায় আধুনিক রঙের টিউব হাতে সার্চলাইটের নীচে দাঁড়ান আর্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র পাড়ার ছেলে কিংবা সাইনবোর্ডশিল্পী। ইতিহাসহীন, ভক্তিহীন, কল্পনা ও সৃষ্টিহীন অক্ষম হাত, অক্ষম মগজ, অক্ষম পূজাকমিটির প্ররোচনায় দেবীর পিছনে সিমেন্টের এঁকে দেয় অদ্ভুত আকাশ, উদ্ভট পাইন গাছ, ঝকমকে পাক-খাওয়া পীচরাস্তা আর হঠাৎই, ক্যালেণ্ডার-কাটা শিবের ছবি সেঁটে দেয় এক কোণে, তার পাশেই সূর্য। 'চালচিত্রের চিত্রলেখা' আমাদের এই কুৎসিৎ, উল্লসিত আয়োজনের উপর সপাট থাপ্পড়ের মতো এসে পড়ে। পঁচানব্বই পৃষ্ঠার শীর্ণায়তন বইটি খুঁটে খুঁটে দেখাতে থাকে কী বিপুল ও সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প-প্রতিভা, কল্পনাশক্তি, ভক্তি, মঙ্গল ও সুন্দরের অদম্য প্রবাহ বয়ে গেছে দেবীমূর্তির পশ্চাদপটে, মাথার ওপরে ওই স্থানটুকুকে অবলম্বন করে। পুরাণ, শাস্ত্রাদি, বিশ্বাস, অঙ্কনরীতি কী মহিমাময় তাৎপর্যে দেবীকে আমাদের ঘরের মেয়ে করবার জন্য মাথার উপরে 'চাল' দিয়েছে আবার পাছে তিনি সম্পূর্ণই ঘরের মেয়ে হয়ে যান, যেন এই ভয়েই সেই চালের উপর এঁকে দিয়েছে সেই সমস্ত অপার্থিব রঙিন রেখার ইঙ্গিত যা মেয়ের ভিতরে আভাসে ধরে রেখেছে দেবীকে। কী সুদূরপ্রসারী এর পুলকিত গাম্ভীর্য। পড়তে পড়তে মনে হয়, মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন। মনে হয়, দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে আমাদের বর্তমান যে 'শাড়ি আর তাড়ির উল্লাসে' মত্ত হ'য়ে ওঠে সেই মত্ততাকে শান্ত হয়ে শিকড় খোঁজবার অনুরোধ জানাচ্ছে চালচিত্রের চিত্রলেখা। এ বই তো শুধু চালচিত্র-সম্বন্ধীয় হতে পারে না।

আরও আছে চালচিত্রের চিত্রকরদের কথা। বাংলা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে তাঁদের শেষ কয়েকটি উদাহরণের সম্মুখীন হয়েছেন সুধীরবাবু। মিশে গেছেন সেই সমস্ত দরিদ্র, জীবনযাপন প্রক্রিয়ার প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, অন্ধকারবাসী, রুগ্ন, অভিমানী, মুখচোরা, আরও কতরকম মানুষগুলির সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কখনো বা আসল কথাটার খোঁজে কৌশল অবলম্বন করেছেন, তাঁদের উৎসাহিত করেছেন কথায়, কাহিনীতে

আর তীব্র যন্ত্রণার মতো ঝাঁকিয়ে-দিয়ে-যাওয়া সেই সমস্ত কথা দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশটি। সে সমস্ত কাহিনী, চালচিত্রের চিত্রলেখার পাঠ্য। সে কথার আভাস দেওয়ারও অধিকার এই আলোচকের নেই কারণ এই আলোচক তাঁদের দেখেনি এবং সুধীরবাবুর 'দেখা' থেকে ওই সমস্ত শিল্পীদের জীবন ও অস্তিত্বের যে ঘন ও সত্য ছবি উঠে এসেছে তা থেকে পাঠককে বঞ্চিত করতে এই আলোচক রাজী নয়। আমাদের বদভ্যাস এই 'রিভিউ' পড়তে এত ভালোবাসে যে বই পড়ে না। ঘোল খেয়ে দই-এর গল্প করে বেড়ায়। চায়ের মজলিশে। 'বুক অব্ বুকস্' তৈরির ইচ্ছা এই আলোচকের নেই।

এবং 'চালচিত্রের চিত্রলেখা' শুধু চালচিত্র সম্বন্ধে আমাদের অসচেতনভাবে কাহিনীই নয়। আমাদের ফ্ল্যাটবাসী, অনুকরণপ্রিয়, ছোটপরিবারের মর্মন্তুদ মানসিক দৈন্যের প্রতিবাদও বটে। সহানুভূতিহীনতা কোন পর্যায়ে গেলে একটা জাত বা জাতি এতটা অজ্ঞ অথচ নিশ্চিন্ত হতে পারে—এ বই আমাদের সে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা থাকেন বৃদ্ধাশ্রমে! যে ছেলেটি দুর্গাপুজোর সময় ইচ্ছেমতন দেওয়াল আঁকে, তার দোষ নেই! পুরাণের গল্প সে কার কাছে শুনবে? চালচিত্রের চিত্রলেখায় এই মহারোগের ইঙ্গিত আছে। বইটি আসলে একটি 'তলিয়ে যাবার' বিভৎস গল্প শোনায়। গল্পের মতোই তার মজা কিন্তু আত্মস্থ করলে থেকে থেকে শিউরে উঠতে হয় আর চতুর্দিকে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছেন তাদের অপমানিত ও অসহায় শিল্পীরা। চালচিত্রের চিত্রলেখা সেখানে একটি ঘন ও তীব্র সাবধানবাণী। বইটির প্রথম অংশে একটি সন্ধানী আলো বিস্মৃত-ঐতিহ্যের ঘন অন্ধকার চিরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘোরে, থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বহুদিন অযত্নে পড়ে থাকা পূর্বপুরুষদের ইচ্ছা-কল্পনা-ভক্তি ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার লুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলি। চমকে উঠতে হয়। আর দ্বিতীয় অংশে, একটি সুতীক্ষ্ণ ও উচ্চকিত বিপদ-বাঁশী ফিনকি দিয়ে ওঠে একটি আন্তরিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় থেকে। এই জন্যই বলেছি, এ নিছক কোনো লেখকের লেখা নয়, একটি সম্পূর্ণ চরিত্রের ফসল।

একটু বিশেষ মাপে উজ্জ্বল প্রচ্ছদের বই, 'চালচিত্রের চিত্রলেখা'। বইটির অসম্ভব যন্ত্রণাকাতর অন্তরকে মলাটের উজ্জ্বল রঙ আরও দগ্ধ করে যায় যেন। অলংকরণ ও অন্যান্য ছবিগুলি সুখকর।

সবশেষে বলতে হবে একটি কথা যে, এই আলোচকের কাছে, এত কিছুর পরেও, বটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এর গদ্যরস। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই যে একটি বই লেখা যায় না, একথা বর্তমান বাংলা বইয়ের জগতে এখুনি প্রচার করা দরকার। বই লিখতে গেলে, সাহিত্যসৃষ্টিতে, সবচেয়ে বেশি দরকার প্রকাশমাধ্যম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ভাষাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা। তা বিষয়াতীত। এখন দেখা যায় খুব জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষ বই লিখছেন শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নির্ভর হয়ে, নড়বড়ে অক্ষম গদ্যে। চালচিত্রের চিত্রলেখা এত আকর্ষণীয় বিষয়-অবলম্বন করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেত এই গদ্যটি না থাকলে যে ভঙ্গি এমন জটিল বিষয়কে তথাকথিত গবেষণাগ্রন্থ হ'তে দেয়নি।

সেইখানেই এ বইয়ের সাহিত্যগুণ।

বারোমাস
শারদীয় ১৯৯৪

(ঝ) সম্পাদিত সংকলন

ঝ. ১. অমৃত যন্ত্রণা

ঝ. ১. ১. আলোচক : **সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী**

কখনও কখনও এরকমও হয়। অর্ধেক জীবন কিংবা তারও ঢের দূরে ফেলে আসা একটি কিংবা তারও ঢের দূরে ফেলে আসা একটি কি দুটি আনির ডাক নাড়া দিতে থাকে। মনে হয় বাক্সতোরঙ্গ হাঁটকাই, যদি পাই, যদি পেয়ে যাওয়া যায়। কীর্তির চোদ্দ আনাই প্রোজ্জ্বল, বয়স সাতষট্টি, দিল্লী থেকে শিশিরকুমার একদিন চিঠি লিখলেন কৃতী বন্ধু সুধীরকে : 'অমৃতযন্ত্রণা-র পাণ্ডুলিপিটা গেল কোথায়? ছাপা কপি নিশ্চয়ই তোর কাছে আছে। ওটা আবার ছাপালে কেমন হয়?'

১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দুই ছাত্র শিশিরকুমার দাশ এবং সুধীর চক্রবর্তী তাঁদের আরও সাতজন সতীর্থ বন্ধুর প্রেমের কবিতা নিয়ে একটি হাতে-লেখা সঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন। নাম 'অমৃত-যন্ত্রণা'। সম্পাদক সুধীর, হস্তাক্ষর শিশিরকুমারের। সহপাঠী-সহপাঠিনীদের উৎসাহে মাস চারেকের মধ্যেই বেরল তার পরিবর্তিত মুদ্রিত রূপ। সেদিনের ওই তরুণ কবিরা আজ মোটের ওপর চেনা নাম— আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল....। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতর খ্যাতিও মুছে দিতে পারেনি তাঁর কবিপরিচয়। আর শিশির-সুধীর? দুঃসাধ্য পাণ্ডিত্যের দেশ ও ভুবনজোড়া প্রতিষ্ঠায় শিশিরকুমারের কবিখ্যাতি কিছুটা আড়ালে চলে গেছে। কিন্তু কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। তিনি আমর্ম, আজীবন কবিতাবাসী। গবেষক-প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী যে কবিতা লিখতেন, তা বরং আজ বিস্মৃতপ্রায় তথ্য। বিস্মৃতির তন্দ্রা থেকে 'অমৃতযন্ত্রণা' জেগে উঠল শিশিরকুমারের চিঠিতে। মৃত্যুর একমাস আগে লেখা চিঠি। পাণ্ডুলিপি সংস্করণ, মুদ্রিত ও সংস্করণ—দুটোই পাওয়া গেল। শিশিরকুমারের সুছাঁদ লিপিতে লেখা পাণ্ডুলিপি সংস্করণের প্রতিলিপিসহ পরিবর্ধিত সংস্করণটি নতুন করে গ্রন্থিত করলেন সুধীর চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে চার দশকের ব্যবধান থেকে তুলে আনলেন 'সাহিত্যজীবিত' এক উন্মুখ তারুণ্যের নির্যাস। আজ এই সঙ্কলন হাতে নিয়ে কেউ চমৎকৃত হতে পারেন, এই একঝাঁক তরুণ কবিতাপ্রয়াসীর বড় অংশই যুক্ত থেকে গেলেন বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায়।

সুধীর চক্রবর্তী গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় যাঁরা নিজেদের মেলাতে চান', তাঁদের উদ্দেশে। আর ছড়িয়ে দিয়েছেন একটি আক্ষেপ, শিশিরকুমার বইটি দেখে যেতে পারলেন না।

আজকাল

১৬ মে ২০০৪

ঝ. ১. ২. আলোচক : **সমীরণ মুখোপাধ্যায়**

অরণ্য তোমার মন, বৃষ্টি হোক আমার হৃদয়/শাল পলাশের মায়া, বনস্পতি মাথা তুলে চায়/জামবন ফেলে ঘনছায়া....(প্রণব ঘোষ)। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় লিখছেন '....রাস্তায় বেরুলাম/প্রথমেই সেই সবুজ ঘাস ছাওয়া পার্ক/ যেখানে কত রাত্রির নির্জন অন্ধকারে/আমার সোহাগে বিহ্বল হয়ে তুমি শপথ করেছ, একটির পর একটি/আর যে সব শপথ/আজ আর প্রতিপালনের কোন প্রয়োজন নেই'। দ-পাঁচ নয়, আটচল্লিশ বছর আগে (১৩৬৩ বঙ্গাব্দে) প্রথমে হাতে লিখে, পরে ছাপার হরফে প্রকাশ পেয়েছিল 'অমৃত যন্ত্রণা'। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝাঁক তরুণ। কবিতা পড়তেন, কবিতা নিয়ে হৈ রৈ করতেন, চায়ের কাপে উঠতো তুফান। সেইসব তরুণদের লেখা নিয়েই প্রেমের কবিতার এক সঙ্কলন এই 'অমৃত যন্ত্রণা'। সে এক ভিন্ন অনুভূতি। ছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তারাপদ রায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এখন যারা খ্যাতনামাদের তালিকায়। সম্পাদনা ও প্রাক্‌কথনের কাজটি করেন সুধীর চক্রবর্তী। প্রকাশনার অন্দর মহলে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন নির্মাল্য আচার্য, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই 'অমৃত যন্ত্রণা'কে নতুন চেহারায় এবার চিনিয়ে দিচ্ছে ফটিকজল প্রকাশনী। কলকাতার বোসপাড়া লেনের বেশ ব্যতিক্রমী এই প্রকাশনার সুমন ভৌমিক বুকের পাটা প্রদর্শন করলেন 'অমৃত যন্ত্রণা'কে একালের সামনে মেলে ধরে।

আটচল্লিশ বছর পর সম্পাদনার দুরূহ কর্মটি করেছেন সেই সুধীর চক্রবর্তী। তাঁকে খুঁজে ফিরে আবার স্বআসনে বসানোর কান্ড 'ফটিকজল' প্রকাশনীর।

স্মৃতি কি সর্বদাই দুঃখ খুঁড়ে বুকের হা-হা রবকে বাড়িয়ে দেয়? বোধহয় না। আর নয় চমক এবং স্মৃতির বন্যা। 'আত্মপক্ষ' অধ্যায় ওলটাতে চোখ পড়ে সুধীর চক্রবর্তীর লেখায়?

'.....১৩৬৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দু'জন ছাত্র শিশিরকুমার দাশ ও সুধীর চক্রবর্তী তাঁদের অন্য সাতজন সতীর্থ বন্ধুর প্রেমের কবিতা নিয়ে হাতে-লিখে একটি কবিতা সঙ্কলন প্রকাশন করেছিলেন। সম্পাদক সুধীর এবং লিপিকর শিশির। হাতে লিখে কবিতা সঙ্কলনের উদ্যোগী নিতে হয়েছিল নিতান্তই অর্থাভাবে। আকারে প্রকারে ডিমাই সাইজের অবিকল কবিতার বইয়ের মতো দেখতে সেই সঙ্কলন সহপাঠী-পাঠিনীদের হাতে হাতে ঘুরে তিন মাসের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তখন অন্য পাঁচজন বন্ধু এগিয়ে এসে অর্থসাহায্য করে সঙ্কলনটির মুদ্রিতরূপ ঘটাতে আনুকূল্য করেন। ফলে চারমাসের মধ্যে প্রকাশ পায় সঙ্কলনটির মুদ্রিত চেহারা। তবে পরিবর্ধিতভাবে আরও নতুন দশজনের কবিতা সমাহারে....'।

এই সঙ্কলনের কবিদের অনেকে এখন জীবিত নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

হঠাৎ মগজে নব-সংস্করণের ঢেউ? জিজ্ঞাসার সু-জবাব এখানেই মুদ্রিত। ২০০৩ সালের ৭ই মে দিল্লিতে প্রয়াত হন শিশিরকুমার দাস। তার মাসখানেক আগে উড়ে আসে এক চিঠি সুধীর চক্রবর্তীর কাছে, 'অমৃত যন্ত্রণা'র পাণ্ডুলিপিটা গেল কোথায়: ছাপা কপি নিশ্চয়ই তোর কাছে আছে। ওটা আবার ছাপলে কেমন হয়?' এহেন আকাঙ্ক্ষা জাগল কেন তাঁর? আকুল হন সঙ্কলন সম্পাদক। তারও মনের কোণে এত জিজ্ঞাসা, এত আকুলতা কেন শিশিরের? এ চিঠির মাসখানেক পরেই 'অমৃত যন্ত্রণা'র অন্যতম হোতা শিশিরকুমার চলে যান। সুধীর চক্রবর্তীর কাছে একটা কপিও এখন নেই। অপ্রত্যাশিত খবর আনলেন কৃষ্ণনগরের সত্যেন মণ্ডল। পরম বন্ধু। তাঁর কাছে বইটা আছে।

এ সঙ্কলনে ৩১-৬৩ পাতা শুধুই স্মৃতির আকর। ভালবাসার পঙ্‌ক্তি আর স্মৃতিমেদুর আলোকচিত্র। সময়টা, পরিবেশটা, আন্তরিকতা ধরা পড়েছে অনায়াসে। প্রথম হাতে-লেখা সংস্করণের ফটোকপি এবং প্রথম সংস্করণের হুবহু মুদ্রণ। মমতামেদুর স্মৃতিচর্চায় ডুবেছেন সুধীর চক্রবর্তী। 'ফটিকজল'-এর এ হেন উজ্জ্বল উদ্ধার এ প্রজন্মের কবি, লেখক, সম্পাদকদের উৎসাহিত করুক। চেতনায় একটু ঘা দিক। এখন তো অনেকেই ডজনখানেক লেখালেখির পর নাম বেঁকিয়ে হাতে লেখা পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা (তাও কমে আসছে) সম্পর্কে রায় দেন, আঁকাবাঁকা লেখায় মন ভরে না। পোস্টার টোস্টার মনে হয়। ওদের একবার জোরসে ধাক্কা দিক 'অমৃত যন্ত্রণা'-র অন্দর উপাখ্যান। এ সঙ্কলনের নয়া প্রচ্ছদ সোমনাথ ঘোষের।

'বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় যাঁরা নিজেদের মেলাতে চান'—উৎসর্গপত্রের শব্দগুলিও পড়ুন।

গণশক্তি

৩০ মে ২০০৪

ঋ. ১. ৩. আলোচক : কুমারেশ চক্রবর্তী

১৩৬৩ সালে প্রথম (ছাপায়) প্রকাশিত অমৃত-যন্ত্রণা নামক কবিতা সংকলনের সম্পাদক ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ গত বছরের শেষে বেরিয়েছিল। এখনও, অর্থাৎ সাতচল্লিশ বছর পরেও, সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী। এখন কেন পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো, তার একটা সংক্ষিপ্ত জবাব সম্পাদক নিজেই দিয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পণ্ডিত-অধ্যাপক-কবি শিশিরকুমার দাশ মৃত্যুর একমাস আগে বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'ওটা আবার ছাপলে কেমন হয়?' এবং শিশিরকুমার দাশের প্রয়াণের কিছুকাল পরে বইটির পাণ্ডুলিপি ও প্রথম মুদ্রিতরূপ দুটোই পাওয়া গেল। "অনেকটা যেন শিশিরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই বা তার অন্তিম ইচ্ছার ফলিতরূপ দিতেই বর্তমান পুনর্মুদ্রণ।"

আঠারো জন কবির চব্বিশটি কবিতা, সবগুলোই পঞ্চাশের দশকে লেখা। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও প্রণব ঘোষ ছাড়া বাকী সকলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫-৫৭তে এম এ পড়তেন। অমৃত-যন্ত্রণা আসলে প্রেমেরই যন্ত্রণা এবং সম্পাদক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এগুলো সব প্রেমের কবিতা। হয়তো সেটাই কবিতাগুলোর একধরনের ঐক্যের সূত্র।

একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে। কোনো কবিতায় একটি বিশেষ নারীকে সনাক্ত করা যায় না। এবং কোনোটাতেই বিশেষ স্থান-কালে বাঁধা নারীর রূপের বর্ণনা, প্রেমের আবেগের কোনো পরম মুহূর্ত, বা দুই মানুষের সম্পর্ক প্রাণিত আদানপ্রদানের ছবি উপস্থিত করা হয়নি।

অথচ নানাভাবে, প্রায় সবকটি কবিতাই ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা। একটি বিশেষ অর্থে ব্যক্তিগত। নারী এবং প্রভৃতি ছাড়া জীবনের অন্য কিছু এই ব্যক্তিগত ভাবজগতে প্রবেশ করেনি। তা থেকে কবিদের মানসিক কোনো বৈশিষ্ট্য কিম্বা তাঁদের চিন্তা বা আবেগের গঠনের কোনো প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। অথচ, ইতিহাসের দিক থেকে প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। অমৃত-যন্ত্রণা নিয়ে প্রমথ নাথ বিশীর লেখা দীর্ঘ আলোচনায় কিন্তু প্রসঙ্গটা তখনই উঠেছিল। প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন—

"গত ২৫/৩০ বছর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বা সাম্প্রতিক কাব্য নামে যে কুজঝটিকা জমিয়া উঠিতেছিল নবীন কবিগণ অনেকাংশে সেই অকাব্যের কুহেলিকা হইতে মুক্ত। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইঁহাদের কাব্যের মৌলিক প্রেরণা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা, সমাজ ও সংসার মানুষের চারিদিকে যে দুর্মোচ্য জাল বুনিয়া তুলিতেছিল তাহার কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়াস; কোনও রাজনৈতিক মতবাদ বা কোনও আলংকারিক প্যাটার্ন বা ছাঁচের কৃত্রিম প্রেরণা এইসব কাব্যকে উদ্‌বোধিত করে নাই।"

চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকের সাহিত্য, ও সমালোচনার সঙ্গে যাঁদের অল্প-সল্প পরিচয়ও আছে, তাঁদের কাছে এই মূল্যায়নের স্বভাব বা নিহিত সাহিত্য-চিন্তা খুব নতুন লাগবে না। কবিতা বা সাহিত্য নিতান্তই স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্তর-প্রেরণার সৃষ্টি না হলে, শুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়। সমাজ বা সামাজিক সম্পর্কের ছায়াপাত একেবারেই হওয়া উচিত নয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় এইরকম চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে আছে।

সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তীর চিন্তা যে অন্যরকম তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন, এই তরুণ কবিদের কবিতায় তরুণ প্রেমে দেহ-মনের যে উল্লাস অনুভূত হয় 'তার অভাব আছে। কারণ কী?' বিশীমশাই প্রশ্ন করেছিলেন, "যুগচিন্তার ভাবে তারুণ্য স্বধর্ম হারাইয়াছে— ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে?" সুধীর চক্রবর্তী বলছেন, তাঁদের কবিতায় প্রাপ্তির চেয়ে আশঙ্কা অধিকতর সত্য ছিল। তার প্রধান কারণ "যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-হতাশা-গ্লানি-শিকড়চ্যুত হবার অপার মানবিক দুঃস্বপ্ন"। তাঁদের কবিতা প্রমথনাথ বিশীর এত ভালো লাগল, সেটা সুধীর চক্রবর্তীর বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে, "তবে কি আমাদের প্রয়াসে কোনও সাহিত্য-দর্শকের

প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতের চেহারাটা সুধীর চক্রবর্তীর বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে, "তবে কি আমাদের প্রয়াসে কোনও সাহিত্য-দর্শকের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতের চেহারাটা সুধীর চক্রবর্তী নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন।

শিশিরকুমার দাসের এক বছর পর আমি এবং দু-একজন কবি-লেখক যাঁদের উল্লেখ বইটিতে আছে — বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিলাম। সুধীর চক্রবর্তীকে জানতাম। পরে তাঁর লেখা কিছু কিছু পড়েছি, সব মিলিয়ে তাঁর আন্তরিকতা এবং বিশ্লেষণ - ক্ষমতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে। এই কবিতা সংকলনের প্রকাশনের ব্যবস্থা করেছেন সেটাও আমি উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় বলে মনে করি।

এসব কথা বলছি যাতে পাঠক না মনে করেন যে প্রকাশন-প্রয়াস বা সম্পাদকীয় রচনার মূল্য অস্বীকার করার কোনো চেষ্টা এই লেখায় আছে। তার চেয়েও বড়ো কথা। আর একটা ইতিহাস বা আরো সম্পূর্ণ কোনো ইতিহাসের চিহ্ন পথের নির্দেশ করার ক্ষমতা সুধীর চক্রবর্তীর আছে। সেজনই অতি সংক্ষেপে ইতিহাসের না-বলা অংশটার ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছি।

ছাত্র ফেডারেশন নামক একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন ছিল পঞ্চাশের দশকে। পরেও ছিল, যদিও ষাটের দশকের মাঝামাঝির পর তা ভাগ হয়ে যায়। এই সংগঠনের কিছু সক্রিয় সদস্য কমিউনিষ্ট পার্টিরও সদস্য ছিলেন। ফেডারেশন, পার্টি, বা সদস্যদের ভালো মন্দ দোষ গুণ যাই থাকুক না কেন, আন্তরিকতা, বিশ্বাস এবং অন্ততঃ খানিকটা সচেতনতার অভাব ছিল না। পক্ষপাত তো থাকবেই, সবারই থাকে। এবং সেটা সাহিত্য-কবিতা নিয়ে বা তার স্বরূপ নিয়েও ছিল। কেউ কেউ যে পক্ষপাতটাকেই বড়ো করে জাহির করতেন, কিম্বা মতবাদের আসল অর্থ-কাঠামো পুরো না-বুঝে না-বুঝে না-জেনে বাছ-বিচার করতেন, তাও অসত্য জয়।

আবার, তাঁদের অনেকেই ভালো গল্প-কবিতা-নাটক-গান লিখতেন। দু-একজন পরে খুবই মূল্যবান যুক্তি-বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন, বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে। যে জ্ঞান-লোলুপতার কথা অমিয় বাগচী বলেছেন, তা এঁদেরও দু-চারজনের ব্যাপারে কম সত্য নয়।

এঁরই কেউ কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনে, আন্দোলনের সংগঠনে বা নির্বাচনে সক্রিয় ছিলেন। তেভাগা আন্দোলন থেকে মন্বন্তর, যুদ্ধ, দেশভাগ, সাম্প্রতিক সংঘাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার, এক-পয়সা-ট্রামভাড়া-বাড়ানোর বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন, ইত্যাদি, সবই এঁদের অভিজ্ঞতায় ছিল। এবং সুধীর চক্রবর্তী যে "অপার মানবিক দুঃস্বপ্নের" কথা বলেছেন, তাঁদেরকেও সেটা নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছিল। কেবল, একটা তফাত ছিল। মার্কসবাদ এঁদের মধ্যে একটা বিকল্পের সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। তার ভিত্তিতে আবেগ, স্বপ্নপ্রেম, বোঝা-না-বোঝার নানা মিশ্রণ, ইত্যাদি সবই ছিল। কিন্তু, কোনো নতুন দর্শনে দীক্ষা বা তার প্রতি আনুগত্য কি এসব ছাড়া হতে পারে? অথবা, কোনো কালে যদি এইরকম মতবাদ বা মতানুগত্য সমাজ-প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, তবে তা বাদ দিয়ে কি সেই কালের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে? বিশেষভাবে,

যদি বহুমানুষের মধ্যে জীবনের ও বেঁচে থাকার খাতিরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তা বিশ্বাসের প্রেরণা জুগিয়ে থাকে?

সুধীর চক্রবর্তী অবশ্য ইতিহাস লিখতে বসেননি। 'অমৃত-যন্ত্রণা'র কবিগোষ্ঠীকে তাঁর স্মৃতির ওপর নির্ভর করে, কবিতা ও কবিদের কথা লিখেছেন। পাঠকের কিন্তু ভুল হতে পারে। উনিশশো ষাটের, সত্তরের বা আশির দশকে জন্ম হয়েছিল এমন পাঠকের মনে হতে পারে এটাই পঞ্চাশের দশকের কবিতার ও কবিদের ইতিহাস। সেজন্যই, আমি ইতিহাসের অন্য দিকটা উল্লেখ করলাম। সুধীর চক্রবর্তী যদি দুটো দিক নিয়ে লেখেন, আমার মত পাঠক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

শেষ করার আগে বলি 'অমৃত-যন্ত্রণা'র প্রকাশক কলকাতার ফটিকজল। দাম পঞ্চাশ টাকা। শিশিরকুমার দাশের অপ্রকাশিত রচনা এতে আছে। তবে হস্তলিপির ফটোকপি পড়তে চোখে লাগে। সব মিলিয়ে, বইটা কিনে পড়লে, পাঠক বুঝতে পারবেন। ভালোই করেছেন।

দিগঙ্গন
জুলাই-আগস্ট ২০০৪

ঝ. ২ আধুনিক বাংলা গান

ঝ. ২. ১ আলোচক : **উৎপল চক্রবর্তী**

যখন বঙ্গ সংস্কৃতির ভুবনের দিকে আমরা চোখ রাখি, তখন চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, গানই হলো এ সংস্কৃতির প্রথম আদি সেই শক্তি যা চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শ করে আজও স্পন্দিত, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে বিচিত্র পর্বে বিচিত্ররূপে সক্রিয়। এমন একটি পর্বের নাম আধুনিক বাংলা গান।

সুধীর চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা গান' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ থেকে গৌরীপ্রসন্ন পর্যন্ত গীতকারদের গানের 'একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন' 'শিক্ষিত বাঙালি ও শিষ্ট সমাজের হাতে তুলে দেবার' ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। উদ্যোগটি গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী—সম্পাদক অশিক্ষিত রসিকজনেরও ধন্যবাদের পাত্র হবেন। 'সংকলন প্রসঙ্গে আত্মপক্ষ' এবং 'প্রস্তাবনা' অংশে এই গান সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন, যা শিল্পের এই বিশেষ শাখাটির পরিচয় নির্ণায়ক, কিন্তু তাঁর মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত সর্বথা তর্কাতীত নয়। কিছু অর্ধসত্য উক্তিও আছে, যেমন, 'এ জাতীয় গানের কোন উন্নতমানের সংকলন আগে হয়নি'। সম্ভবত তাঁর জানা নেই, সত্তর দশকে 'শস্য' নামে একটি পত্রিকায় প্রথম এগান নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক ও কবি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সেখানে প্রায় আড়াইশো আধুনিক গানের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়—যেগুলি কবিতা ও সুরের সমন্বয়ে যথার্থই কাব্যসঙ্গীত এবং আজও কর্ণসুখকর। তাঁর এ সিদ্ধান্ত অবশ্য মান্য—রবীন্দ্রনাথ আধুনিক গানের জনক। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ থেকে আজকের গান পর্যন্ত যে প্রবাহ তাতে চলচ্ছবি নেই' এবং 'আধুনিক বাংলা গানের অগ্রগতিরও একটা ইতিহাস আছে'—উক্তি দুটি স্ববিরোধী এবং বিতর্ক উদ্রেকী কি নয়? আধুনিক চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প বা সাহিত্যের ধারাবাহিক উত্তরণের পাশাপাশি আধুনিক গানের স্থবিরতায় তাঁর মতো আমরাও ব্যথিত, উদ্বিগ্ন, কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে এই গানের মান একদা চূড়া স্পর্শ করেছিল, জনপ্রিয়তায় ছিল শীর্ষস্থানীয় এবং দু-একজন ব্যতিক্রমী স্রষ্টার কাজ ছাড়া আজ বাংলা চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প বা সাহিত্যে কি যথেষ্ট উন্নতমানের? অবনতি ঘটেছে কি শুধু আধুনিক গানেরই? আবার যখন কবিদের গীত রচনা প্রসঙ্গে শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ বা নিশিকান্তর নামোল্লেখ করেন তখন কুমুদরঞ্জন, আনন্দ বাগচী, গোবিন্দ চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র বা কবিতা সিংহের অনুল্লেখ মন্তব্যের অসম্পূর্ণতা প্রকট করে—একই কারণে জগন্ময় মিত্র বা সুধীন দাশগুপ্ত বা নচিকেতার নামের অনুপস্থিতি আলোচনায় সম্পূর্ণতা আনে না। সংকলিত সঙ্গীতগুলির আসরে বহু যথার্থ কাব্যসঙ্গীতের অভাব অতৃপ্তি আনে। একই অতৃপ্তি শৈলেন রায় বা প্রণব রায়-এর বহু বিখ্যাত গান সংকলিত না হওয়ায়, গৌরীপ্রসন্ন 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু বাদ যাওয়ায় এবং সর্বোপরি সলিল চৌধুরির 'সেই মেয়ে' অন্তর্ভুক্ত না হওয়া—যে গান রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি'র আধুনিক রূপ—আধুনিক গানেরও এক নবদিগন্তের

আভাসব্যঞ্জক। সংকলনটি তাই 'নির্ভরযোগ্য' বলতে দ্বিধা জাগে বৈকি।

তবু সম্পাদককে অশেষ ধন্যবাদ এই সংকলন গ্রন্থের জন্য। বিশেষ করে এই মুহূর্তে খুবই জরুরি ছিল এই গ্রন্থটি এই কারণে যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের উন্নাসিকতা যখন এ গানকে শিল্পমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত, তখন সেটা যে তাঁদের বুদ্ধির ক্ষীণতা এটা প্রমাণ করার জন্যও। বঙ্গ সংস্কৃতির ভুবনে এ গানেরও যে অবদান আছে এ সত্য অস্বীকার করা সংস্কৃতমনের পরিচায়ক নয়। সম্পাদকের সঙ্গে আমরাও একমত, 'কোন উন্নতমানের পত্রপত্রিকায় নবীন গীতকারদের গান প্রকাশের আহ্বান নেই'। এটা অবিলম্বে প্রয়োজন। নইলে একটি বিখ্যাত আধুনিক গানের বাণী সত্য হয়ে উঠবে—'শুধু অবহেলা দিয়ে বিদায় করেছ যারে'। সম্পাদক ও প্রকাশককে পুনর্বার ধন্যবাদ বাঙালি মাত্রের সংগ্রহযোগ্য এই সংকলন গ্রন্থটির জন্য।

দেশ

ঝ. ৩. বাংলা দেহতত্ত্বের গান

ঝ. ৩. ১. আলোচক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার

দেহের রহস্য বা পারমার্থিকতার অনুসন্ধানই দেহতত্ত্বের গানের মূল উপজীব্য। দেহের স্বরূপ, শারীরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান, শরীরের অনিত্য-বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা দেহতত্ত্বের গান প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা নিতান্ত আভিধানিক। কোনো তত্ত্ব কিংবা দার্শনিক কোনো মতবাদ অভিধান-নির্ভরতার ধার ধারে না। তত্ত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নতুন ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়। যে তত্ত্বে সহজে এসে যায় ক্ষেত্র আর বীজের রূপক, তা কী অত সহজে অনুভব করা যায়। মানব জমিনের অনাবাদী পরিণামের ইঙ্গিত যেসব গানের রয়েছে তার আন্তরিক হদিস পাওয়া কষ্টসাধ্য। আর এই কষ্টসাধ্য পথের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন শ্রীসুধীর চক্রবর্তী এবং নিঃসংকোচে বলা যায় দীর্ঘদিন গৌণধর্মের অনুসন্ধানে ব্রতী গবেষক শ্রীচক্রবর্তী এক অনন্য সাফল্যে দেহতত্ত্বের গূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ কাজে শুধু মনন নয়, প্রয়োজন হৃদয়ের ছোঁয়া ও লোকজীবনের প্রতি আন্তরিকতা।

প্রচলিত ধারণা রয়েছে, বাংলার বাউল এবং ফকিরি গানই দেহতত্ত্বের গান। এ ধারণা ভ্রান্ত। লালন, গগন হরকরা, পাগলা কানাই প্রমুখের গানে অবশ্যই দেহতত্ত্বের গানের আধিক্য রয়েছে। কিন্তু এই দুই পন্থীর বাইরেও যে কত সাধক কবি-গীতিকার দেহতত্ত্বের গান বেঁধেছেন তার পরিধি বড় ছোট নয়। এঁদের প্রত্যেকের গানেই ধ্বনিত হয়েছে অভিনব এক গুহ্যসাধন জগতের সংকেত। আসলে দেহতত্ত্বের গান রচিত হয়ে আসছে সেই চর্যাপদের কাল থেকে অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথম পর্ব থেকেই। অবশ্য এই সংকলনে অত পুরনো কালের গান দেওয়া হয়নি, কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাসগত আলোচনা আছে। তিন শত গান সংকলিত হয়েছে, যার কাব্যগত উৎকর্ষ বিস্ময়কর। হাজার হাজার গানের মধ্যে থেকে এই তিন শত গান বাছাই করা কতটা পরিশ্রমসাধ্য তা যোগ্য সম্পাদক মাত্রই জানেন। শ্রীচক্রবর্তীর সম্পাদনার দক্ষতা নিঃসন্দেহে অনুকরণের যোগ্য। তিনি শুধু চিরায়ত গানের সংকলনই করেননি, দেহতত্ত্বের গানের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং দার্শনিক ভিত্তিকে সতর্কভাবে বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করেছেন।

দেহতত্ত্বের গানে প্রতীক-উপমার ছড়াছড়ি। সহজ শব্দের অন্তরালে থাকে গূঢ় ইঙ্গিত, গুরু শিষ্যকে বুঝিয়ে না দিলে সে তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাই প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই। যতক্ষণ এই গুহ্য অর্থ জানা না যাবে ততক্ষণ গানটিকে হেঁয়ালি বলে মনে হয়। কিন্তু গূঢ়ার্থ জানার পরে এক ধরনের স্বস্তি পাওয়া যায় এবং গীতিকারের উদ্দেশ্যও জানা যায়,—যেমন চর্যাপদের 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খায়,'—গাছের তেঁতুল কুমিরে খাচ্ছে। কোনো অর্থই হয় না, —কিন্তু যখন প্রতীক ভেঙে জানা যায়, গাছ অর্থাৎ বোধিচিত্ত, বোধিচিত্ত মানে শুক্ররস— তাকেই বলা হয়েছে গাছের

তেঁতুল, সেই তেঁতুল খাচ্ছে কাম নামে কুমির। সাধক-কবি বলতে চান, নারীদেহের নদীর ঘাটে কামনা-কুমির হঠাৎ এসে কতদিন ধরে সে পুরুষের সারবস্তু হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সিদ্ধদের রচিত চর্যাগীতি থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সহজিয়া বৈষ্ণবদের গান, যোগী সম্প্রদায়ের গান, কবিগান, মাইজ-ভাণ্ডারি, ঝুমুর, ফকিরি, শাক্তগানে দেহসাধনার কথা স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে দেহসংকেত পাওয়া যায় বাউল, মুর্শিদা, মারফতি, কর্তাভজা, সাহেবধনী ও বলরামী লৌকিক বাংলা গানে। এসব কথা অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস ও ধর্মীয় দর্শনের পরম্পরাকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করে দেহতত্ত্বের গানগুলিকে আলাদাভাবে শনাক্ত করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন শ্রীচক্রবর্তী, সেই সঙ্গে তার স্বরূপলক্ষণ ও বৈচিত্র্য-নির্ণয় অর্থাৎ থিমেটিক বিশ্লেষণও করেছেন অনন্য দক্ষতায়। বাংলা দেহতত্ত্বের গান বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলিত গ্রন্থ বাঙালি পাঠককে উপহার দেওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

দেহতত্ত্বের গানকে চিহ্নিত করা বড় সহজ নয়। সম্পাদক জানিয়েছেন, কেবল দেহসংক্রান্ত শব্দাবলি যেসব গানে আছে সেগুলিকেই একমাত্র দেহতত্ত্বের গান বলে চিহ্নিত করেছেন। সঠিক সিদ্ধান্ত। একটা পদ্ধতি তো মেনে চলতেই হবে।

বাংলা দেহতত্ত্বের গানের বিষয়বস্তু ও ধর্মীয়-দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ে 'আত্মপক্ষ' অংশে শ্রীচক্রবর্তী বিস্তৃত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। সেই আলোচনার সূত্রে কিছু কথা বলা প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। পাঠককে উদ্দীপিত করা যাবে।

নারীদেহ ও নারীসংসর্গ বিষয়ে দেহতত্ত্বের গানে এক ধরনের ভাবনা বারবার ঘুরে এসেছে। সাধক-কবিগণ এর ভিত্তিতে একটি দার্শনিক তত্ত্বও উপস্থাপিত করেছেন। নারীর প্রতি আসক্তি কিংবা নারীসঙ্গম সমস্ত সাধনার অন্তরায় হিসেবে দেখা হয়। জীবনে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনকেও সহজ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। নারীদেহের 'ঘাটে' স্নান করলে 'বিদ্যে বুদ্ধি রয় না ঘটে', কামনারূপ কুমির 'চিবিয়ে চুষে খায়' পুরুষকে। আবার একই সঙ্গে দেহতত্ত্বের গানে মাতৃকাশক্তির প্রাধান্য, আলাদাভাবে দেখা যায়।'তরবি যদি ভবসাগর, নারীসঙ্গ কর।' কিন্তু কামনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হয় সাধককে। বাস্তব জীবনের নানা প্রতিকূলতা রয়েছে, সাধনার মাধ্যমে মানসিক সংযমের দ্বারা তাকে জয় করতে হবে। আসলে নারী-নারীদেহ-নারীসঙ্গম-কামনার যেসব কথা দেহতত্ত্বের গানে রয়েছে তার আদি উৎস রয়েছে আমাদের বিবর্তিত লৌকিক ও গ্রামীণ লোকসমাজের বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মধ্যে। জমির ফসল, মানবী দেহ ও স্ত্রী-পশুর উৎপাদনশীলতা এই ভাবনার উৎসভূমি। তাই দেহাত্মবাদীদের গানে শুধুমাত্র প্রজনন নয়, প্রজননের নিরোধও অন্যতম লক্ষ্য। সহজভাবে বললে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, 'কায়াসাধনার মধ্যে দিয়ে পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌনতার নিয়ন্ত্রণ একটা সাধনা এবং সেই সাধনার লক্ষ্যে নারীই প্রকৃত সঙ্গী'। কিন্তু কীভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব? সে পথ দেখাতে পারেন একমাত্র গুরু।

আমাদের দেশের গৌণ ধর্মগুলি অধিকাংশই গুরুনির্ভর। গুরু যেন প্রায় ঈশ্বর। শিষ্য

যেন ব্যক্তিত্বহীন এক জড় ভক্ত, তার অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র গুরু। এখানে গুরু শুধুমাত্র শিক্ষক নন, তিনিই সব, তাঁর অনুকম্পা ছাড়া শিষ্যের কোনো গতি নেই। তিনি যেভাবে চালনা করবেন, বিনা প্রশ্নে দ্বিধাহীনভাবে তাই মেনে নিতে হবে। গুরুর উপদেশ ও নির্দেশে শিষ্য ধাপে ধাপে সাধনার স্তরগুলি অতিক্রম করে চলে। শেষে শিষ্যের আসে 'সিদ্ধ' অবস্থা। এই স্তরে ঘটে 'নারীসঙ্গিনীর সঙ্গে কায়াসাধনার শরীরী অভিজ্ঞতা'। এই 'রূপাশ্রয়' ঘটাতে পারেন একমাত্র সদ্‌গুরু। দেহতত্ত্বের গানে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছে তাঁরা অর্থাৎ লালন ফকির, কুবির গোঁসাই, লালশশী, যাদুবিন্দু, পাঞ্জু শাহ প্রমুখ এই সিদ্ধ-স্তরে পৌঁছেই দেহতত্ত্বের গান লিখেছেন। শিষ্যের লক্ষ্য সাধনার স্তরগুলি অতিক্রম করা, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো পুথি কিংবা লিখিত শাস্ত্র তাকে সাহায্য করবে না, গুরুর মৌখিক উপদেশ ও জীবনচর্যার নির্দেশেই তাকে চলতে হবে। তাই গুরুই তার সার। গুরু এখানে শিষ্যের সর্বকর্মের নিয়ন্তা। শিষ্য ঘুমোলেও গুরু জেগে থাকেন। তাঁকে অকপটে ভালবাসো।

দেহাত্মবাদীরা জীবন ও সংসারের অনিত্যতা নিয়ে সর্বদাই ভাবিত। এ দেহ-খাঁচা কাঁচা বাঁশে তৈরি, যে কোনোদিন খাঁচা পড়বে খসে, তাই মন যেন খাঁচার আশে' না থাকে। মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর, তাই বস্তুতে যে ঈশ্বর খোঁজে সে ভবযন্ত্রণা থেকে চিরতরে মুক্তি পাবে। আর এই অনিত্য সংসারে অনুমাননির্ভরতার কোনো স্থান নেই, শাস্ত্র মন্ত্র পূজাবিধি ধর্মাচার দেবমূর্তি সবই অসত্য অপ্রয়োজনীয়, এসব পরিরত্যাগ করে খুঁজতে হবে 'মানুষ খোদা'কে। সকল জীবনের সেরা যে মানবজীবন তার সঠিক আবাদ করে সোনার ফসল তুলতে হবে। নশ্বর জীবন ও মানুষের দেহগত কামনা-মোহ—এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিকতা দেহতত্ত্বের গানে প্রকট হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমায় পার করো,— এই পার করোর আকাঙ্ক্ষা দেহের অনিত্য-চিন্তা থেকেই এসেছে। পরের জায়গা ও পরের জমিতে আমি ঘর বানিযে রয়েছি, আমি তাই সেই ঘরের মালিক নই। শূন্যের মাঝারে ঘর বানিয়ে বাস করছি, সে ঘর আমার ভাল নয়।

মাতৃগর্ভে সন্তানের আবির্ভাব ও বেড়ে ওঠা দেহাত্মবাদীদের ভাবিত করেছে এবং সেই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে দেহতত্ত্বের গানে। শুক্র ও রজের 'অভূতপূর্ব সাক্ষাতে' ভ্রূণের জন্ম এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু নারীগর্ভে সন্তান মাসে মাসে কীভাবে বৃদ্ধি পায় তার ধারণা এই লৌকিক ভাবনায় বিজ্ঞানসম্মত নয়, পুরোপুরি অনুমিত কিংবা কাল্পনিক। এক গানে বলা হয়েছে, 'প্রথম মাসে মাংসশোনিতময়',— তারপর প্রতিমাসের বিবর্তন বর্ণনা করে শেষে বলা হয়েছে 'নয় মাসে দশ ইন্দ্রিয় না রহে গর্ভধামে।' মাসের এই বিবরণের বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য শুধুমাত্র ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানভিত্তিক কোন তথ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। কিন্তু দেহতত্ত্বের গানে এই ধারণার প্রাধান্য রয়েছে, কেননা জীবনের উৎস খোঁজা এই ধর্মীয় দর্শনের গোড়ার কথা। এ বিষয়ে চমকপ্রদ ভ্রান্ত তথ্য হল, মাতৃগর্ভে 'ছয় মাসেতে ষড়রিপু বসিল স্থানে স্থানে', অর্থাৎ মাতৃজঠরের ছয় মাসের সন্তানের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য নামক ষড়রিপুর উদ্ভব ঘটে। এর চেয়ে হাস্যকর মন্তব্য খুব কমই আছে। তবু বিশ্বাস বিশ্বাসই,

যুক্তি ও বাস্তব তথ্য দিয়ে বিশ্বাসের ভিত্তিকে টলানো যায় না।

এত সব দার্শনিক কথা বলা হয়েছে একটিমাত্র কারণে। দেহতত্ত্বের গানের মূল কথা হল, তাঁর সাধনা করো, তাঁর সাধনা করলে সমস্ত কিছুই জানা যাবে আর সাধনার পরিণতি ঘটবে কীভাবে? 'হবে না আর আনাগোনা এ ভব-সংসারে সংকটে'। এটাই সারকথা। সাধনার দ্বারা বিন্দুপাতনের অনিবার্যতা নিবারিত করে সাধক মুক্তিলাভ করবেন, তাঁর সন্তাননিরোধ অবশ্যকৃত্য এই সাধনায়। বড় বিস্ময় লাগে,—নারীর সঙ্গে দেহ-সম্পর্ক স্থাপন করব, স্ত্রী হিসেবে সাধনপথে নারীকে মর্যাদা দেব অথচ নারীকে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করব। এ বোধহয় খুব সুস্থ চিন্তা নয়। অবশ্য ধর্মীয় ভাবনায় যেমন বিজ্ঞাননির্ভর মানসিকতা থাকে না, অনেক কুসংস্কার, ক্ষুদ্রতা ও হীনতা প্রশ্রয় পায়, তেমনি এক ধরনের বিকৃত মানসিকতারও উৎসার ঘটে। এইসব গানের দর্শনেও তার হদিস মিলবে।

যাঁরা হিন্দু শাস্ত্রীয় নির্দেশ, ইসলামি শরিয়তের বিধান অস্বীকার করেছেন, যাঁরা মন্দির-মসজিদ-পূজাচার-বর্ণভেদ-জাতিভেদ-মূর্তিকে উপেক্ষা করে মানুষকেই ভজনার সার করেছেন তাঁরা নমস্য। পুরোহিত-মোল্লা-ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা এক উজ্জ্বল প্রতিবাদের প্রতীক। অথচ আর এক ধরনের আচারের দাসত্ব করে তাঁরাও সংস্কারের জালে গোষ্ঠীবদ্ধ বিচ্ছিন্ন জীবনকে বেছে নিলেন বড় মর্মান্তিক পরিণতি একটি প্রতিবাদী দর্শনের।

আমরা শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম বিষয়ে কিছু কিছু খোঁজখবর রাখি। কিন্তু বাংলায় যে গৌণধর্মগুলি রয়েছে তার সম্পর্কে আমরা প্রায় অজ্ঞ। আর শুধু অজ্ঞ নয়, উপেক্ষাও রয়েছে। দীর্ঘ তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে শ্রীসুধীর চক্রবর্তী বলাহাড়ি-সাহেবধনী ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে যে অনুপুঙ্খ অন্বেষণ করে চলেছেন তাতে তাঁর গবেষক মানসিকতা ও হাটবাটের মানুষজনের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে লোকায়ত মানসের ধর্মীয় ভাবনার সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মানুষ হলেন শ্রীচক্রবর্তী। দেহতত্ত্বের গানের সংকলনের মাধ্যমে তিনি আবার প্রমাণ করলেন এবিষয়ে অধিকারীর ভূমিকা নেওয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। হাজার হাজার দেহতত্ত্বের গানের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যে তিনশত গান তিনি সংকলন করেছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট সংকলন বোধহয় সম্ভব নয়। দেহাত্মবাদীদের বিষয়ে যেসব ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা বলেছি, তার সবকিছুই তিনি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। যাঁরা দেহতত্ত্বের গানের প্রতীক-উৎপ্রেক্ষা-উপমা জানতে চান না, শুধুমাত্র এইসব গানের কাব্যিক মহিমা উপলব্ধি করে পুলকিত হবেন তাঁদের মনের খোরাকের সন্ধানও দিয়েছেন সম্পাদক। এইসব গানে যে ব্যঞ্জনাগর্ভ কবিত্ব, মেটাফিজিক্যাল চিত্রকল্প ও ভাবাত্মক দ্যোতনা রয়েছে তার হদিসও দিয়েছেন শ্রীচক্রবর্তী। তিনি বলেছেন এবং সঠিকভাবেই বলেছেন, দেহতত্ত্বের গানের ভাবনায় অভিনবত্ব সর্বাধুনিক মনকেও চমকে দেয়। কীভাবে চমকে দেয়? নারী তাঁর নিজের দেহের অনুষঙ্গী অতিপ্রিয় বসনভূষণ, প্রসাধন, অলংকারের সঙ্গে গৌরচন্দ্রকে একীভূত করে ফেলেন। আশ্চর্য গীতিময়তা।

এই সংকলনের গানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনে হয় সম্পাদক দুটি বিষয়ে নজর দিয়েছেন। দেহতত্ত্বের সব গানেই দেহাত্মবাদীদের দর্শনের পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যেসব গানে মাটির ও মানুষের পরিচয় রয়েছে এবং যেসব গানে মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলিই অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাই গানগুলির নির্বাচনও অন্য মাত্রা পেয়েছে, নিছক প্রথাগত দেহতত্ত্বের গানের সংকলন হয়ে ওঠেনি।

সংকলনটির মধ্যে একদিকে বাংলা সংগীতের বৈভবে ও অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের দ্যুতিতে পাঠক সমৃদ্ধ হবেন। বাংলা লোকসংগীত ও দেহতত্ত্বের গানের এই সংকলন অনন্য আকর-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। শ্রমসাধ্য এই কাজের জন্য শ্রীচক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানাই।

বঙ্গদর্শন-২

ফেব্রুয়ারি ২০০১

ঝ. ৪ জনপদাবলি

ঝ. ৪. ১. আলোচক : হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপান্তর সময়ের স্বভাব। এবং সময়, জগতের চতুর্থ মাত্রা। তাই রূপান্তরিত কালের মাত্রায় আরো অনেক কিছুর মতন পৃথিবীর রূপ যে খানিকটা বদলে যাবে, তা তো জানাই ছিল। কিন্তু বিগত শতকের সাঁঝবেলা থেকে সেই পরিবর্তন এত তাড়াতাড়ি এত অবধারিত তীব্রতায় এত অপ্রত্যাশিত কোণে ছড়িয়ে যাবে, আর এতটা ঘুলিয়ে দেবে আমাদের সাবেক ইতিহাস ভূগোলের বোধ—এমনটা বোধ হয় আন্দাজ করতে পারি নি আমরা। আমরা কেউ। স্কাইক্র্যাপারের ছায়ায় দাঁড়ানো একরত্তি প্রাণের মতোই বিপন্ন বিস্ময়ে জেনেছি, আমাদের দাঁড়াবার জায়গা আগের মতন অগাধ নেই আর। সব কিছু কেমন গুটিয়ে যাচ্ছে যেন, প্রসারিত পৃথিবীর বিরাট ধারণা যেন সুপাররসনিক বেগে উলটেপালটে বিশ্বগ্রামের নামের ছোট্ট ছাদনাতালায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। তারপর, আরো ঢের ঘোর লাগা সমৃদ্ধির বৈজয়ন্তীর পর, প্রকৃত কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতায় ম্যাজিকের মতোই গোটা পৃথিবী যেন ক্রমশ ছোট হতে হতে আরো ছোট হতে হতে গোলমরিচের মাপ ও আকার পেয়ে গেল— কালো, কঞ্চিত, করতলগত। মাল্টিমিডিয়া আর মাল্টিন্যাশনাল বিরাট শিশুগণ—আমরা জানলাম—'খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে।' তালুবন্দী এই গোলমরিচের তত্ত্বনাম বিশ্বায়ন। বোঝানো চলেছে, সভ্যতার এই যে ঝাল স্বাদ— এই শাশ্বত। পৃথিবী ছোট হয়ে গেলে মানুষ আর বড় থাকে কি করে। সুতরাং দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষ, তার ন্যায় নীতি আদর্শ উপলব্ধি উত্তরাধিকার— সমস্ত।

এই কি ম্যাজিক রিয়ালিজম? হবেও বা। যা ছিল রুমাল, তাকে বিড়াল বানাতে এখন তো আর রেশমি টুপি পরা জাদুকর, মঞ্চমায়া কিংবা হোকাস পোকাস গিলি গিলি, জাদুদণ্ড— কিছুই লাগে না; যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের জোড়াতাপ্পি জীবনের ভাঁজে ভাঁজে দিব্যি খাপ খেয়ে গেছে ইন্টারনেট। সাইবার-সংস্কৃতির শকথেরাপি সইবার পরীক্ষা আমাদের প্রতি দিনের জীবনযাপন। টিভি ভিসিআর কম্পিউটারের টেকনোমায়ায়, ক্যাসেটের ফিতের পাকে পাকে আর কম্প্যাক্ট ডিস্কের সুদর্শন চক্রে প্রতিদিন রচিত হচ্ছে সেই ভারচ্যুয়াল রিয়ালিটি, সোনার মাথাওয়ালা মানুষেরা যাকে উত্তরআধুনিকতা বলে চেনে। চেনায়। পিছনে পড়ে থাকে আবহমান মানুষের ইতিহাস, পড়ে থাকে তার খিদে তৃষ্ণা হাসি কান্না আর ভালোবাসার গল্প।

না, নিভন্ত এই চুল্লিতে একটু আগুন দেবার জন্য শ্রদ্ধেয় সুধীর চক্রবর্তী 'জনপদাবলি' সম্পাদনা করেন নি। নামেই প্রকাশ, এ কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বঘেঁসা জেহাদি কেতাব নয়। বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ আর তার সাড়ে তিন হাত জমির ভাগীদার কিছু সামান্য মানুষের সৃজনস্বভাব এখানে ধরা আছে। জীবনের মহাকাব্য থেকে বৃহতের সব সম্ভাবনা মুছে গেলেও যাই যাই অবস্থাতে যে মনুষ্যত্ব যায় না একেবারে, কিছুটা থেকেই যায়— লুপ্তপূজাবিধির মতো তার পুনরুদ্ধার এখানে ঘটেছে। এমনও নয়,

এখানে আগ্রাসী গ্লোবালাইজেশনের কোনো পালটা বিরুদ্ধতা করে অঞ্চল-মনস্কামনা পূর্ণ করা হয়েছে (যেমন হয়েছে পর্দায়—লগান ছবিতে—সেলুলয়েড ভাষ্যে)। সত্যি বলতে কি 'জনপদাবলি'তে সেই অর্থে লড়ে যাওয়া বা লড়িয়ে দেবার কোনো নামগন্ধ নেই। তবু এই ভয়াবহ প্রগতির যুগে, বিশ্বায়নের সজাগ হিড়িকে যে বাঙালির মাথা ঘুরে যাবার দশা—নিতান্ত সেই বেনিয়া 'আন্তর্জাতিকতা'র দিনেও তাকে তার শিঁকড় চিনতে শেখাবে যে বই, তার নাম 'জনপদাবলি।' এখানে, পাতায় পাতায় বাংলার মুখ দেখে পাঠকেরা যদি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে চায়, রূপোপজীবিকার সঙ্গে তার তফাৎটুকু বোঝে, আর বুঝে বেশি করে নিজেদের বেঁধে বেঁধে থাকে নিজস্ব গর্বের এলাকায়—জন্মভূমির বর্ণপরিচয় তাদের যথার্থ শিক্ষিত করেছে বলা যাবে।

দুই.

'জনপদাবলি', সম্পাদকের ভাষায় "ইহবাদী মানবমুখী লোকায়ত গানের সংকলন।" এখানে যে দেড়শো গান সংকলিত হয়েছে, তার শ্রেণীকরণের পিছনে সুধীরবাবুর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই 'ইহবাদী মানবমুখী লোকায়ত' শব্দ তিনটিতে আছে। 'আত্মপক্ষ' নামের সুলিখিত ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন যে ধর্মের চেয়ে যে গানে মানুষ বড়, জাতপাতের উর্ধ্বে যে মানুষের স্থিতি—এখানে চেনা অচেনা রচয়িতাদের সৃজনে নির্মাণে সেই মানুষ ধন্য হয়েছে। গণ্য হয়েছে তার পার্থিব চাওয়া পাওয়া। বিনতি-বিস্ময় মেশা জিজ্ঞাসা ও যন্ত্রণা। ধর্মের ঘেরাটোপে যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মূলত এক অধর্মের জন্ম দেয়, এখানে, এই সংকলনের রচনাকারেরা তার থেকে মুক্ত; তাঁদের নিরক্ষর প্রান্তীয় বেঁচে থাকার মাঝে যে 'শিক্ষা' তারা পৃথিবীর পাঠশালা থেকে গ্রহণ করেন, নিজেদের বৃত্তিগত অভিজ্ঞতাত অথবা, ঘটনাচক্রে চেনা উপমা রূপকের সরল বিন্যাসে তাকে মেলে ধরার মুন্সিয়ানাই গানগুলির প্রাণ। কুবির গোঁসাইয়ের একটি পদে যেমন পাওয়া যায় :

"মানুষের করণ কর
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর।
হরিষষ্ঠী-মনসা -মাখাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা ঠুকে মর।
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষভজন ছেড়ে দাও রে বেদ
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের।"

"বিশেষ দেশকালের চিহ্নহীন সময়হারা সেই সব গান পল্লির ম্লান আলোর আসরে, আকাশের চাঁদোয়া খাটিয়ে, মাটির সমতলে দাঁড়িয়ে কতশতবছর ধরে একতারা-দোতারা বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন গাহকের দল। তাঁরা বাউল-ফকির-গাজি-দরবেশ-ভাট কিংবা আরও কত রকম লোকসমাজের শিল্পী-নারী ও পুরুষ। তাঁরা ভ্রাম্যমানও বটে, তাই

পরিযায়ী পাখির মতো এক জনপদের গানের বীজ তাঁরা ছিটিয়ে দিচ্ছেন আরেক গ্রামীণ মাটিতে। গায়ক থেকে গায়ক পরম্পরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে লোকায়ত গান..."—সুদীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত নিরীক্ষণ, সরেজমিনে কাজের প্রত্যয় এবং উপলব্ধির দৃঢ়তা থেকে কথাগুলি বলেছেন সুধীর চক্রবর্তী, জানিয়েছেন এই গ্রন্থভুক্ত দেড়শো গানের "নির্বাচন ও বিচার বিবেচনার কাজ করতে লেগে গেছে প্রায় দুটিদশক।" এই দুটি দশকে বাইরের জগতে লেগেছে কত রকম রংপালিশ, জেগেছে কত জাতের নাশকতা, রীতিমতো বুদ্ধিজীবীর শৌখিন সভাঘরে, নিয়ন্ত্রিত শীতাতপের আড়ালে ঝরে গেছে কত শব্দ-তথ্য-তত্ত্বের আস্ফালন, আমরা অনুমান করতে পারি। মূলত শহরবাসী, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মিডিয়ানিয়ন্ত্রণে বেঁচে থাকার ঋজুরেখ ব্যাকরণের বাইরে তবু থেকে গিয়েছিল অভিজ্ঞতার আরেক দুনিয়া, নিউজ বুলেটিন বা খবরকাগজের বাইরের কিছু খবর, যা শোনাও ছিল বিশেষ জরুরি।

"মন আমার মদিনা রে
কাশী বারাণসী
মনের মাঝে মনের মানুষ
সদাই পরবাসী
মনেতে মথুরা আছে
মক্কা কাবার ঘর
তারই মাঝে বিরাজিছে
মানুষ সুন্দর।"

(একলিমুর রাজা চৌধুরীর পদ)

ক্লোদ লেভি স্টোসের মতো কালচারাল অ্যানথ্রপলজিস্টরা যাই বলুন না কেন, আসলে আধুনিক জনজীবনের শুদ্ধ শহুরেপণা মাটির কাছাকাছি থাকা লোকায়ত সংস্কৃতিকে কদাচিৎ তার যথার্থ মূল্য দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা বিদ্যাচর্চার বাইরে যে প্রকৃত অনুরাগ শিষ্ট সংস্কৃতির সঙ্গে জনসংস্কৃতিকে মেলাতে পারতো, নানান আর্থসামাজিক কারণে সেই অনুরাগ, অনুরাগী মন, গঠিত হয় নি; উর্বর অস্‌মোসিসের সেই লেনদেন, সেই প্রার্থিত সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো শক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতির বনিয়াদ হতে পারতো, হয় নি। সুধীরবাবু ঠিকই বলেছেন—

"এমনতর প্রবণতার সংকীর্ণ বীক্ষণে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস রাজা রামমোহন রায়কে যতটা মূল্য ও উচ্চস্থান দিয়েছে, তার সমকালীন লালন শাহ্ ফকিরকে তার সামান্য অংশ দেয়নি।" রামমোহন রায়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য একটু একটু করে আত্মপরিচয় পাওয়া 'নবজাগ্রত' ভদ্রলোক বাঙালির চোখে যে সম্ভ্রম স্বাভাবিকভাবে অর্জন করে নিয়েছিল, লালন, সুধীরবাবুর ভাষায় 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন তা কি করে পাবেন? সুধীরবাবুর ভাষায় 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন', তা কি করে পাবেন? তাই রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্রের অপেক্ষায় ভাবীকালের দ্বারে বসে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। অথচ লালনের অধুনাতন খ্যাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই গানে যে সরল ঔদার্যের ছবি আছে, তার কি

কোনো তুলনা হয়।

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে—
লালন বলে জেতে কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।
যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের কী হয় বিধান
বামন চিনি পইতেয় প্রমাণ
বাম্‌নি চিনি কীসে রে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলায়
চাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।"

সমন্বয়ের এই সহজ উচ্চারণ সাধারণ লেখাপড়া শেখা বাঙালির শ্রুতিকে ফাঁকি দিয়েছিল, অহেতুক উন্নাসিকতা বছরের পর বছর তার বোধবুদ্ধিবোধিকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে স্বাধীনতা-উত্তর কালেও তার মানসিক পরাধীনতা ঘোচে নি। সাগরপারের খামখেয়ালি তত্ত্বচর্চা বারবার তাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে অনুর্বর ভূমিতে। কনসেনট্রেশান ক্যাম্প আর হলোকাস্টের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিনা সে চেয়েছে অ্যাবসার্ড নাটক লিখতে—পাশ্চাত্য ধরনে। হাংরি-শ্রুতির নামে বাঙালির প্যাশন নির্লজ্জ নকলনবিশি করেছে, বদহজমের চোঁয়া ঢেকুর ছাড়া সৃষ্টিশীল কাজের কাজ কিছুই হয় নি। ঠিক এই কলোনিমনস্কতাই তাকে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতভূমি মুছে গেলে, এক-মেরুক রাজনৈতিক পৃথিবীর নবতম তাত্ত্বিক খামখেয়াল উত্তর আধুনিকতার দিকে চুপিচুপি নিয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বের সমাজ সংস্কৃতি কৃত্য লোকাচার ও তার বিন্যাসের সঙ্গে এই তৃতীয় বিশ্বের ভয়াবহ ব্যবধানের মৌলিক চেহারা চরিত্র তার মাথায় থাকে নি। অথবা, নিদারুণ জ্ঞানপাপী হয়ে ভুলে মেরে দিয়েছে মূলত অর্থনীতিনির্ভর শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উভয়ের আসমান জমিন ফারাক। আন্তনিও গ্রামচি একেই বলেছেন, হেজিমনি। দোল-দুর্গোৎসব ছেড়ে এই যে আজকাল ভ্যালেনটাইনস ডে আর ধনতেরাসে মাতোয়ারা হওয়াটাই 'রাইট চয়েস'—তার তো কোথাও একটা মানে আছে, না কি?

সেই যুগসন্ধির দিনগুলিতে ঈশ্বর গুপ্তের সংশয় আর সন্দেহকে এখন আর প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয় না। আর এক যুগসন্ধির মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরও কি সংশয় কিছু কম? এবি শিখে বিবি সাজা এবং 'বিলিতি বোল' বলার মধ্যে যে দাসত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় হারানোর আশঙ্কা ছিল, বা ছিল শিকড়হারা হবার ভয়— অন্তত যে ভয় ঈশ্বর গুপ্ত পেয়েছিলেন সেদিন, তা কি নতুন ছদ্মবেশে নিয়ে নতুন মিলোনিয়ামে ফিরে আসেনি আজ? সমস্ত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্নতাকে পদদলিত করে ক্রমশ যখন গ্লোবালাইজেশন আর অ্যামেরিকানাইজেশন একাকার হয়ে যায়, তখন তা মেনে নিতে নিতে কোলকুঁজো আমাদের সসেমিরা অবস্থা যুগপৎ হাসি আর করুণার কারণ হতে পারে। সন্দেহ হয়,

আব্বাসউদ্দিন বুঝি এমনতর অবস্থার কথা ভেবে লিখেছিলেন 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।'

তিন.

সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয় যখন নিঃস্ব তৃতীয় বিশ্বের কোথাও জাতপাত কিংবা ধর্ম নিয়ে দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে। অনুকূল রাজনৈতিক বাতাবরণে শুরু হয় সলতে পাকানোর গোপন পর্ব, তারপর প্রস্তুতির পালা শেষ করে অধিকতর অনুকূল সময়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দাঁত নখ বেরিয়ে পড়ে। যেন অন্ধ আর বধির কিছু মানুষ মনুষ্যত্বের নিম্নতম সীমায় এসে দাঁড়ায়, রক্ত ঝরে লাশ গুম হয়, লুঠতরাজ আর ধর্ষণ চলে অনবরত। অবশেষে ঝড় থেমে গেলে দেখা যায়, কারো কারো স্পষ্ট পৌষমাস। অন্তত ভোটবাবুদের হয় পোয়াবোরো, ভোটব্যাঙ্ক মজবুত হয় দিকে দিকে। বিশেষ করে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এ জিনিস বারবার দেখা গেছে। নানান দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাপুরুষতা আর মতলবের শিকার হয়েছে। গান্ধীর গুজরাট তার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

গণমাধ্যমগুলি এত বেশি বেশি করে গোধরা-গুজরাট বৃত্তান্ত শুনিয়েছে যে সেই প্রসঙ্গগুলি এখানে পুনরুক্তির মতো শোনাবে। মনে রাখা ভালো, একটি ভয়ংকর স্ববিরোধ কিন্তু এখানে সর্বত্র। একদিকে ইন্টারনেট, ই মেলের ইন্দ্রজাল, পৃথিবীটা যেন মর্মান্তিক রকম ছোট, অথচ এত গা ঘেঁষা অবস্থান সত্ত্বেও প্যালেস্তাইন থেকে চেচনিয়া হয়ে ইরাক পেরিয়ে আফগানিস্তান অতিক্রম করে কাশ্মীর থেকে শ্রীলঙ্কা—ধর্মের নামে, জাতির নামে মানুষ মানুষকে মেরে গেল বার বার। এমন বৈজ্ঞানিক উন্নতির পৃথিবীতে কুটুম্বিতায় বাঁধা পড়লো না বসুধা। আরও বেশি আত্মঘাতে অক্লান্ত হল মানুষ, কর্তৃত্বের নেশায় আরো বেশি যুযুধান হল অমৃতের সন্তানেরা! বিশ শতকে ও তারপর অমৃত ক্রমশ বিষ হয়ে গেল। সভ্যতার এই যে ঝাল স্বাদ, শেখানো হল— এই শাশ্বত।

চোর পালালে যথারীতি বুদ্ধি বাড়ে। গুজরাটের শহরে সদরে মফস্বলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শত শত মানুষের জানমান ছিনিয়ে নেবার পর, প্রশাসনিক অপদার্থতার পর, টনক নড়লো সাধুসান্ত্রী মোল্লা মন্ত্রীদের। বিপ্রতীপ প্রচারে প্রচারে ঝালাপালা, যথারীতি মৃত্যুর পরিসংখ্যান নিয়ে চাপান উতোর, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কোলে ঝোল টানা, দাগা দিয়ে অন্ধকারের কথা ও কাহিনীকে সামনে এনে সামান্যতম মানবিক আলোর সম্ভাবনাকেও আঁতুড়েই গলা টিপে মারা—এইরকম ধরতাই পার হয়ে অতঃপর, সম্প্রীতি এবং সম্প্রীতি। সুস্থ সম্পর্কই তৈরি হল না, সম্প্রীতি কি করে হবে? গোড়ায় গলদ রেখে দিয়ে, সতর্কতার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করে শেষে এই সম্প্রীতি সম্ভাবনা যেন পচা লাশের উপর চড়া অগুরুর গন্ধ। 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?' প্রদেশের পরিখা পার হয়ে সে বিপদ বাংলার দরজায় হাত রাখতেই পারে। নিশ্চিত সুখনিদ্রা নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কে চায় এই কালপ্রহরে? ঠিক এই প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তীর এই কাজ, এই 'জনপদাবলি'র গুরুত্ব আরো একবার অনুমিত হবে। বিশেষত গ্রাম বাংলার চিরন্তনী ঐক্যের,

পরধর্মসহিষ্ণুতার একটি বিশ্বস্ত বিবরণ যেহেতু এখানে, এই তিমিরহননের গানগুলির অক্ষরে ছড়িয়ে আছে। যেমন আবদুল করীমের এই পদটি, স্মৃতিকাতরতা যার পরতে পরতে :

"আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম—
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটুগান গাইতাম।
বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত।
আনন্দ পাইতাম।
বাউলা ঘাঁটু গান আনন্দেরই তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম।
হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।'

এই গানে ক্রিয়ার কাল যেমন, সব কিছু ততোটা অতীত হয়ে যায় নি এখনো, এমন আশার কথা শুনিয়েছেন সুধীরবাবু, গভীর নির্জন পথে চলতে চলতে তুলে এনেছেন সেই অভিজ্ঞতার মণিমুক্তো—আমাদের জন্য, আমরা, যারা বুঝেও বুঝিনি যে নাগরিক শ্রেণীকক্ষ বা বীক্ষণাগারের বাইরে কিছুটা অমলিন আকাশ এখনো আছে। তথাকথিত আধুনিকতার বহুতর বিষক্রিয়া হজম করেও, আছে। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯য়ে আনন্দবাজার পত্রিকার একটি অনবদ্য 'কলামে' সুধীর চক্রবর্তী শুনিয়েছেন :

"ঘোষপাড়ায় সতী মা-র মেলায় বরাবর দেখি হিন্দু গুরুর মুসলিম শিষ্য, মুসলিম গুরুর হিন্দু শিষ্য। চৈত্রের কৃষ্ণা একাদশীতে অগ্রদীপের মেলায় সাহেবধনীদের জমায়েত। সেখানে দেখি গুরু পালবংশের তত্ত্বতালাশ করছে মুসলিম শিষ্যরা।......এসব দেখে শুনে আমার ধারণা হয়েছে, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা আর অবিশ্বাসের যে ঢেউ উঠেছে চারপাশে তার সমাধান আছে লোকধর্মে আর তার গানে। ......চারাতলা গ্রামের ডিমওয়ালা ইয়াকুব আমাকে কেমন সহজে বলেছিল, 'বাবু, আল্লার তৈরি জাতি হল দুখানা—পুরুষ আর নারী। আর যে সব জাতি দেখেন তা মানুষের বানানো, ওসব শেষ পর্যন্ত টিকবে না।

.....এ বাংলায় অন্তত এখনও গ্রামীণ গান ও লোকধর্ম স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা অতীতের সামগ্রী নয়। এখনও তা সজীব ও বহমান।"

তাঁর ভরসায় ভরা কথাগুলির নানা দৃষ্টান্ত দেখি 'জনপদাবলি'তে, দেখি মেহনতি গ্রাম বাংলার অসাম্প্রদায়িক পুরনো ঠাঁট, যার আধারশিলা এই আধারেও আবছা হয়ে যায়নি, ভেঙে খান খান হয়ে যায় নি। যেহেতু যাপিত জীবনসূত্রে তাঁরা জেনেছেন :

"যদি মক্কায় গিয়ে খোদা মিলত
শিব মিলত কাশীতে
যদি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ মিলত

কেউ ফিলত না দেশেতে।
যদি ভোগ দিয়ে ভগবান মিলত
খোদা মিলত সিন্নিতে
তবে বড়ো করে ভোগ লাগাবে,
বাদশায় পারত কিনিতে।" (বল্লভ)

তার চেয়ে আরো একধাপ এগিয়ে জামালুদ্দিন শুনিয়েছেন—

"আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই
স্থান না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে লয়েছ ঠাঁই।"

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'-র থেকে ঐ জনপদখানি খুব পৃথক কি? যেমন আদৌ পৃথক্ নয় কাজি নজরুল ইসলামের সেই চেনা কবিতার চেয়ে খোদা বক্শ শাহের এই পদ :

"জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি কি নিবা সঙ্গে করে
সাদা কিবা কালোবরণ জাত দেখছ কি এক নজরে।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি এই জেনেছ জাতির জান
লম্বা কি সে গোল আকৃতি কি করেছ তার প্রমাণ।"

এই ভাবে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে, পাঠক, আপনার ক্ষুধা হরণ করবো না। আপনি নিজেই হাতে নিন 'জনপদাবলি'। চোখে দেখুন, চোখে দেখুন। নিজে পড়ুন, অন্যকেও দিন পড়তে, ইস্তাহারের মতন ছড়িয়ে দিন সাধ্যমতো, দিকে দিকে। ভয়াবহ ভাঙনের এই ঋতুতে নিজেদের মধ্যে একটু বেঁধে বেঁধে থাকুন। দুদ্দু শাহ জানতেন, "শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে/ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশেতে এসে।" সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে নতুন করে কোনো শক্তি যেন রিমোট কনট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে আমাদের, আমাদের আর্থসংস্কৃতি আর রাজনীতি। এই ঝুটা আজাদির আহ্লাদে মজে থাকতে থাকতে আসলে যেন আমরা 'পরাধীন' না হয়ে যাই আবার। দেশজোড়া এক মানববন্ধনের বন্ধনহীন গ্রন্থি হোক সুধীর চক্রবর্তীর এই আশ্চর্য চয়ন— 'জনপদাবলি'।

চার.

'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' থেকে প্রকাশিত দুশো পনেরো পৃষ্ঠার এই বইয়ের আর একটি .তাৎপর্যময় অলংকার সম্পাদকের তৈরি 'গীতিকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য ও পদাংশের টীকা।' ফলে প্রকৃত আগ্রহী কিন্তু অদীক্ষিত পাঠকের বেপথুমান হবার সম্ভাবনা নেই। বিশেষত গীতিকারদের 'জীবনতথ্য' এক মূল্যবান প্রাপ্তি। রয়েছে সহায়ক গ্রন্থের বিস্তৃত তালিকা, চাইকি নিজেকে আরো দ্রুত দূরবর্তিতায় নিয়ে যেতে পারেন কৌতূহলী পাঠক, এই দিশা সামনে রেখে। কিছু কিছু গানে ধর্ম তো নেই, লোকায়ত ধর্মও না—আছে নস্ট্যালজিয়া আর আর্কাইভের ধরন। যেমন পাখির গান, ফলের গান, বাঁশগীতি কিংবা কার্তিকশাল ধানের গান। ছাদ পেটাইকরদের বিশেষ বৃত্তির গান। অর্থাৎ কিছু লগ্নতা, কিছু মগ্নতা, জীবনের সঙ্গে জীবনের গভীরে। সুদীর্ঘ ভূমিকা 'আত্মপক্ষ' তো আছেই। এই সব কিছুর মূল্য মাত্র সত্তর টাকা। এই মাগ্গিমন্দার

বাজারেও খুব বেশি হল কোথায়?

অস্মিতার অঙ্গস্পর্শ না করেও ছিপছিপে এই গ্রন্থ বড় অহংকাবী। হালকা আর গাঢ় চকোলেট রঙের দ্বৈততায় গড়া এই পেপারব্যাক বইটি (প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ)-র যা বিষয়, তারপর একথা আর আপ্তবাক্য বইলো না, যে 'ভুখা মানুষ ধরো বই, ওটা তোমার হাতিয়ার।' সত্যি, এ এক অমোঘ অস্ত্র। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'জনপদাবলি' সুখপাঠ্য, শিক্ষণীয় তো বটেই, তার চেয়ে বেশি কিছু। পাণ্ডিত্যের নামে, নৈতিকতার নামে নানা খুচরো নাগরিক চালাকি আর ইন্টেলেকচ্যুয়াল নেমকহারামির ইতর মিতালি নিথর হয়ে যেতে পারে স্রেফ এই বইয়ের সামনে এসে। বাইরের তত্ত্বকথা জেনে ঢের সময় নষ্ট হয়েছে, এবার পায়ের তলার মাটিটাকে চেনা যাক। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতন যখন সেই সুযোগ এসেই গেছে আমবাঙালির কাছে, শ্রীসুধীর চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁব কাজটা একটু এগিয়ে নিয়ে যাই, চলুন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পংক্তিকে একটু বদলে বলি, শতাব্দী শুরু হল, একটু পা চালিয়ে ভাই।

পবিচয়
মে-জুলাই ২০০২

(এঃ) সম্পাদিত নিবন্ধ

এঃ ১. রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প

এঃ. ১. ১. আলোচক : সরোজ আচার্য

রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্‌যাপনে 'বার্ডোলেট্রি'র আতিশয্য থেকে নিষ্কৃতি নেই। এর পর আছে স্বত্বের মামলা। রবীন্দ্রনাথ কে এবং কী ছিলেন নয়, রবীন্দ্রসাধনায় স্বত্বাধিকার বা উত্তরাধিকার কার, তাই নিয়ে তকরার। রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী, না খাঁটি ভারতীয় না কি রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্ন ইওরোপীয়; তাঁর আন্তর্জাতিকতার উৎস প্রাচীন ঔপনিষদিক ভাবধারা, না নব ইওরোপীয় মানবতন্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের অন্তরঙ্গতা-পুষ্ট, এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং উত্থাপিত হওয়াটা আশ্চর্য নয়। তবে মুশকিল এই যে, এসব প্রশ্নের আলোচনায় যুক্তিনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা যে-পরিমাণ থাকা বাঞ্ছনীয় রবীন্দ্রানুরাগীরা সকলে সর্বত্র সে-বিষয়ে অবহিত নন। রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে স্বত্বের এবং উত্তরাধিকারের মামলা জেতার জন্য 'শনিবারের চিঠি', বুদ্ধদেব বসু, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাবাদীরা এবং আরো অনেকে নানা দিকে এলোপাথাড়ি শরসন্ধান করেছেন, যার ফলে সম্প্রতি রবীন্দ্রানুশীলনের নির্মল প্রতিবেশটি পরস্পর বিদ্বেষে, অতিকথনে কলুষিত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অতিকথনে আমরা প্রায় সকলেই অবশ্য অল্পবিস্তর অভ্যস্ত। ব্যক্তিপূজায় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিগত বিরাগ বা অনাসক্তি কোনোকালেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ নয়। রাষ্ট্রনেতা, ধর্মগুরু, মহাকবি কিংবা বিজ্ঞানী সবাইকেই প্রায় একই প্রকারের বিশেষণে সবিশেষ ভূষিত করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টায় আমাদের অনেকেরই উৎসাহ অপরিসীম; এমন কী ভজন-পূজনের সনাতন মন্ত্র ও মুদ্রাগুলি প্রয়োগেও আমাদের দ্বিধা নেই। যে কারণে গত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্র-প্রতিভার ধারাবাহিক অনুশীলন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস রয়ে গেছে সীমাবদ্ধ, ভগ্নাংশতুল্য, প্রচারিত হয়েছে প্রধানত রবীন্দ্র-প্রতিভার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের বিজ্ঞপ্তি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত যথার্থ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিভাকে আমরা আত্মসম্মান বাঁচাবার দুর্গের মতো ব্যবহার করেছি। পশ্চিম সভ্য জগৎকে ডেকে বলেছি, আমরা পিছিয়ে-পড়া পরাধীন জাতি, কিন্তু তার মধ্যেও দেখ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমতুল্য সাহিত্য-স্রষ্টা তোমাদের নব ইওরোপেও কজন জন্মেছে?......ভারতবর্ষ বিদেশী রাজশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন আমাদের দূর হয়নি। আর সেই জন্যই মার্কিন দেশের চতুর্থশ্রেণীর পদ্যলেখক সে-দেশে রবীন্দ্রনাথের 'ষ্টক' কেমন নেবে গেছে, ওয়াল স্ট্রীটের দর ওঠানামার কায়দায় যখন তার বর্ণনা করে, আমরা খবরের কাগজে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন মনে করি। এক প্রচারের উত্তর অন্য প্রচারে দিতে চাই।" (রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড)। এই হীনম্মন্যতার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা-পূজকরা ওয়াল স্ট্রীট এবং প্যারিসের 'বুর্মের' উদ্দেশে বিগলিত চিত্তে ঘোষণা করছেন, রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমেরই মানস-শিষ্য এবং অতএব হে পশ্চিমী-সংস্কৃতির মুরুব্বীগণ, আপনারা আমাদের রবীন্দ্রনাথকে দয়া করে একটুখানি

ঠাঁই দেবেন পশ্চিমী সংস্কৃতির বাজারে। আবার এদিকে রবীন্দ্রনাথের "জাতীয়তাবাদী" স্বত্বাধিকারের দাবিদার যাঁরা তাঁরা গর্জন শুরু করেছেন, "খবরদার, মার্কসবাদীরা রবীন্দ্রনাথকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করলে ভালো হবে না।" রবীন্দ্র শতবর্ষের মানসিক আবহাওয়াটা ঠিক রবীন্দ্রনাথোচিত কি না রবীন্দ্রানুরাগীরাই সেটা বিচার করবেন আশা করি।

তবু আনন্দের কথা, রবীন্দ্রশতবর্ষে রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক অনুশীলনে আমাদের মুষ্টিমেয় মননশীল লেখকগণ উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁদের উদ্যোগের প্রাবন্ধিক ফল পরিশীলিত চিন্তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সমালোচ্য তিনখানি প্রবন্ধ সংকলনের বিষয়-সূচীর সাধারণ ঐক্য লক্ষ্যণীয়। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ সোমনাথ মৈত্রের 'রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য', গোপাল হালদার সম্পাদিত 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সার্বভৌম কবি' প্রায় একই বিষয় লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভূমি থেকে আলোচিত। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' বইখানিতে সংকলিত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক' প্রবন্ধটির সঙ্গে 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ গোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' সমপর্যায়ভুক্ত। কবি ও কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই এই তিনখানি সংকলনের আলোচনায় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছেন। 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (অজিত দত্ত), 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত), 'দামিনী' (কানাই সামন্ত), 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি' (বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী); 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' (রবীন্দ্র গুপ্ত), 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) একই শ্রেণীর লেখা এবং আলোচনার গুণগত তারতম্য থাকলেও পদ্ধতিগত পার্থক্য সামান্যই। সম্ভবত আমাদের কালের রবীন্দ্রনুরাগীগণ রবীন্দ্র প্রতিভার দীপ্তিতে এমনই বিমুগ্ধ যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলা ও কথাশিল্পের মূল্যায়নে তাঁরা নির্বিশেষভাবে একাত্ম। হয়তো অনেকটা সে কারণেই মনে হয়, লেখক ভিন্ন ভিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং কথাসাহিত্য আলোচনায় তিনখানি সংকলনই গতানুগতিক ধারাবাহী, বিচার ও বিশ্লেষণে নব আবিষ্কারের বিস্ময় অনুপস্থিত প্রায়। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং কাব্য-শিল্পের নির্মাণ-রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস তিনখানি সংকলনেই অনেক বেশী সার্থক মনে হয়। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথেব শব্দ' (রবীন্দ্রায়ণ), অমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা' (রবীন্দ্রায়ণ), সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার' (রবীন্দ্রায়ণ), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক' (শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প' (রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প)—এই কটি প্রবন্ধই রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ মৌল গবেষণার পদ্ধতি প্রবর্তক বলা বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না।

এই তিনখানি সংকলনের প্রবন্ধকারগণ রবীন্দ্রজীবন-সাহিত্য-শিল্পের সশ্রদ্ধ অনুশীলনে একাত্ম বটে, তবে, 'রবীন্দ্রায়ণ' (পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত), 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন' (গোপাল হালদার সম্পাদিত) এবং 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' (সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত) -প্রত্যেকখানিরই লেখকগোষ্ঠীর কুল-চিহ্ন আলাদা। রবীন্দ্র-সমালোচনা সম্পর্কে এই তিনটি

সংকলনের তিনটি লেখক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগত শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না, কারণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ইতিমধ্যেই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় গোপাল হালদার সংকলিত 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'কে মার্কসবাদ-দোষদুষ্ট গণ্য করে সংকলনের কোনো কোনো প্রবন্ধকারের তীব্র নিন্দাবাদ করেছেন। 'শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন'-এর সব কয়জন লেখকই মার্কস্‌বাদী কিনা জানা নেই, তাছাড়া এই সংকলনের ভূমিকায় গোপাল হালদার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন রবীন্দ্র-প্রতিভার "সশ্রদ্ধ আলোচনার সংকল্প" ছাড়া এই গ্রন্থে কোনো বিশেষ মত প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয় নি। "দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ ঐক্যে" শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলনের লেখকরা সকলেই সম্ভবত মার্কস্‌বাদী না হলেও মার্কস্‌বাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। রবীন্দ্রনাথের 'টোটাল' স্বত্বাধিকার বা উত্তরাধিকারের দাবিদার যাঁরা তাঁরা ছাড়া প্রকৃত রবীন্দ্রানুরাগীরা নিশ্চয়ই এই মার্কস্‌বাদী চিন্তাশীলদের রবীন্দ্রপ্রতিভা আলোচনায় কোনো আপত্তির কারণ খুঁজে পাবেন না। বরঞ্চ এই সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ-সচেতনতা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও মননের কতকগুলি স্বল্প আলোচিত দিকের "বুদ্ধি ও শ্রদ্ধাসম্মত পরিচয়" দানে। গোপাল হালদারের সুলিখিত তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা'য় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' প্রবক্তা শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও কোনো ছিদ্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন কি না সন্দেহ।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি', চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' তথ্যসম্ভার সমৃদ্ধ মূল্যবান আলোচনা—যা মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীর প্রখর সমাজবোধ এবং তথ্য সংগ্রহ ও সমাবেশে সততার প্রশংসনীয় নিদর্শন।

আমার বরঞ্চ অনুযোগ, এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অগ্রণী মার্কসবাদী লেখকরা পুরনো বিতর্কের 'সিন্দুরবর্ণ মেঘের' ভীতিগ্রস্ত অস্বস্তি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গতানুগতিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দানই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। যেমন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সার্বভৌম কবি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়েও যদি কেউ বাঙালীর হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।"

নিছক বিবরণ হিসেবে কথাটা ঠিক। কিন্তু বাঙালী ভাবলুতার আতিশয্য ও বিকার রবীন্দ্র-কাব্যধারার যে অংশ hypnotic তার দ্বারা কখনও এবং কিছুপরিমাণ প্রভাবিত হয়েছি কিনা সুধী প্রবন্ধকার সে-বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। "অত বড় চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও কবিকে এদেশের নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে, বহির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করেছে, অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করেছে" হীরেনবাবুর এই সংক্ষিপ্ত সাহসিত ইঙ্গিতটুকু বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

সুশোভন সরকারের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধটির আলোচনাপদ্ধতি গতানুগতিক উচ্ছ্বাসবর্জিত—যে ভক্তিবাদী উচ্ছ্বাসের আধিক্য ক্লান্তিকর লাগে প্রমথনাথ বিশী (রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ) এবং সোমনাথ মৈত্রের (রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য) অন্যথা সুলিখিত আলোচনায়। তাছাড়া বাংলার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রমানসের

পরস্পরবিরোধী ভাবধারার পরিচয় দিতে গিয়ে সুশোভনবাবু বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে একটি সময়োচিত এবং সারগর্ভ স্পষ্টোক্তি করেছেন যা আমাদের অনেকের অত্যুগ্র বাঙালী সাংস্কৃতিক অহমিকাকে কিছুটা সংযত করার সাহায্য করতে পারে। "বাংলার নবজাগরণকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশনের কথা, গত পনেরো কুড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে 'ইউরোপের পনেরো ষোল শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের পার্থক্য বিস্তর, বাংলার রেনেসাঁস...খণ্ডিত, আড়ষ্ট, কিছুটা অস্বাভাবিক" এবং রবীন্দ্রনাথও যে দীর্ঘকাল প্রাচ্যাভিমান ও পশ্চিমী মানবতন্ময় সাম্যবোধের দোটানায় পড়েছিলেন সুশোভন সরকার তা সংক্ষেপে তথ্যসহযোগে দেখিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত" সুশোভনবাবুর এই চূড়ান্ত মূল্যায়ন 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী' শনিবারের চিঠির সম্পাদককে যেমন ক্ষিপ্ত করেছে তেমনি মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীও এই মন্তব্যকে অন্যদিক থেকে আত্যন্তিক অনুরাগরঞ্জিত অতিশয়োক্তি মনে করলে আশ্চর্য হব না। সেদিক থেকে তরুণ অধ্যাপক লেখকগোষ্ঠীর সংকলনভুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক' (রবীন্দ্রনাথ: মনন ও শিল্প) প্রবন্ধটির দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন আরও বেশি যুক্তিনিষ্ঠ মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রবাহের বিভিন্ন পর্বের পরস্পর-বিরোধিতা হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আলোচনায় চমৎকারভাবে পরিস্ফুট। যে উক্তি মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রপ্রতিভা আলোচনায় স্থান পেনে আনন্দিত হতাম তার সাক্ষাৎ পাই হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে। যেমন "বঞ্চিতের কবি বলে অশ্রদ্ধাবান প্রশংসায় তাঁকে আমরা ভূষিত করব না, তিনি নিজেই জানতেন তাঁর কবিতা 'সর্বত্রগামী' হতে পারে নি।...বস্তুত, প্রগতির অন্য নাম যদি হয় মার্কস্‌বাদ তাহলে নিশ্চয় তিনি প্রগতিশীল ছিলেন না....ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে তিনি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উপায় বলে মনে করতেন; নিরন্তর পরিবর্তনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মার্কসীয় ভঙ্গিতে নয়, হেগেলীয় ভঙ্গিতে....। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধটিতে জমিদারকে 'জমির জোঁক...প্যারাসাইট...পরাশ্রিত জীব' বলে তিরস্কৃত কবলেও ব্যবস্থাপত্রে জমিদারি প্রথা তুলে দিতেও বলেন নি।... মার্কসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল বোধ হয় এই যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার ক্লান্তি শেষোক্তের অনুভবেও ধরা পড়েছিল।"

আলোচ্য সংকলন তিনখানির লেখকগোষ্ঠীত্রয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং কুলচিহ্নের বিশিষ্টতা নির্ণয় যদি সমালোচকের কর্তব্য হয় তাহলে সামান্য অতিরঞ্জনের ঝুঁকি নিয়ে চলা যায়, 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর লেখকগোষ্ঠী রবীন্দ্রঐতিহ্যের বুনিয়াদী ব্যাখ্যায় কুশলী 'ক্লাসিসিস্ট', 'রবীন্দ্রনাথ-শতবার্ষিকী সংকলন'-এর লেখকরা 'মার্কসিস্ট' অথবা সাধারণভাবে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারী আর 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প'-এর নবীন অধ্যাপক লেখকগোষ্ঠী যাকে বলা যায় 'মর্ডানিস্ট'—রবীন্দ্রপ্রতিভার মহিমায় আকৃষ্ট হলেও রবীন্দ্রোত্তর কালেব মনীষার আলোকে পুনর্বিচারপ্রয়াসী। এ বিষয়ে শেষোক্ত সংকলনের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : "কোথাও কোথাও তাঁদের অস্ত্র আমাদের আবহমান ধারণাকে আহত করবে। কিন্তু সে অস্ত্রাঘাত, ভীষ্মের প্রতি অর্জুনের মতো শ্রদ্ধার প্রকাশ।"

আলোচ্য সংকলন তিনখানির সবগুলি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকার সম্পর্কে প্রয়োজনমতো মন্তব্য

করায় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হল না বলে কেউ যেন ভুল ধারণা পোষণ না করেন যে এক্ষেত্রে অনুল্লেখ উদাসীনতা বা উপেক্ষার পরিচয়। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তিনখানি সংকলনেরই প্রবন্ধসম্ভার রবীন্দ্রশতবর্ষের মূল্যবান সম্পদ এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রপ্রতিভার নানাদিকের পর আলোকপাতে রবীন্দ্রসৃষ্টিলোককে উদ্ভাসিত করেছে যেভাবে তাতে সাম্প্রতিক সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রের এই নতুন ফসলের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে বলতে পারি "Here's God's plenty."

(এখানে তিনটি বই একত্রে আলোচিত হয়েছে :

রবীন্দ্রায়ণ : প্রথম খণ্ড।। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্‌সাহিত্য। দশ টাকা।।
রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন।। গোপাল হালদার সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। পাঁচ টাকা।।
রবীন্দ্রনাথঃ মনন ও শিল্প।। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। অচলায়তন প্রকাশনী। পাঁচ টাকা।।)

পরিচয়
আশ্বিন ১৩৬৮

এঃ. ৪ যৌনতা ও সংস্কৃতি

এঃ. ৪. ১. আলোচক : **উৎপল ঘোষ**

মনোলোক সতত অন্ধকারময়। অন্ধকারকে আলোকিত করার কতই না প্রয়াস মানুষের; সম্ভবত সাহিত্যই এ পথের প্রথম অভিযাত্রী। জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে মনোবাস্তব বিশ্লেষণ সম্প্রতি সাবালক হয়েছে। আগে এটি ছিল দর্শনশাস্ত্রের গর্ভে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিচিত্র ও বহুমুখী আবিষ্কার মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে অন্বিত হয়ে মনঃসমীক্ষণকে কিছুটা যুক্তিবহ করেছে। মনোবিদ্‌দের একটি অংশ মানসলোকের চাবি সন্ধান করেছেন যৌনতায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড এঁদের গুরু। অনেকটা পথ পেরিয়ে সম্প্রতি মিশেল ফুকো যৌনতার অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ক্ষমতা বা প্রভুত্ব সম্পর্কের সঙ্গে যৌনতার গূঢ় সম্পর্ক উন্মোচন করে তিনি জ্ঞান, যৌনতা ও ক্ষমতার জটিল বিন্যাস বিষয়ে আমাদের জ্ঞানবান করেছেন। সিমন দ্য বোভোয়ার দি সেকেন্ড সেক্স নারীবাদী চিন্তাবিপ্লবের গীতা বলে গণ্য হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকার মাটি ছুঁয়ে এদেশে এই চিন্তা সম্প্রতি প্রখরতা অর্জন করেছে। অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষ-মানুষীর হাত ধরে কখনও তা নগ্ন পুরুষ বিদ্বেষে এবং কখনও বা পুরুষ নিপীড়নের অন্যতম হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েয়ে। যৌনতা, যৌনসাম্য ও ক্ষমতায়ন বিষয়গুলির প্রকাশ ও প্রচারে আন্তর্জাতিক পুঁজির একটি বড় অংশ নিয়োজিত রয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার মত গুরুগম্ভীর বিষয়গুলির সঙ্গে সৌন্দর্যশিল্পপুঁজির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি। নারীজাতির ভোটের পরিমাণের হিসেব কষে রাজনীতির নট নটীরা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইনসভায় আসন সংরক্ষণ নিয়ে দিবারাত্র চিন্তা করছেন। তপসীলী জাতি ও উপজাতিদের মতই নারীদের অনগ্রসরতা দূরীকরণে সংরক্ষণই মোক্ষম দাওয়াই বলে মনে হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক, প্রশাসকও নীতি নির্ধারকদের। সকল নারী যে সুযোগহীন অবস্থায় নেই অর্থাৎ, 'নারী' বর্গটি সে একস্তরীয় বর্গ নয়, সেটি রাজনীতিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এদেশের মননে ও যাপনে যৌনতা ধারণাটির বিবর্তন সর্পিল। অজন্তা, ইলোরা, কোনারকের ভাস্কর্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মূলধারায় যৌনতা স্বমহিমায় দীপ্যমান। দীর্ঘ ও ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে এদেশে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে কালচারাল সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যবাদের উপজাতক হল নবজাগৃতি। আমাদের নবজাগৃতি আসলে এদেশীয় যাপনের সঙ্গে পশ্চিমী যাপনের অদ্ভুতুড়ে মিশ্রণ। নবজাগ্রত এদেশে পরাগাছা পুঁজিবাদের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী নভেল পাঠ ও পা-ফাঁক করে সিগারেট খাওয়া যেমন শুরু হল তেমনি দেশীয় যাপনে যৌনতার যে প্রচলিত ছাঁচটি ছিল তা হটে গিয়ে পাশ্চাত্য ছাঁচের আমদানি হল। নবজাগ্রত এলিটদের কাছে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা প্রেয় ও শ্রেয় বিবেচিত হতে থাকে—যা বঙ্কিমচন্দ্রে শুরু হয়ে রবীন্দ্রনাথে পূর্ণ বিকশিত হয়। রাজনৈতিক এলিটদের উৎসাহে 'ব্যক্তি', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ', 'গণতন্ত্র' ইত্যাদি পাশ্চাত্য

ধারণাগুলি অনুকৃত হতে থাকল যদিও পাশ্চাত্য অর্থে 'ব্যক্তি' আজও এদেশে সুলভ নয়। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনগুলি স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীসত্তাই এদেশের মুখ্য বাস্তবতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবসিত হলে সমগ্র বিশ্বে মার্কিন কালচার আধিপত্যশালী হয়ে ওঠে। ভিক্টোরীয় অনুশাসন মজ্জাগত করে নেবার সমান্তরালে মার্কিন গণতন্ত্রপ্রীতির আষাঢ়ে গল্পের পিছু পিছু যৌন স্বাধীনতার মত বিদেশী ধারণাকে সাড়ম্বরে বরণ করলাম আমরা। মার্কিন অতিজাতিক সংস্থাগুলির কল্যাণে পেপসি ও কোকাকোলা সুদূরতম গ্রামে পৌঁছে গেল। পাশাপাশি আমাদের কোকোকোলায়িত যাপনে এইড্স্, মুক্ত যৌনতা, লিভ টুগেদার, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীবাদের মোড়কে পুরুষ বিদ্বেষ, চূড়ান্ত ভোগবাদ, সংক্ষেপে মার্কিন যাপন, এম.এন.সি., সি.এন.এন., বি.বি.সি., ই.টিভি ও এফ.টি.ভি-র সৌজন্যে আমাদের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হল। এই সব বিদেশী মতাদর্শ বা বর্গগুলির আমদানির ওপর কোন প্রবেশকর বসানো হল না; অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সুরক্ষা ও উজ্জ্বল পরমায়ুর মত বিষয়গুলির সুরাহা না হলেও আমাদের গ্লানিবোধ হল না। বরং যৌনতা, সমকামিতা, লিঙ্গসাম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি কোন অতল অন্ধকার থেকে উঠে এসে উচ্চকোটির 'সংস্কৃতিবান' মানুষদের মুখ্যদ্বন্দ্বের রূপ নিল। মিডিয়ার তীব্র আলোয় তমসাময় যৌনভুবন হঠাৎ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। আলোচ্য বইটিতে এই আলোকোল্লাসের কিছুটা নমুনা ধরা আছে।

সংকলিত তেইশটি প্রবন্ধ বিন্যস্ত করা হয়েছে তিনটি পর্বে : সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং যৌন সমাজ বাস্তবতা। প্রদীপ বসুর 'যৌনতা ও সংস্কৃতি' এই সংকলনটির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা। যৌনতার সঙ্গে প্রভুত্বের/নিয়ন্ত্রণের অনুষঙ্গটি শ্রী বসু বিচার করেছেন ফুকোর দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি-র প্রেক্ষিতে। ফুকোর মতে, যৌনতার কোন চরিত্র নেই—এটি একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ। 'সেক্স' এবং 'সেক্সুয়ালিটি'-র মধ্যে পার্থক্য করে ফুকো দেখান যে প্রথমটি হল পারিবারিক বিষয়—সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করার সম্পর্ক। দ্বিতীয়টির ব্যক্তিগত বিষয়—যার সঙ্গে ব্যক্তির কামনা বাসনা বিপজ্জনক শারীরিক প্রবণতা এবং গুপ্ত ফ্যানটাসির যোগ রয়েছে। ব্যক্তির এই গোপন বিষয়গুলি মনস্তত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে জানা সম্ভব বলে আধুনিক জ্ঞান দাবি করে। এর ফলশ্রুতি হল 'পারসোনালাইজেশন ও মেডিকালাইজেশন অফ সেক্স'। লব্ধ যৌনজ্ঞান কীভাবে প্রশাসক, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করেন সেই বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে ফুকো দেখিয়েছেন যে যৌনতা তখন আর 'ব্যক্তিগত' বিষয় থাকে না; হয়ে ওঠে প্রশাসনিক-রাজনৈতিক বিষয়। ক্ষমতা ও যৌনতার মধ্যে ঘটে যায় অবাঞ্ছিত মিলন। ফুকো প্রাচ্যের কামের 'শিল্পকলা'-র সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'যৌনতার বিজ্ঞান'-এর পার্থক্য করেছেন। নারী শরীরের বিশ্লেষণ, শিশুর যৌনতা বিষয়ক শিক্ষাবিজ্ঞান, সন্তান জন্ম সংক্রান্ত অভ্যাসের সামাজিকীকরণ এবং যৌনবিকারের মনস্তাত্ত্বিকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি কীভাবে যৌনতার সঙ্গে ক্ষমতা ও জ্ঞানের মিলন ঘটিয়েছে তা দেখিয়েছেন ফুকো। নতুন যৌন 'বিজ্ঞান' 'শরীর প্রহরা ও নিয়ন্ত্রণকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেয়।' (পৃঃ ২৩) ভারতীয় মানসে যৌনতা বিচারের উপর্যুক্ত চারটি মাত্রার সঙ্গে উপনিবেশবাদের মাত্রাটি যুক্ত হয়ে নিপীড়নের

নতুন ছাঁচ রচিত হয়। সূর্যনারায়ণ ঘোষ, সুনীলকৃষ্ণ মৈত্র এবং ভবানীচরণের রচনাকর্মের উল্লেখ যে ভারতীয় যৌনচিন্তায় এখনও উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক চিন্তারই প্রাধান্য। সুপ্রাচীন থেকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য মন্থন করে পুরুষের দৃষ্টিতে নারী শরীরের অনুপুঙ্খ রূপকল্পনার ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন বিদগ্ধ দিলীপ ভারতী। শ্রী ভারতী পুরুষ শরীর নিয়ে নারীর রচনার অপ্রতুলতা লক্ষ করেছেন এবং কারণ অনুসন্ধান করেছেন সৃষ্টির জগতে পুরুষ আধিপত্যের মধ্যে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'নারীদেহের শৈল্পিক রূপায়ণ স্বভাবতই পুরুষের যৌনাত্মক রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী ঘটেছে' এমন অনুমান মেনে নিয়েও শিল্পকলার ভুবনে পুরুষ শিল্পীরাও যে'পুরুষ দেহ ও তার নগ্নরূপও' সমানভাবে উপস্থাপিত করেছেন সেই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। নারীবাদীরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনও মীমাংসা সূত্রে উপনীত যেমন হতে পারেন নি তেমনি পুরুষবাদী প্রভাব মুক্ত হয়ে নারীবাদী শিল্পীরা 'যে বিকল্প নারীদেহের ভাবমূর্তি তৈরি করতে চেষ্টা করছেন....তা এক ধরনের চেষ্টাকৃত কৃত্রিম শিল্পকলায় পর্যবসিত হবে...স্ত্রীজনোচিত যৌন আকাঙ্ক্ষার অবলোপন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ টেনে লোকশিল্পীদের ভাবনায় স্বাভাবিক যৌনভাবনার উপস্থিতির উল্লেখ করে তিনি সমাজের দুই ভিন্ন কালচারের - এলিট ও সাধারণ-যৌনভাবনার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। এদেশীয় যৌনভাবনায় ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের মিশ্র বাস্তবতার জটিল প্রকৃতির প্রসঙ্গটি তুলে এবং সাম্প্রতিক নারীভাবনার অসম্পূর্ণ প্রকৃতির উল্লেখ করে লেখক চলতি লিঙ্গসাম্যভাবনা বিষয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন।

ঈপ্সিতা চন্দের লেখায় আফ্রিকার 'কালো' মানুষদের শারীরসংস্থান ও যৌনতা ইঙ্গ-মার্কিন মুলুকের 'সাদা' মানুষদের চোখে কেমন জন্তুসুলভ প্রতিভাত হয় তার জটিল-গম্ভীর বর্ণনা দিয়ে লিঙ্গভাষা ও বর্ণবিদ্বেষের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবনের চেষ্টা আছে। লোকায়ত দেহতত্ত্ব এবং বাংলা গানে আদিরসের চারিত্র্য স্পষ্টতর হয়েছে যথাক্রমে শক্তিনাথ ঝা এবং রমাকান্ত চক্রবর্তীর নিবন্ধে। নারীভাবনা বিশেষজ্ঞা যশোধরা বাগচী নারীবাদী কোণ থেকে যৌনতার বিচার করেছেন। নারীবাদের ইঙ্গ-মার্কিন বিশেষজ্ঞ-বিশেষজ্ঞাদের চিন্তারসে জারিত লেখিকা যৌনতাকেন্দ্রিক আলোচনার (অতিআলোচনার?) সপক্ষে কেননা ......প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সযত্নে নির্বাচিত যৌনতার ছাঁচ যাতে ফেলে লিঙ্গ বৈষম্যকে পুষ্ট করা যায়-একে নারীবাদী অবিনির্মাণের (deconstruction) সম্মুখীন করতে হবে বারে বারে।......সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত যৌনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য এই মূল্যায়ন একান্ত জরুরী।" (পৃঃ -১৪৮) প্রবন্ধটির ভাষাগত আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় এটি অনূদিত। নারীবাদী পুরুষ ও মহিলা লেখকদের (শব্দটি লিঙ্গনিরপেক্ষ হল কি?) প্রধান সমস্যা হল এঁরা নারী অসাম্য ও পুরুষ প্রাধান্য বিষয়ে পীড়াজনকভাবে একপেশে। পুরুষ আধিপত্যের পাশাপাশি নারী কর্তৃক পুরুষ নিপীড়নের, পাল্টা নারী আধিপত্যায়নের, বিষয়ে এরা নির্বাক। যেহেতু এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম অপ্রতুল সে কারণে এঁরা ধরে নেন যে এরকম কোন বাস্তবতাই নেই। ইদানিং মিডিয়ার সৌজন্যে নারীর উপর পুরুষ আধিপত্যের পাশাপাশি নারীর পুরুষ নিপীড়নের সংবাদ অল্প হলেও ছাপা হচ্ছে। ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করার

কোনও কারণ নেই। সমাজসমুদ্রে ভাসমান পুরুষনিপীড়নহিমবাহের চূড়ো এটি। বিষয়টি ইউরোপ-আমেরিকায় জনপ্রিয়তা অর্জন না করা অব্দি-এদেশীয় নারীবাদী পণ্ডিতরা যে এ বিষয়ে কখনই কৌতূহল দেখাবেন না তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এদেশীয় সকল ডিসকোর্সই বুৎপন্ন ব্যাখ্যান (ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স)।

চলচ্চিত্রে যৌনতা ও বলিউডের প্রেমের ছবি নিয়ে লিখেছেন এম. ভি. শ্রীনিবাস ও শিলাদিত্য সেন। সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও সৌন্দর্যব্যবসার চরিত্র বুঝতে চেয়েছেন এ সময়ের সুবেদী সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের নবতর ভাবনার উৎপাদন-উদ্ভাবন যে এই ব্যবসায় নিয়োজিত পুঁজির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তা লেখিকার দৃষ্টি এড়ায় নি। নারীর রূপসজ্জা কি পুরুষের কাছে লোভন হয়ে ওঠার জন্য, না কি তা স্বাধীন ব্যক্তিরুচির প্রকাশ? সৌন্দর্য ও নারীব্যক্তিত্ব বিষয়ক ভাবনাগুলি যখন বহুজাতিক বিপণন সংস্থার দ্বারা নির্মিত হয় এবং নারী তার শিকার হয় তখন নারীর তথাকথিত 'স্বাধীনতা' কার ক্ষমতাধীন হয়ে পড়ে? এইসব গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয় এই প্রবন্ধে অন্তঃশীল। সুচিত্রা সঙ্গত একটি প্রশ্ন তুলেছেন । 'বহিরঙ্গের রূপসাধনাতেই কি মানুষের মুক্তি? উগ্র সৌন্দর্যচর্চার সঙ্গে আত্মরতির কতটুকু তফাত?......' (পৃঃ -১৮০) নারীকুল এবং নারীবাদীরা ভেবে দেখেছেন কি।

দ্বিতীয় গুচ্ছে সাহিত্যে যৌনতা বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। সুমন ভট্টাচার্যর 'যৌনতা : বাংলা কাথাসাহিত্য' রচনাটিতে মেধাবী পরিশ্রমের চাপ রয়েছে। নাটক ও বাংলা কবিতায় যৌনতা প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন যথাক্রমে শেখর সমাদ্দার ও জহর সেনমজুমদার। বাংলা গান ও প্রবাদে যৌনতার ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে রঞ্জন চক্রবর্তী ও অভ্র বসুর লেখায়। সুতপা ভট্টাচার্য তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যে যৌনতার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। নাসরিনের পাঠকদের একথা জানা যে তাঁর রচনার কোন সাহিত্য মূল্য নেই এবং তা রাগী, পুরুষবিদ্বেষী এবং চটকদারি চরিত্রের। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের যৌনতাকেন্দ্রিক অসাম্য বৈষম্যগুলির উপর তিনি আলোকপাত করেছেন। তবে ভিপ্রশ্নে একথা মেনে নেবার কোনও কারণ নেই যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলিম মহিলা সমাজের যৌন বাস্তবতা শ্রেণী-গোষ্ঠী নির্বিশেষ সকল মুসলিম মহিলার যৌন বাস্তবতা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ ও লিঙ্গবৈষম্য বিষয়ে নাসরিনের অনুভব আমাদের নাড়া দিলেও ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির আবর্তন ও ক্রিয়াশলীতা কেমনভাবে যৌন নিপীড়নের সঙ্গে যুক্ত সে বিষয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম আমাদের আলোকিত করে না। নারীর একাকিত্ব ও যন্ত্রণার প্রতি তসলিমার মত শ্রীমতী ভট্টাচার্যও সংবেদনশীল। স্বাভাবিক। তবে 'সমকামিতার পথে কিশোরীর আত্মতা খোঁজা' তাঁর মত সুবেদী মনের মানুষের কাছে কেন স্বাভাবিক মনে হয় তা এই পুরুষ পর্যালোচকের কাছে স্পষ্ট হয় না। পুরুষের যৌনতাকে তিনি আধিপত্যশালী / নিপীড়নমূলক মনে করেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্যর কাছে একটি প্রতিপ্রশ্ন : সমকামিতার পথে কোন পুরুষ যদি 'আত্মতা' খোঁজে তবে তা ঐ কিশোরীর আত্মতা খোঁজার মত 'স্বাভাবিক' বলে তাঁর মনে হবে না কি তা পুরুষসুলভ বিকৃতি বলে গণ্য হবে? আমার অনুমান এই যে নারী লেখকদের পক্ষে

পুরুষের নিঃসঙ্গতা যন্ত্রণা-নিপীড়নবোধের শরিক হওয়া সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ, যৌনতা-উর্ধ্ব নারী পুরুষের কাম্য সম্পর্ক বিষয়ে লেখিকার একটি মিষ্টি মানবিক ভাবনার উল্লেখ চোখ এড়ায় না।

পরের তিনটি প্রবন্ধ সংকলনটির মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা বেমানান। কলকাতার যৌনপল্লী, যৌনশিক্ষা ও যৌনকাজ নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে দেবাশিস বসু, স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং স্মরজিৎ জানা। রচনাগুলিতে পরিশ্রমের ছাপ আছে। যৌনকর্মকে 'কাজ'-এর সম্মান দেবার পক্ষের যুক্তি বেশ জোরাল—যদিও বহতা সামাজিক নৈতিকতার গতি ভিন্নমুখী।

চিন্তা উদ্রেককারী তিনশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার অভিনব এই বইটির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। মুদ্রণ প্রমাদ বিশেষ নেই। তবে বাজার অনুপাতে দাম একটু বেশী। যৌনতার তেজী বাজারের দিকে লক্ষ রেখেই সম্ভবত দাম নির্ধারিত হয়েছে। বইটির পরিকল্পনার দুটি প্রধান অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে। যৌনতা বিষয়ে বিদেশী ও দেশী ভাষায় অসাধারণ সব বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকা কৌতূহলী পাঠকের কাজে লাগতে পারত। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় আইনবিধি ও যৌনসাম্য বিষয়ে একটি নিবন্ধের অন্তর্ভুক্তি প্রাসঙ্গিক হত। কেননা আইনই আমাদের যাপনের প্রধান রক্ষক। পাশাপাশি, নারীকল্যাণসাধক সাম্প্রতিক আইনগুলি নারীর প্রতি ঝুঁকি থাকায় কীভাবে তা মানব হিসেবে পুরুষ ও তার পরিবারের 'আইনের চোখে সাম্য'-র অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তাও আলোচনার দাবি রাখে।

অন্য দু-একটি কৌতূহল জানিয়ে পর্যালোচনা শেষ করা যাক। তেইশটি প্রবন্ধের উনিশটির রচয়িতা পুরুষ। এ যে পুরুষ প্রাধান্যের দ্যোতক। সম্ভবত পুরুষরাই এখন বেশী নারীবাদী। বইটির পর্যালোচক শুধু পুরুষ নয়; পুরুষবাদীও (!)। লিঙ্গসাম্য বিষয়ে (বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যশোধরা বাগচী পর্যন্ত) চিন্তার সুদীর্ঘ ইতিহাস অনুধাবনের যথার্থ মেনে নিলেও একটি দুর্ভাবনার অবকাশ থেকেই যায়। লিঙ্গসাম্য/ অসাম্য বিষয়ক জ্ঞান, সৌন্দর্যশিল্পপুঁজি এবং নারীবাদের একবগ্‌গা প্রচার ও প্রসারের মিশ্রিত স্রোত মানব সমাজকে লিঙ্গসাম্যের দিকে নিয়ে যাবে, না কি তা নারী ও পুরুষকে পরস্পর স্বার্থবিরোধী যুযুধান দুই শ্রেণী/ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে ফেলবে! নারী-পুরুষ সম্পর্ক যেহেতু ক্ষমতা-সম্পর্ক বলেই পণ্ডিতরা দাবি করেছেন তাই ক্ষমতা সম্পর্কের চরিত্র অনুসারেই তা অধিকাংশ সময়ে অসাম্য ও হিংস্রতার জন্ম দেবে। ইরাকে মার্কিন আক্রমণ ও নারী পুরুষের ক্ষমতাসম্পর্কে প্রোথিত পরস্পরবিরোধী স্বার্থভাবনা যে একই সূত্রে বাঁধা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতা-উর্ধ্ব মানবিকতার ধারণা বেমানান; যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তথাকথিত মানবিকতার কোন স্থান নেই। মানবিকতার প্রধান ধারণাটিও কোন বিশেষ সময়ে ক্ষমতাধরের ধারণার প্রতিফলন। এছাড়া আমাদের হাঁসজারু সমাজের নারীবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আকাদেমিক নেতৃত্বের একাংশের ব্যক্তিগত যাপন কতটা লিঙ্গসাম্যমুখী তাও ভাবার। বইটির জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি পড়ে দীপায়িত পাঠকের মনে হতে পারে 'পুরুষসমাজ' এবং সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে

থাকবন্দী নারীসমাজ নারীবাদী এন. জি. ও, সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানক্ষমতার অধীন হয়ে পড়ছে। কেননা এদের জ্ঞানক্ষমতা প্রকাশক, সাংসদ-রাজনীতিক এবং মিডিয়াকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। প্রভুত্বের একটি বলয় ভাঙতে গিয়ে অনিবার্যভাবে প্রভুত্বের অন্য বলয়ে প্রবেশ করাই কি মানুষের ভবিতব্য!